ISSN : 2320-9275

উদ্দালক

ণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

৪৫৭

বিষয়

প্রজন্ম ব্যবধান

সম্পাদক
সন্তোষকুমার মণ্ডল

উদ্দালক

ষা ণ্মা সি ক সা হি ত্য প ত্রি কা

পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ্মসংখ্যা

২০১৫

বিষয়

প্রজন্ম ব্যবধান

ক্রমিক নং ৪৫৭

স্থাপিত—১০০

সম্পাদক

সন্তোষকুমার মণ্ডল

সহসম্পাদক

অনুপ বিশ্বাস, কিঙ্কর মণ্ডল, সংঘমিত্রা কর্মকার

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস

কলকাতা

Uddalak Sahitya Patrika, special issue : Prajanma Byabadhan, 2015
edited by Dr. Santosh Kumar Mandal. Sub-editor : Anup Biswas,
Kinkar Mondal & Sanghamitra Karmakar.

ISSN 2320 9275

© সম্পাদক

প্রকাশক : সন্তোষকুমার মণ্ডল
উদ্দালক পাবলিশিং হাউস
১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা-৪৯
দূরভাষ- (০৩৩) ২৫৪১ ৪৬১৭

পরিবেশক
পাতিরাম, দে'জ, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলেজ স্ট্রিট

মূল্য
৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে যখন ফিরে তাকাই প্রথম যৌবনের বেলাভূমিতে তখন কেমন যেন নিজেদের প্রতি করুণা হয়, এ প্রজন্মের যৌবনকে দেখে- কত অকপট, সাবলীল, ভয়-লজ্জা-জড়তাকে জয় করে আত্ম-উন্মোচনে আত্ম-নিবেদনে সর্বদা উন্মুখ, প্রকৃতির সন্তানের মতো – হাঁস-মুরগি-পাখি-প্রজাপতিদের থেকে একটুও আলাদা নয়। সেদিন সামাজিক মূল্যবোধ, গুরুজনদের আনুগত্য, ভালোমন্দের সংস্কার, সংকোচের বিহ্বলতা, সর্বোপরি নীতিবোধের শাসনে ও কর্তব্যবোধের পীড়নে আমাদের যৌবন যন্ত্রণাদগ্ধ ছিল। সেই যন্ত্রণা আমরা সহ্য করেছি এই ভেবে যে জীবন অনেক বড়, যৌবন তো ক্ষণিকের। ক্ষণিকের সাধ মেটাতে গিয়ে জীবন নষ্ট করার ঝুঁকি আমারা নিতে পারিনি। কিন্তু চোখের সামনে এ কোন যৌবনকে দেখছি আমরা! এ যৌবনের কাছে জীবন বড়ই ছোট, তাই দেহে-মনে যৌবনকে বিকশিত হতে দেওয়ার সময়টুকুও নষ্ট করতে চায় না। শৈশব-কুঁড়ি ছিঁড়ে যৌবন-মধু আস্বাদনের তীব্র প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। তারই অনিবার্য ফল রূপে টিন-এজারেই এ যৌবন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। এ যৌবনের হৃদয়ে প্রেম মুকুলিত হওয়ার অবসরই পায় না। সংসর্গ আর সম্ভোগের তীব্র তাড়নায় এ যৌবন পথে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, পার্কে-অন্ধগলিতে নিরিবিলি আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে মরে। এরা কেউ ভালোবেসে দেবদাস হয় না, মিথ্যা প্রেমের অভিনয়ে বন্ধুরা মিলে প্রেমিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করতেও দ্বিধা করে না। বিবাহ-পূর্ব সহবাস তো এ প্রজন্মের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা আমাদেরই সন্তান, এই প্রজন্মের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ।

যখন ভবিষ্যতের কথা ভাবি, কম-বেশি আরো তিরিশটি বছর এ পৃথিবীতে কাটিয়ে যেতে হবে – বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে আমরাও এই প্রজন্মের কাছেই লাইবেলিটি হয়ে যাব। কোন বৃদ্ধাশ্রমে হয়ত ঠাঁই হবে। কেননা, এ প্রজন্মের কাছে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের একটি সন্তান নিয়ে পরিবার। দ্বিতীয় সন্তানেরও ঠাঁই নেই, বৃদ্ধ বাবা-মা তো কোন ছার! কিংবা উজ্জ্বল কেরিয়ারের আশায় বিদেশে দেবে পাড়ি, সেখানেই বাঁধবে বাসা। আমাদের কাছে স্বগৃহই হয়ে উঠবে বৃদ্ধাশ্রম। সত্যি কথা বলতে কি, কাজের সন্ধানে গ্রাম বা ছোট শহর থেকে লোকেরা কলকাতায় ভিড় করলেও কলকাতার ইয়ং জেনারেশন বিদেশে পাড়ি জমাতেই অভ্যস্ত, নিদেনপক্ষে মুম্বাই-মাদ্রাজ। পড়ে থাকে বৃদ্ধ বাবা-মা, আমরা যাঁদের উত্তরসূরি, কলকাতা তো বৃহদায়তনের বৃদ্ধাশ্রমই বটে।

অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। একদিন বৃদ্ধ ঠাকুমা-ঠাকুর্দা ছোট নাতি/নাতনির সাহচর্যে বয়স্ক শিশুর মতো বার্ধক্যকে উপভোগ করতেন।

পুত্রবধূদের সেবায়, শাসনে ও প্রশ্রয়ে, পুত্রের আনুগত্যে সংসারের কর্তা রূপে বিরাজ করতেন। কাজে-কর্মে হেসে-খেলে গল্প-গুজবে দিনগুলো সুন্দরভাবে কেটে যেত। আর বর্তমান প্রজন্মের শিশু যেমন তার শৈশবকে হারিয়েছে, তেমনি বৃদ্ধও সংসারে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। আমাদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক প্রজন্মগত এই ব্যবধানকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছি না।

জড় থেকে কিভাবে প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল জানি না, আজও বিজ্ঞান তা আবিষ্কার করতে পারেনি; কিন্তু প্রাণ থেকে জড়ত্বের অভিমুখে এই মানসযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত মানবিক মূল্যবোধকে হারাচ্ছি, হারাচ্ছি পূর্ব-প্রজন্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। পারিবারিক সম্পর্কগুলো ক্রমশঃ আলগা হয়ে যাচ্ছে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে, ভাই-বোন সম্পর্কের রসায়নটা যেন বদলে যাচ্ছে। মাসি, পিসি, মামা, কাকা, ঠাম্মা, দিদুন, দাদু, ঠাকুর্দা অন্য গ্রহের জীবে পরিণত হচ্ছে। লুপ্ত-প্রায় প্রাণীর মতো শিশুর অভিধান থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন তো আবার 'সিঙ্গল মাদার' হওয়ার প্রবণতা কোন কোন মহিলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। যদি এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে তো আগত প্রজন্মের হতভাগ্য শিশুরা বাবাকেও জানবে না। হায় রে অদৃষ্ট! এর শেষ কোথায় কে জানে! এই ভাবে হারাতে হারাতে একদিন হয়ত চৈতন্যের উপলব্ধিটাই হারিয়ে ফেলবো, জড়ত্বে পৌঁছাতে আর কত পথ বাকি!

এই রকম এক ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে প্রজন্ম ব্যবধান নিয়ে একটি সংখ্যা করার কথা ভেবেছিলাম। এই ভাবনার দ্বারা এই সংখ্যার সমস্ত লেখকদের ভাবিত করতে পেরেছি, এমন নয়। প্রুফ দেখতে গিয়ে আমার বরং বিশ্বাসভঙ্গই হয়েছে। তবু বেশকিছু লেখায় আমার ভাবনার সমর্থন পেয়েছি। তাই এই প্রয়াসকে আমি ব্যর্থ বলতে রাজী নই।

সম্পাদক

সূ চি প ত্র

রূপান্তরের রূপকথা	পুলিন দাস	৭
প্রজন্মগত ব্যবধান নয় চাই নৈকট্য	ড. রাহুল চট্টোপাধ্যায়	১০
ঐতিহ্যপ্রীতি – অতীতমুখীনতা বনাম প্রগতিশীলতা – ভবিষ্যৎমুখীনতা	ড. আবু হান্নান গাজী	১৫
বাংলাপ্রবাদে প্রজন্ম ব্যবধান : বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা	ড. কাকলী ধারা মণ্ডল	২১
প্রজন্ম ব্যবধান ও লোকায়ত সংস্কৃতি	ড. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮
মেয়েলি আড্ডার একাল-সেকাল	মনুয়া পাঁজা	৪০
নির্জন শিখর : দুই কালের দ্বন্দ্ব	স্বাতী চক্রবর্তী	৪৪
প্রজন্ম ব্যবধান ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি লেখা	কিঙ্কর মণ্ডল	৫০
প্রজন্ম ব্যবধানে নারীচরিত্রের বিবর্তন : পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক	দেবশ্রী মজুমদার	৫৭
হিমালয় ভ্রমণে দুই প্রজন্মের অভিজ্ঞান : দেবেন্দ্রনাথ ও সুষমা দেবী	চন্দনা চক্রবর্তী	৬৮
আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতির সেকাল, একাল ও ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি	হরিপদ হেমব্রম	৭৪
প্রজন্ম ব্যবধান ও বাংলা উপন্যাস প্রেক্ষিত সুন্দরবন	ড. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম	৮২
প্রজন্ম ব্যবধানে ‘দুই সাধারণ মেয়ে’	সুদীপ্তা চক্রবর্তী	১১১
চন্দন সেনের নাটক ‘অনিকেত সন্ধ্যা’ : প্রজন্ম ব্যবধানের অনিবার্য শিল্পায়ন	ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল	১২১
কালব্যবধানে শকুন্তলা : পৌরাণিক ঐতিহ্য ও কালিদাসীয় উদ্‌বর্তন	সবিতা মণ্ডল	১৩০
সংস্কৃত সাহিত্যের অর্বাচীন ধারা	সুতপা পড়িয়া	১৩৫
‘ধরিত্রী – পতি – নির্বাচনম্’ : বিশ শতকে রচিত সংস্কৃত ব্যঙ্গনাটিকা	মধুরিমা মুখার্জী	১৩৯
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের ‘চণ্ডাতাণ্ডবম্’ : সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত ভাণ	ড. অর্ণব পাত্র	১৪২
সংস্কৃত প্রহসনে প্রজন্ম ব্যবধান	জুবিন ইয়াসমিন	১৪৭

রূপান্তরের রূপকথা

পুলিন দাস

বোঝা বওয়ার জন্য একদা ব্যবহৃত হতো ঝুঁড়ি বা ধামা। আধারটিকে মাথায় বা কাঁধে চাপিয়ে মালপত্র বইতে হতো। চটের ব্যাগ বা থলে এলো পরে। ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে চললো জিনিষপত্র বহন করা। কিছু দিনের ব্যবধানে দেখা দিল কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। স্কুল কলেজের ছাত্ররা বইপত্র নিয়ে যেত কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে আর তাদের মাস্টারমশাইদের, বিশেষ করে কলেজ শিক্ষকদের হাতে থাকতো পোর্টফোলিও ব্যাগ। কোনো কোনো রাজনীতির নেতার কাঁধেও দেখা যেতো ঝোলানো ব্যাগ। আজ যেদিকেই তাকানো যাক চোখে পড়ে পিঠব্যাগ – ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, মিস্ত্রী-মেকানিক সবারই কাঁধ থেকে কোমর অবধি পিঠজোড়া ব্যাগ।

ধুতি-পাঞ্জাবীর কাল পেরিয়ে এলো বিলিতি প্যান্টশার্ট। তাকে পেছনে ফেলে চলে এলো চোগা-চাপকান, জিন্স্। আর ইদানিং দেখা যাচ্ছে স্কিন্টাইট্ চামড়া কামড়ানো প্যান্ট ও গেঞ্জির ব্যবহার, - নারীপুরুষ নির্বিশেষে।

শোনা যাচ্ছে – যেমন খুসী পোশাক পরে স্কুলকলেজে আসাটা ছাত্রছাত্রীদের পবিত্র অধিকার। এ বিষয়ে নিয়ম নীতিনির্ধারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকার নেই বলে ঘোষণা। কয়েকধাপ এগিয়ে আজকের 'কলরব' –

'চুমু-চুমু-চুমু চাই
চুমু খেয়ে বাঁচতে-চাই।'

পড়ালেখার সূচনা হতো পাঠশালায়। চালু সুদূর গ্রামেও গজিয়ে উঠলো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। খবরের কাগজে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন – হাতছানি নানা কোচিং সেন্টারের। স্কুল থেকে বেরিয়েই ছাত্রছাত্রীকে ছুটতে হয় কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটারের ডেরায়। প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ে একজন তো বটেই কোথাও একই বিষয়ের জন্য একাধিক টিউটরের দ্বারস্থ হয় তারা। স্কুল-কলেজের ক্লাস ও সেইসঙ্গে টিউটরদের সান্নিধ্যেই কেটে যায় সপ্তাহের সাতটা দিন ও অনেকটা রাত। সময় নেই খেলাধুলোর, মেলামেশার। টেনেবুনে সময় একটু বার করতে পারলেও উপায় নেই – খেলার মাঠজুড়ে গড়ে উঠেছে ফ্ল্যাটবাড়ি। বার করা সময়টুকু কেটে যায় টিভির পর্দায় রংদার আজগুবি সব দৃশ্যে চোখ রেখে।

ভেঙে গেছে যৌথপরিবার। বাবা-মা এবং এক বা দুই সন্তান নিয়ে সংসার। বাবা-মা উভয়েই কর্মরত। তাঁদের সঙ্গে সন্তানের দেখা সাক্ষাৎ রাতে বা খুব সকালে। স্কুলের গণ্ডী পেরোনোর পর উচ্চতর পাঠের উদ্দেশ্যে তাদের পাঠানো হয় বাংলার বাইরে দক্ষিণ বা উত্তরভারতের কোনো শহরে। দক্ষিণ ভারতগামী স্পেশাল ট্রেনে চেপে চলে যায় তারা দেশঘর ছেড়ে। চলতে থাকে বিশেষ বৃত্তিধারী হয়ে ওঠার লড়াই। চিন্তা-চেতনা ও সমুদয় প্রয়াসই কেন্দ্রীভূত হয় নিজেকে প্রত্যাশিত চাকুরীর উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে। আত্মস্বার্থপোষণের নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিক প্রযত্ন করে তোলে তাকে আত্মকেন্দ্রিক। মুছে যায় মন থেকে দেশের কথা, - দশের কথা। দেখা মেলে অনেক বিত্তবান বড়লোকের, মেলে না দর্শন একজন মহৎ মানুষের।

'সদা সত্য বলিবে', 'চুরি করা পাপ' – মূল্যবোধের এসব শিক্ষা মুছে ফেলা হয়েছে পাঠ্যবই থেকে। পাঠ্যসূচী থেকে অন্তর্হিত মনীষীদের জীবন ও বাণী। চুরিবিদ্যাটাকেই রপ্ত করার প্রচেষ্টা চলছে নানাকায়দায়। পরীক্ষার হলে চুরি আটকাতে গেলে মার খেতে হয় পাহারাদার শিক্ষকদের। বিদ্যার্জন নয়, - লক্ষ্য নম্বরবৃদ্ধি। নম্বরই যে একমাত্র মাপকাঠি পরবর্তী পদক্ষেপের পক্ষে। বিকল্প আর একটা ব্যবস্থাও অবশ্য তৈরি হয়েছে – শাসকদল পরিচালিত ছাত্রসংগঠনের সেবক হতে পারা।

শিক্ষা মানে আজ নম্বরবৃদ্ধি। একশ'তে নব্বই-এর উপরে পেতেই হবে। বাবা-মা উৎসাহিত করেন সন্তানদের এই লক্ষ্য সাধনে। শিক্ষকমশাইরা যে শিক্ষা দেন সেটাও ওই নম্বরবৃদ্ধির কারুকৌশল। শিক্ষার্থীরাও তাই ছুটে চলে ছলে বলে কৌশলে সেই নম্বরবৃদ্ধির নিশানায়।

কঠোর রুটিনবদ্ধ জীবনযাপনের একঘেয়েমী অসহিষ্ণু করে তোলে তাদের। উত্তেজিত হয় আক্রোশে। সামান্য কারণেই জ্বলে ওঠে ধূমায়িত আক্রোশের আগুন। খুন-জখম-ধর্ষণ যার পরিণাম।

বন্ধ হয়ে গেছে থিয়েটার সিনেমার হলগুলো। ভালো একটা নাটক কিংবা উন্নতমানের কোনো সিনেমা দেখার উপায় নেই। স্কুল-কলেজে ছাত্রদের নাট্যাভিনয় চর্চাও থেমে গেছে। প্রমোদের একমাত্র মাধ্যম টি.ভি আর ঘরের বাইরে থাকলে মোবাইল ফোন।

ছুটির বিকেলে চা-টোস্ট সহযোগে চায়ের দোকানের আড্ডা বন্ধ। উঠে গেছে চেয়ারটেবিল পাতা সেসব চায়ের দোকান। গজিয়ে উঠেছে পথের ধারে ফাস্ট ফুড-এর স্টল। দাঁড়িয়ে চাওমিন্ খাওয়া, চলতে চলতে রোল্ চিবোনো বন্ধুর সাথে। টিউসনের সময় এগিয়ে আসছে তাই পা চালিয়ে চলা। কানে গোঁজা হেড্‌ফোন আর জ্বলন্ত সিগারেট দু'আঙুলের ফাঁকে। আজকের পরিচিত দৃশ্য।

আর্থিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। ঝাঁ-চক্‌চকে বাড়িগাড়ি, বৃহৎ ব্যাঙ্কব্যালান্স

একদিকে আর তার বিপরীতে নদীনালা খাল ও রেললাইনের ধার ঘেঁসা বাঁশের বেড়াঘেরা ভাঙা টালির ছাউনিতে বসবাসকারী মানুষজন। দূষণ বেড়ে চলে গাড়ির ধোঁয়ায়। হাঁপিয়ে ওঠে ওই মানুষগুলো। চাষ-আবাদে সহায়তার বিনিময়ে পেটের ভাতের জোগাড় করতো যে জন-মজুরের দল বন্ধ হয়ে গেছে তাদের সেই রোজগারের পথ। নেতা নেত্রীদের যোগসাজসে চাষের জমির দখল চলে গেছে পয়সাওয়ালাদের হেফাজতে। শিল্প গড়ার লোভ দেখিয়ে পাঁচিল তুলে ঘিরে রেখে দিয়েছে তারা বড় মাপের সব প্লট। অপেক্ষা জমির মূল্যবৃদ্ধির। ডবল তিনডবল দামে দখলি জমি বিক্রি করে আরো বড়লোক হওয়ার প্রতীক্ষা। ওইসব জমিতে ফসলফলানোর কাজে লিপ্ত মানুষরা আজ বেকার, ভাত জোটে না তাদের।

খেজুর গাছ কেটে রস বার করে তা দিয়ে বানানো গুড়-পাটালি বেচে অন্নসংস্থানের পথেও কাঁটা পড়েছে। মাঠঘাটের খেজুরগাছগুলো কেটে তাদের চালান করা হয়েছে ইটভাটায়। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ভাটার আগুনে। রমরমা প্রমোটিং-এর ব্যবসায় ইটের চাহিদা যে বেড়েই চলেছে। ইটভাটা তাই আজ গজিয়ে উঠেছে সর্বত্র। প্রলুব্ধ পরিবর্তনের টানে হারিয়ে গেছে 'শিউলি'-র পেশাটা।

গ্রামে-গঞ্জে এ ছাড়াও ছিল মাছমারারা। এলাকার নদীনালা খালবিল বাঁওড়ে মাছ ধরে বিক্রি করে সংসার চালাতো এইসব জেলেবাগ্‌দিরা। প্রাকৃতিক এইসব জলাশয়কে হত্যা করা হয়েছে নানা কৌশলে। জেগে ওঠা জমি জবরদখল করে নিয়ে চলছে ব্যবসাদারী। খিদের জ্বালায় ছটফট করছে এই বেকার মানুষগুলো।

চাষী মজুর-শিউলী-জেলেবাগ্‌দী ইত্যাদির সন্তানদের সামনে এতোটুকু আশার আলো নেই। ভাত জোটে না দু'বেলা, তায় আবার লেখাপড়া! কাছেপিঠে স্কুল থাকলে মায়েরা ছেলেমেয়েদের সেখানে পাঠিয়ে দেন মিড্-ডে-মিল-এর আশায়। ....চালডাল আবার এদিক ওদিক হয়ে যায়। পোকায় কাটা চাল সেদ্ধর ভিতর আবার কখনো কখনো ভেসে ওঠে আরশোলা টিক্‌টিকি। আজ সমাজের এই স্তরের নবপ্রজন্মের সামনে শুধুই হতাশা আর অন্ধকার।

নীতিহীন দুরাচার, আত্মকেন্দ্রিক অতিলোভ যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট, অনুকরণ-অনুসরণযোগ্য ভাবাদর্শ যেখানে অবিদ্যমান, প্রতিষ্ঠাবানরা যেখানে নীতিহীন বহুরূপীর ভূমিকায়, - আজকের প্রজন্মের সর্বস্তরই সেখানে সপূর্ণ দিশাহারা, - নিমজ্জিত গভীর সংকটাবর্তে।

স্মরণীয় তাই বিবেকবাণী – "মানুষ চাই, মানুষ চাই। ... বীর্য্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক প্রয়োজন। ... তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না, সামনে এগিয়ে যাও। ... মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।"

....

প্রজন্মগত ব্যবধান নয় চাই নৈকট্য

ড. রাহুল চট্টোপাধ্যায়

মানবজীবনের কথা বলতে গেলে নিশ্চিতভাবে দুটি দিক সামনে এসে দাঁড়ায়। একদিকে একক মানব অন্যদিকে চিরন্তন মানবপ্রকৃতি। একক মানব হিসেবে সে তার একক ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনার ওপর নির্ভরশীল; আর চিরন্তন মানবপ্রকৃতি এই ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে বৃহত্তর উদার এক জীবনমূল্যের প্রকাশ। কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই একথা উপলব্ধি করা যায় যে ব্যক্তিমানুষ তার সমগ্র চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য নিয়েই ক্রমাগত বৃহত্তর মানবপ্রকৃতির মধ্যে আত্মস্থ হয়ে চলার প্রয়াস করছে। এই প্রয়াস চিরকালীন। বৃহত্তর মানবপ্রকৃতির মধ্যে আত্মস্থ হওয়ার প্রয়াস একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা হয়তো কখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসে। 'মেঘদূত' নামক লেখাটির মধ্যে তিনি বলেছেন :

> "কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে ; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমি বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে! অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে!"
>
> (প্রাচীন সাহিত্য, বিশ্বভারতী, পৃ.১৬)

মানবচৈতন্যের এই চিরন্তন ব্যবধানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে প্রজন্মগত ব্যবধানের প্রশ্নটি। দুটি প্রজন্ম বলতে সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দুটি যুগের ব্যবধানকে বুঝি ; সেই যুগ ব্যক্তিমানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া বা পার্থক্য তৈরি করে তার প্রকাশকে বুঝি। ব্যক্তিচেতনার মধ্যে অন্তর্লীন ভাবাবেগের যে পার্থক্য, যাকে অতিক্রম করার প্রয়াস মানুষের চিরকালীন তার মধ্যে প্রজন্মগত ব্যবধানের সূত্রটি নিহিত আছে বলে মনে হয়। একক ব্যক্তির চেতনার এবং উপলব্ধির মধ্যেও সময় সমাজ এবং গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে যে পার্থক্য এসে যায় সেটিকেও বৃহত্তর অর্থে প্রজন্মগত ব্যবধান বলে মনে করা যায়। কারণ ব্যক্তির জন্মান্তর ঘটে চলেছে

প্রতিমুহূর্তেই। নতুন ভাব এবং বোধ প্রতিনিয়তই ব্যক্তির স্থিতিশীল চৈতন্যকে আঘাত করছে। সেই আঘাতে দোলায়িত মানুষের মধ্যে প্রতিমুহূর্তেই একটা না একটা বদল এসে যাচ্ছে। সেই বদলে যাওয়া মানবচৈতন্যের ক্ষেত্রেও প্রজন্মগত ব্যবধানের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সুতরাং প্রজন্মগত ব্যবধান দুটি যুগের দুটি ব্যক্তির মধ্যে ঘটে যাওয়া যেমন স্বাভাবিক তেমনি একজন ব্যক্তির মধ্যেও তার প্রকাশ অসম্ভব নয়।

ব্যক্তির অস্তিত্ব একাধারে সামাজিক এবং ঐতিহাসিক। যুগযুগান্তর ধরে ব্যক্তির চেতনার যে রদবদল ঘটতে থাকে তার ধারাবাহিকতাকে ইতিহাসের অঙ্গীভূত করে দেখা প্রয়োজন; আবার সেই ধারাবাহিকতা যখন বিশেষ একটা সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে বিশিষ্টতা লাভ করে তখন তার মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের দিকটিই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্যক্তি যখন তার চৈতন্যের স্থলে নতুন বোধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করার চেষ্টা করে তখন যুগপৎ তার চিরদিনের ধরাবাঁধা জীবনের ভাবধারা এবং নতুন সামাজিক ভাবধারা কাজ করে যায়। ব্যক্তির অন্তরে অনন্তের যে বিস্তার তার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করার জন্য অসীম হয়ে ওঠার চেষ্টা করে সে। ফলে ভাবনাচিন্তা এবং ক্রিয়াকর্মের মধ্যে প্রকাশ পায় সামাজিক দ্বন্দ্ব। ব্যক্তির এই অসীম হয়ে ওঠার মধ্যে তার সংগ্রাম রূপ পায়। ব্যক্তির এই সংগ্রাম এককভাবে তার অস্তিত্বের এবং বৃহত্তর অর্থে সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই সামাজিক অস্তিত্বরক্ষার বিষয়টির মধ্যে প্রজন্মগত ব্যবধানের ভিন্ন একটি সূত্র নিহিত থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনের ভাবনা ও উপলব্ধির পার্থক্য বাহিত হয় সময়ের সঙ্গে। উত্তরসূরীদের জীবনযাপন, ভাবনাচিন্তার সঙ্গে পূর্বসূরীদের সংযোগ ঘটে যায়। পূর্বসূরীর চেতনার দ্বন্দ্বের মধ্যে জন্ম নেয় উত্তরসূরীর জীবনবোধ। মানুষের ধারাবাহিক অগ্রগতির ইতিহাস বিস্ময়করভাবে সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত। ব্যক্তি যখন তার একান্ত নিজস্ব বলয়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে তার ঐতিহাসিক এবং সামাজিক ভূমিকার মধ্যে সংযুক্ত হয় তখন সময়গত ঐক্যের বিষয়টি খুব বেশিভাবেই প্রসারিত হয়। ব্যক্তির সংগ্রাম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন মাত্রা পায়। এবং তার সেই সংগ্রামী ধারা উত্তরসূরীদের সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে নতুন সূত্রে গ্রথিত হয়। সুতরাং ব্যবধানের ভাবনাটি ভাবার ক্ষেত্রে এই সামগ্রিক সংযোগের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রজন্মগত সংযোগের ক্ষেত্রটির মধ্যেই রয়ে গেছে সামাজিক ধারাবাহিকতা ও স্থিতির প্রশ্নটি। বিভিন্ন যুগের মানুষের মধ্যে এই প্রজন্মগত সংযোগের মধ্যে দিয়ে এক বৃহত্তর মিলনের দিকে যাত্রা করার প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছে যা ভারতবর্ষীয় সমাজের সামগ্রিক ধারার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সমাজজীবনে কর্মের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং বলা যায় সামগ্রিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার সকল ব্যবধানকে ছাড়িয়ে প্রধান হয়ে রয়ে গিয়েছে। মানবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে

ভারতবর্ষ যে পথ প্রদর্শন করেছে তা এই উত্তরাধিকারের প্রত্যক্ষ্য ফলস্বরূপ। সেকারণেই ভারতীয় সমাজজীবনে স্থিতি একটা মূলকথা। দারিদ্র্যসহ অন্যান্য নানা বিষয়ে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে থাকলেও ভারতবাসী তার মূল শিকড়টিকে হারায়নি। যার ফলে সকল পার্থক্যের মধ্যেও একটি ঐক্যের প্রকাশ ঘটেছে। অতীতের থেকে বহু প্রজন্ম ধরেই ভারতবাসী একটা মূল স্রোতকে আঁকড়ে থেকেছে এবং যাপিত জীবনের একটা মূল রূপ সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পেরেছে।

যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বদল, অর্থনৈতিক নীতির নবরূপায়ণ সামাজিক কাঠামোয় নানাভাবে আঘাত হানে। মানুষ ক্রমশই চিরাচরিত অন্বেষণের বাইরে নিজেকে নানাভাবে দেখতে ও বুঝতে চায়। এর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে বৃহত্তর কোন প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করার প্রবণতাও বাড়ে। ফলে বেড়ে যায় একটি স্থিতিশীল সমাজকাঠামোর মধ্যে তার অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি। মানুষ ক্রমশই এই অসম্পূর্ণতাগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে এবং এক ধরনের অভাববোধের মানসিকতা বিকশিত হতে থাকে। এই অভাববোধের মানসিক স্তর থেকেই অনেকক্ষেত্রে জাগ্রত হল চৈতন্যের ব্যবধান। যুগপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই চেতনাগত ব্যবধান দুটি প্রজন্মের মানুষের পার্থক্য সূচিত করল। ভারতীয় সমাজের স্থিতিশীল চরিত্রের মধ্যেও ক্রমাগত স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকল এই পার্থক্য, আধুনিক জীবনযাত্রাপ্রণালীর মধ্যে এই পার্থক্য প্রকটতর হয়ে উঠতে লাগল।

প্রজন্মের ভিন্নতার মধ্যে পার্থক্য একটি স্বাভাবিক বিষয়। যুগের প্রয়োজনে সময়ের ব্যবধানে দুটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর। এই পার্থক্য যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহিদাগুলির কিছু নঞর্থক দিকের বৃদ্ধি ঘটায় তেমনি অনেকক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতাও দান করে। ব্যক্তিমানুষের সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে থেকে জাগ্রত মনন নতুন প্রজন্মের কাছে জীবনের নতুন কিছু দিক উন্মোচিত করে। নতুন প্রজন্ম নতুন করে জীবনের অর্থকে খোঁজে, নতুন করে নির্মাণ করে খণ্ড বিখণ্ড জীবনের মধ্যেকার সেতুকে। সামাজিক মূল্যচেতনার এই নবনির্মাণের মধ্যে থেকেই সমাজ তার উন্নয়নের রসদ খুঁজে নেয়। মনের মধ্যে চলতে থাকা চিরন্তন দ্বন্দ্বগুলিকে নতুন করে সমাধানের পথ খুঁজে নেয় মানুষও। কিন্তু নতুনের এই পথচলার মধ্যে থেকে মানুষ হিসেবে কতখানি সে সার্থক হয়ে উঠল সে প্রশ্ন কালের। রবীন্দ্রনাথের যে উদ্ধৃতিটি প্রথমে আমি উল্লেখ করেছি। সেখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখার - সেটি হল 'অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে!'

যথার্থই মানুষ হিসেবে তার পূর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে যে চিরন্তন সত্তা সেখানে পৌঁছানো সম্ভব কি? এ প্রশ্নটি চিরকালের। প্রতিটি যুগেই নতুন প্রজন্ম যখন নতুন করে ভাবে এবং ভাবায় তখন আদি অকৃত্রিম এই প্রশ্নটি উত্থিত হয়, সেই সার্থকতার প্রশ্নচিহ্নের মধ্যেই নিরূপিত হয় প্রজন্মগত ব্যবধানের বাস্তব মূল্যমান, কতখানি

ব্যক্তিকে তা প্রসারিত কতখানিই বা সমাজকে দান করল। গ্রহণ এবং দানের প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই কখনও স্থিতিশীলতা, কখনো বা স্থিতিহীনতার বিষয়টি আমাদের সামনে চলে আসে।

আধুনিকতার প্রসার, শিল্পের প্রসার, জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে নানা পথ মানুষের সামনে খুলে দিয়েছে একটা বিস্তৃত পট। নিজের ইচ্ছাকে নিজের মত করে পূরণ করার পথ উন্মুক্ত হয়েছে, উন্মুক্ত হয়েছে গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়ে নিজের মনের মত করে নিজেকে তৈরি করার ও প্রতিষ্ঠিত করার পথও। বাঙালি সমাজ তথা ভারতীয় সমাজবাস্তবতার মধ্যে ব্যক্তির এই প্রাপ্তির দিকটি বিশেষভাবে সামাজিক ভিত্তিমূলের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে গিয়েছে। চাওয়া-পাওয়ার নিরিখে ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণের দিকটিও লক্ষ করা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে এই ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের সমন্বয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নতুনত্বের কোন পথরেখা নির্দেশ করল সে বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

জন্মগত ব্যবধানের প্রশ্নটি একান্তভাবেই তাই একটি সামাজিক প্রশ্ন। একটি সমাজের মানুষ হিসাবে জীবনের দাবিকে সামনে নিয়ে এসে সমাজের সদর্থক পরিবর্তনসাধনের বিষয়টিই নতুন প্রজন্মের কাছে মূল প্রাপ্তির বিষয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ, মানুষ হিসাবে তার অধিকারের প্রশ্ন, যাপিত জীবনের সমস্যাগুলি থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের দায় অনেকখানি। একদিকে নতুন চিন্তাভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে কোথাও যদি সামাজিক জড়ত্ব থাকে তা থেকে মুক্তি এনে দেওয়া; অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তি এনে দেওয়ার দায়িত্ব যেমন পালনীয় তেমনি বিভিন্ন প্রজন্মের সুদীর্ঘলালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক স্বপ্নের সযত্নলালন, রক্ষার দায়ও থেকে যায় নতুন প্রজন্মের কাছে, প্রজন্মগত নৈকট্যের দিকটিকে আরো শক্তিশালী করার দায়ও থেকে যায়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মধ্যে এই প্রজন্মগত ব্যবধানের বিষয়টি বিশেষভাবে চোখে পড়েছে, আবার নব্য ভুবনায়নের আর্থিক ও সামাজিক লক্ষ্যের মধ্যে দিয়ে সেই ব্যবধানের রূপটি বেশ কিছুটা কঠোর হয়ে উঠেছে। এর ফলে সারা বিশ্ব জুড়েই কিছু কিছু মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। মানুষ হিসাবে তার মূল্যচেতনার বিষয়টি অনেকক্ষেত্রেই অবহেলিত হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষের আধ্যাত্মিক মূল্যচেতনার আধারটিও নড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক জীবনযাপনের ধারাতেও এসেছে নানা পরিবর্তন। তবে বিশ্বে ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে ভারতবর্ষে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ভাঙাচোরা হয়নি। এখনও ভারতের বুকে প্রজন্মগত ব্যবধানের প্রকটরূপের মধ্যে হারিয়ে যায়নি মানবিক চরিত্র অথবা ফুরিয়ে যায় নি নৈকট্যের ও সংযোগের উদাহরণ। তাই সংযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এখনো রবীন্দ্রনাথের সেই অবিনশ্বর মানুষটির সন্ধানে ভারতবর্ষের মানুষকে সদাব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

বাঙালি সমাজকেও আমরা অনড় অচল হিসাবে পড়ে থাকতে দেখি না। নানা

পরিবর্তন চাহিদার রূপান্তর বঙ্গবাসীর সামাজিক চরিত্রের বদল ঘটিয়েছে। কিন্তু তার মূল্যচেতনার দিকটি এখনো তেমনভাবে আহত হয়নি; আহত হয়নি সংযোগ ও নৈকট্যের সামাজিক রূপটি।

প্রজন্মগত ব্যবধান বিষয়টি একটি ধারাবাহিক সামাজিক প্রক্রিয়া। সদর্থক ও নঞর্থক দুটি দিককে মনে রেখেই বলা যায় যে, এই ব্যবধানের বিষয়টিকে মূল সামাজিক অগ্রগতির ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। সংযোগ ও নৈকট্যের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে এক ধারাবাহিক মানবিক প্রক্রিয়া। তখনই এই প্রক্রিয়াটি আর ব্যবধান হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে পরিচিত হবে এক নতুন সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে – গড়ে উঠবে এক মানবিক সুন্দর পৃথিবী।

....

ঐতিহ্যপ্রীতি – অতীতমুখীনতা বনাম প্রগতিশীলতা – ভবিষ্যৎমুখীনতা

ড. আবু হান্নান গাজী

মানুষমাত্রই স্বকালে-স্বসমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, প্রথা-সংস্কারের উষ্ণপরশে লালিত-পালিত হয়ে নড়েচড়ে বেড়ে উঠে। শৈশবে-বাল্যে মানুষ যে সব পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে কাল্পনিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক, অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ লালন-পালন করে তা সচেতন যৌক্তিক অনুশীলনে, পরীক্ষণে, সমীক্ষণের আলোয় জারিত করা হয় না। এভাবে যুক্তিরিক্ত, বুদ্ধিশূন্য নানান বিষয় আমাদের নিত্যদিনের জীবনচর্চায় জগদ্দল পাথরের মতো স্থায়ী আসন করে নেয়। ফলতঃ মর্ত্যজীবনের অসারতায় এবং সীমাহীন অনন্তকালের সুখ প্রত্যাশায় অথবা আত্মার মোক্ষ ও চৈতন্যের নির্বাণ প্রত্যাশায় দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়েও একান্তভাবে বিশ্বাস-সংস্কারবদ্ধ জীবন-যাপনে সযত্ন-সতর্ক প্রয়াসী হয়ে উঠে। তাই, জীবনের চরম সংকট, সমস্যা, দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ অদ্যাবধি গতানুগতিক আচার-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায়, পালা-পার্বণ নিষ্ঠায় আশৈশব অভ্যস্ত জীবন যাপন-পদ্ধতিকে অবলম্বন করেন। যার জন্য জীবন কলের চাকার মতো কিংবা লাটিমের মতো সচল থাকে বটে, কিন্তু চিন্তা-চেতনায়, ভাব-ভাবনায়, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃজনে, সংস্কৃতিতে সভ্যতা এগোয় না, বিবর্তন-পরিবর্তন পায় না। চিন্তা চেতনায় নব কিশলয়ের বিকাশ-বিস্তার ও উৎকর্ষ দেখা যায় না। ফলে, জনজীবন জড়তা-জীর্ণতার শিকার হয়। প্রবাহমানচেতনা বহতা নদীর সঙ্গে তুলনীয়। স্রোতহীন জল আর নবচিন্তনহীন জীবন – দুই ক্ষয়িষ্ণু জঞ্জালাক্রান্ত। জল হয় জীবাণু-দূষিত, আর চিন্তন হয় সংস্কার-দুষ্ট, অতীতমুখী-প্রগতিশীলতাশূন্য।

সেকালে সাধারণ্যে জীবন-চেতনার প্রসার ছিল না। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও খাদ্যবস্তুর অভাব তখনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। কেননা, দুর্বল-অসহায়-অল্পশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষের জীবন তখনো সর্ব ব্যাপারে-সর্বক্ষেত্রে দৈবানুগ্রহ-নির্ভর নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রোগ-শোক, আনন্দ-বেদনা, বিপদ সম্পদ প্রভৃতি তখনো দেবতার 'কৃপা'ও দেবতার 'মার' বলে বিবেচিত। কাজেই সমাজের মানুষরা ছিল প্রাকৃতিকশক্তি, অলৌকিকশক্তি ও দৈবনির্ভর ক্ষমতার কাছে

নিতান্ত নিরীহ-অসহায়। তারপর ক্রমে মানুষের জীবনধারার প্রবাহ বহুখাতে প্রবাহিত হয়েছে। এর কারণ অনেক। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, যন্ত্রায়ত শিল্প, মুদ্রা বিনিময় রীতির বিস্তার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক শোষণ, যন্ত্রবিজ্ঞানে অসম অধিকার, ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্যের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণে জীবন বিকাশ ফুলে-ফলে শোভিত হতে থাকল। কিন্তু মানুষেরা দেশজ অতীত সমাজ-সংস্কৃতিকে ঐতিহ্যরূপে ধারণ ও বহন করে জীবন-বিমুখ, প্রগতি-ভীরু হয়েই থাকল। চলনে-বলনে, চিন্তনে-সৃজনে আধুনিকতার পথে হাঁটলেও ঐতিহ্যরূপী অতীত দেহে-মনে বাউল পাখির মতো বাসা বেঁধে থাকল।

আগের যুগে নিয়তি-নির্ভর মানুষের সামাজিক শৃঙ্খলা কিংবা বিপর্যয়ের কারণ ছিল ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বা অবনতি। তবে এ যুগে আর্থিক বৈষম্যই সামাজিক মানুষের দুঃখ-বেদনার মুখ্য কারণ। সদর্থে, সেকালের-সেযুগের মানুষের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার, অর্থনৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এ যুগের উত্তাল জীবন-প্রবাহের কাছে অনেকটা ফ্যাকাশে-বিবর্ণ-নিরীহ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, মানুষের চিন্তা-ভাবনা পুরাতনকে স্বরূপে ও স্বস্থানে ধরে রাখার জন্য নয়, পুরাতনের প্রয়োজন মতো বর্জন, শোধন ও নতুনের প্রতিষ্ঠার জন্যই।

সুতরাং সচেতন দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও প্রসারণ, পুরানো সমাজকে ভেঙে – অতিক্রম করে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন জাগানো, পরিকল্পনা প্রদান; চালু সংস্কৃতির মানোন্নয়ন ও নতুন সংস্কৃতি সৃজন; যে ঐতিহ্য প্রগতির অন্তরায়, অনুপ্রেরণা দানে অক্ষম, তা পরিহার করে নতুন ঐতিহ্যের সন্ধান ও সৃজন প্রভৃতিই হবে সচেতন-দায়িত্বশীল স্বাধীন ভারতের সুনাগরিকের আদর্শ, লক্ষ্য ও ব্রত।

মনুষ্যসমাজে প্রাচীনে-নবীনে দ্বন্দ্ব চিরকালীন। প্রকৃতির জগতে কিন্তু নতুন পুরাণে কোন সংঘর্ষ নেই। গাছ যে বৃদ্ধি পায় সে তো নতুন পাতাকে ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে পুরানো পাতা ঝরে পড়ে বলেই। মনুষ্যসমাজে প্রাচীনে-নবীনে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বাধে বটে, কিন্তু পরিণামে জয় নতুনেরই হয়। তবু মানুষ চিরকাল ইতিহাসের এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেছে। প্রকৃতির এই নির্দেশ না মানার ফল ভালো হয় নি। খুনোখুনি, হানাহানিতে রক্তঝরা এ পৃথিবী কেবল বারংবার ক্ষতিগ্রস্ত-বিপর্যস্ত হয়েছে। প্রাণঘাতী সংঘর্ষে মানুষ কেবল অশান্তি ও অমঙ্গলই ছড়িয়েছে। মানুষের ইতিহাস এই বৈনাশিক কোন্দলেরই ইতিকথা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কেন এমন হয়। চলমান জীবনে চলা মানেই সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া, আর এগুতে গেলেই স্থান ও কালকে পেছনে ছেড়ে যেতে হয়। কাজেই পুরানোকে বর্জন ও নতুনকে গ্রহণের নাম হচ্ছে প্রগতি। আর কে না জানে যে গতিতে জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু। গতি মানেই স্বাভাবিক অগ্রগতি। পুরাতন হচ্ছে অতীত, আর নতুন মাত্রই ভবিষ্যতের প্রতীক। নতুনের প্রতি

আসলে মানুষের কোনো অনীহা নেই। বরং প্রবল আগ্রহ রয়েছে। ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে মানুষ নতুনকে বরণ করবার জন্য সদা ব্যাকুল।

কিন্তু মানসক্ষেত্রে অর্থাৎ, ভাব-চিন্তা-অনুভবের ব্যাপারে জীবনে আচরণীয় নিয়ম-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কারের যে তৈরি ইমারত সে সুনিশ্চিত হিসাবে পায়, তার থেকে বেরিয়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে সে নারাজ। এ ব্যাপারে সে নিজ চিন্তা করবার গরজ বোধ করে না। এ বিষয়ে সে পরচিন্তাজীবী। গুরুবাদী। কুলগুরুর দীক্ষা সে কবজ হিসাবে মন-মস্তিষ্কে সংলগ্ন করে ভবনদীতে নিশ্চিন্তে পাড়ি জমায় ঐহিক ও পারত্রিক প্রাপ্তির আশায় ও আশ্বাসে। তাই মানুষ সনাতনী ও নতুন দ্বেষী।

সৃষ্টিশীলতা ও গ্রহণ প্রবণতা চলমান-গতিশীল জীবনের একাধারে উৎস ও প্রাণ। সব মানুষ সৃষ্টিশীল নয়, গ্রহণ প্রবণ মানুষও বিরল। তাই বুনো-বর্বর-প্রকৃত মানুষ আজও সুলভ। আমাদের আশৈশব লালিত যুক্তি-বুদ্ধি-বিশ্বাসের ও রুচির এবং শ্রেয়োবোধ গুণে-মাপে, মানে-মাত্রায় পরিশীলিত-পরিমার্জিত হয়নি। এ প্রাণহীন জীর্ণ ও জড় আচার সাধারণভাবে বহুব্যবহৃত বদ্ধজল পুকুরের মতো বিকৃতির ও অবক্ষয়ের শিকার। কারণ, মানুষমাত্র স্থায়িত্বকামী – নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাকাঙ্ক্ষী হওয়ার জন্য সাধারণভাবে নিরুদ্যম ও অতীতাশ্রয়ী হয়। মানুষের মনোজগতে নতুন ভীতি ও পুরানো প্রীতি সহাবস্থান করে। তাই, গতিশীল চেতনায় সৃষ্ট নবধ্যান-ধারণা উপপল্লব ঘটানো উপদ্রবের মতো মনে করেন অধিকাংশ মানুষ।

সময় নিয়মিত ও সময়নিয়ন্ত্রিত চলমান জীবনের প্রতিটি বর্তমান ক্ষণ মুহূর্তেই অতীত হয়ে যাচ্ছে এবং দেহ-মনের উপর তার আপাত-অদৃশ্য ছাপ রেখে যাচ্ছে, এ তাৎপর্যে জীবনে অতীত আছে, ভবিষ্যৎও থাকে, কিন্তু বর্তমান কেবল অপসৃয়মান মুহূর্তমাত্র। কাজেই জীবন মানে অতীত ক্ষণসমূহের সমষ্টি। তবে, কালে কালে জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধ বদলায়। এর ফলে, মানুষের সঠিক ও সর্বাত্মক উন্নয়ন ঘটেছে। ভালোর অনুকরণ পরিণামে কল্যাণবুদ্ধিপ্রখর করবে, অনুশীলনে আত্মবুদ্ধি ও আত্মশক্তি জাগাবে, তখন স্বকীয় আবিষ্কার-উদ্ভাবন সম্ভব হবে, বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে – আপাতত আমরা এ প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচব।

নিত্য সঙ্কট-সমস্যা-সংগ্রাম-প্রতিরোধেরই অন্য নাম জীবন। প্রতিদিন সূর্যের উদয়ে নতুন করে জীবনও হয় শুরু। যেহেতু জীবন গতিশীল চলমান এবং দেহের চোখ ও পা কেবল সম্মুখগতিরই সহায়, সেহেতু গতিশীল চলজীবনে পথ আর পাথেয় নতুন। জীবনের সর্বপ্রকার চেতনা জীবন-চাহিদা থেকে উদ্ভূত – একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ আত্মকল্যাণের উপলক্ষে অতীত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী মনোভাব সন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু, উদ্যমশীল মন-মননকে শীথিল করে দেয়।

বহমান সময়তাড়িত জীবনও চলমান গতিশীল। এ-তত্ত্ব মেনে নিলে জীবনের, সমাজের, জাতির ভিত অতীতে ও ঐতিহ্যে – এ ধারণা মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে যাবে।

অক্ষমের আস্ফালনেই কেবল রয়েছে অতীতের ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব। প্রাণীমাত্রেরই গতি সম্মুখ দিকে। ফেলে আসা দিন-ক্ষণ ভুক্তাবশেষ ও বর্জিত সম্পদ চলমান ও গতিশীল জীবের, ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের নতুন চাহিদা মেটাতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়ে অতীতে বিলীন হচ্ছে। পিছুডাক ও পিছুটান সম্মুখগতি প্রতিহত করে মাত্র। অতীত ও ঐতিহ্য মানুষকে কেবল ধরে রাখে, কেবল ভরে রাখে, প্রগতি ভীরু করে তোলে। ঐতিহ্য চেতনা মানুষে মানুষে কেবল স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগায়, কেবল বিচ্ছেদ ঘটায়, বিচ্ছিন্নতা বাড়ায়। যার ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধ্বংস কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়।

অতীত ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মোটেই স্পষ্ট নয়। একটা শোনা কথা আপ্তবাক্যরূপে আমরা আওড়িয়ে চলছি মাত্র। যা পিছনে ফেলে আসি, যা চুকে-বুকে যায়, হারিয়ে যায় তা-ই অতীত। সে স্মৃতি আমাকে কেবল ধরে রাখতে পারে, এগিয়ে দিতে পারে না। মানুষ তার চোখ দিয়ে সুমুখেই কেবল দেখতে পায়, সচেতন প্রয়াসে পাশেও। কিন্তু পিছনে তাকাতে হলে পিছনকে সুমুখ করতে হয়। অতীতকে স্মরণ রাখতে হলে ভবিষ্যৎকে ভুলতে হয়।

হোমার-শেক্সপীয়র-টলস্টয়-কালিদাস-সাদী লেখক হলেন, তাঁদের পিতৃপুরুষের কেউ লেখক ছিলেন না। আবার রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সন্তান কবি হতে পারলেন না। আদম-সন্তান কাবিল হল লম্পট, নূহর সন্তান হল পিতৃদ্রোহী। ঐতিহ্যের প্রভাব কোথায় পড়ল? ব্যক্তিক কিংবা জাতিক জীবনে ঐতিহ্যই যদি প্রেরণার আকর ও আত্মোন্নয়নের ভিত্তি হত, তা হলে সমাজে কিংবা দেশে কোনো মানুষের বা জাতের উত্থান-পতন থাকত না।

আমরা জীবনে গতি চাই, গতি চাই বুদ্ধি-যুক্তি-মন-মনন-মনীষার। উদ্ভাবনে, সৃজনে, আবিষ্কারে নব নব চিন্তা-চেতনা চাই। কর্মে, জীবনে, অধ্যাবসায় নতুন নতুন ভাব-ভাবনা চাই। নতুনচিন্তা-চেতনায়-উদ্যমে-উদ্যোগে-আশায়-আশ্বাসে শক্তি সাহসে আমাদের এগুতে হবে। মন-মগজ-মনন-মনীষার প্রবহমান নতুন চেতনার ও নতুন চিন্তার ফুল, ফল ও ফসল ফলাতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তার উলাট পুরাণ লক্ষণীয়। তাই, ঐতিহ্যের নামে একালে মৌলবাদ পৃথিবীর সর্বত্র সর্বধর্ম সম্প্রদায়ে, রাজ্যে, রাষ্ট্রে, গোত্রে ও জাতিতে সংক্রমিত হয়েছে সংক্রামক রোগের মতোই।

মৌলবাদমাত্রই প্রগতিবিমুখ, অতীত ও ঐতিহ্যমুখী, গ্রহণে অনীহা এর বৈশিষ্ট্য, সম্মুখ দৃষ্টি এর নেই, অতীতপ্রীতি এবং নতুন ভীতি এর চরিত্র লক্ষণ। সমাজ-সভ্যতাকে নব নব উন্মেষে কিশলয়ের মতো বিকশিত হতে দেয় না বলেই 'মৌলবাদ' আমাদের কাছে মানবতারই বিপরীত তত্ত্বরূপে প্রতিভাত। এ জন্যই আমরা মৌলবাদের প্রসারে আতঙ্কিত হই। মৌলবাদের বিস্তার প্রকারান্তর মানবতারই বিনাশ মাত্র। কাজেই অতীতমুখীনতা ও প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব আজও সর্বত্র তীব্র।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য পূর্বলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও

মুক্ত চেতনা-চিন্তার অনুশীলনে আগ্রহী হয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগে যুক্তিবাদী হয়ে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ব্যক্তিরাই কেবল মানবিকগুণে ঋদ্ধ হয়ে মানববাদে, মানবতায় ও মনুষ্যত্বে অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে। এজন্য মুক্তমনের, মুক্তবুদ্ধির তথা স্বাধীন চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন মানুষের আধিক্য প্রয়োজন – এই যন্ত্রণাদগ্ধ, ক্ষয়িষ্ণু সমাজে। আশৈশবলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত যুক্তি-বুদ্ধিনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক স্তরে মানব-নির্বিশেষকে সমদৃষ্টিতে দেখতে ও ধীরবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে।

মানুষমাত্রেই শান্তি ও কল্যাণকামী। কিন্তু শান্তি ও কল্যাণের পথ চেনা নেই বলেই তারা শান্তির নামে ঘটায় অশান্তি, কল্যাণ কামনায় ডেকে আনে অকল্যাণ; প্রীতির নামে জাগায় গোষ্ঠী-চেতনা। তাই আচরিক ধর্মানুগত্য ও উগ্রজাতীয়তাবোধই মানবপ্রীতি ও মানবতাবোধ বিকাশের বড় বাধা, - আজকের মানব-সমস্যার মূল কারণ। প্রীতি বিনিময়ে কারো অনীহা নেই – এ বিশ্বাসে আমরা মানুষ অবিশেষকে আহ্বান জানাই, - সংস্কারমুক্ত চেতনা, চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করি। কামনা করি, বিবেক ও যুক্তি আমাদের পথের দিশারী হবে। চিত্তলোক প্রীতি ও সহিষ্ণুতার কর্ষণে আলোকিত হয়ে, 'মানবতাই মানবধর্ম' – এ বোধের অনুগত হোক আমাদের চিন্তা ও কর্ম। প্রগতিশীলতার হাত ধরে তা বাস্তবে সম্ভব-সাধ্য-সফলময় হয়ে উঠবে।

সদর্থে, প্রাকৃতিক নিয়মেই যা-কিছু পুরাতন হয়। তাকে জড়তা ও জীর্ণতা গ্রাস করে। বিনাশের বীজ তার মর্মে প্রবিষ্ট। কাজেই নতুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জড় ও জীর্ণ প্রাচীন বেশিদিন টেকে না। নতুনের অমোঘ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার একসময় অনিবার্য হয়ে উঠে।

তবুও ঐতিহ্য অতীতের ইতিবৃত্ত হিসাবে এর মূল্য অপরিমেয়। ঐতিহ্যের হাত ধরে অতীতের তথ্যের, ঘটনার ও তত্ত্বের আকররূপে, ইতিহাসের উপকরণস্বরূপ, শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার-দেশাচার, পালা-পার্বণ প্রভৃতির খবর মেলে। মানসজগতে শাস্ত্র ও বিশ্বাস-সংস্কার অনুগ একটি কৃত্রিম আলেখ্য পাওয়া যায় ঐতিহ্যের সূত্রে। যা বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক জীবনের অনুরাগী, অনুগত ও অনুগামী নয়। তাই, ডারউইন-মার্কস-ফ্রয়েড উনিশ-বিশ শতকে যে মনুষ্যকল্পনায়-বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় সমাজে-ব্যক্তিজীবনে যেভাবে বৈনাশিক বিপর্যয় ঘটিয়ে মানুষের চেতনায়-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে বৈপ্লবিক বিবর্তন ও যুগান্তর ঘটালেন, তার প্রভাব ঐতিহ্যের সর্বগ্রাসীপ্রভাবের কাছে অনেকাংশে বিলীন হয়ে গেছে। ফলতঃ মানবিক ঋদ্ধ চেতনার, মানবতাবোধের বিকাশ ও উৎকর্ষের এমনকি উন্মেষেরও সর্বাত্মক সুফল লক্ষ করা যায় না। এর পিছনে কার হাত? কে দায়ী?

প্রগতিশীলতার সর্বমুখী বাসন্তী হাওয়ায় আজকের পৃথিবী যানে-বাহনে, তারে, বেতারে, হোয়াটশ্ অ্যাপে, ট্যুইটার, ফেসবুক, গুগলের দৌলতে একটা গমনসাধ্য ও

ঘরে বসে দর্শনসাধ্য জনপদে পরিণত হয়েছে। তাই আজ অনক্ষর-সাক্ষর-শিক্ষিত নির্বিশেষ অনেক ভৌতিক অদৃশ্য ভয়-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত হয়ে গেছে। আজকের পৃথিবীতে হেন জাতি বা সম্প্রদায় নেই, হেন ব্যক্তি নেই যারা নিত্যকার জীবনযাত্রায় সমকালীন দাবি মেটানোর গরজে ঐতিহ্যকে ভূ-লুণ্ঠিত-নিষ্পেষিত না করছে। আজ তাই উচ্চশিক্ষিতের, উচ্চবিত্তের ও উচ্চবৃত্তির মানুষের-পুরুষের এবং নারীরও পোশাক য়ুরোপীয় হয়ে উঠেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, মনন-ভাব-অনুভব-উপলব্ধি কালে কালে দেশে দেশে এভাবেই এগুচ্ছে। মানুষ বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য স্তরক্রম অতিক্রম করে মানবিক শক্তির ও মানবতার বিস্ময়কর ক্রমবিকাশ, বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে, ঘটাবে। এটাই জীবনের ধর্ম, গতিশীলতার আকাঙ্ক্ষা, দাবি, স্বপ্ন-সাধ। এ তত্ত্ব, এ তথ্য ও এ সত্য সংকোচ-শরম, ভীতি-সংস্কার পরিহার করে যত শিগ্‌গির অনুভব-উপলব্ধি ও প্রকাশ্যে পরিব্যক্ত করবে, আমাদের প্রগতি-প্রাগ্রসরতা ততই দ্রুত হবে। বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের শক্তি ও সাহস ততই পাবে বৃদ্ধি। আসবে আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক ঋদ্ধি।

....

বাংলাপ্রবাদে প্রজন্ম ব্যবধান : বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা

ড. কাকলী ধারা মণ্ডল

প্রজন্ম ব্যবধান একটি বিমূর্ত ধারণা। সভ্যতার আদি পর্বেই সম্ভবত যা ভ্রূণাকারে বিকশিত হয়েছিল; শিকারও সংগ্রহজীবী বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, একসময় পরবর্তী প্রজন্মের যোগ্য কেউ এসে সময় মতো কেড়ে নিতেন তাঁর মুকুট। পরবর্তী প্রজন্মের এই নেতা আবার কোনো না কোনো সময় ক্ষমতাচ্যুত হতেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা। নানা সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিবাদ ঘনিয়ে উঠতো দুই প্রজন্মের মধ্যে। পারিবারিক পরিসরেও এ ইতিহাস যুগ থেকে যুগান্তরে আবর্তিত হয়। প্রবল প্রতাপান্বিত শাশুড়ি একসময় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন বধূমাতার কৌশলে। বধূমাতাও আবার একদিন ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন তাঁর বধূমাতার প্রকৌশলে। রাজা যায়, রাজা আসে, সিংহাসন খালি থাকে না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত হয় বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মাচার, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কিংবা বংশধারা। এক প্রজন্মের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিংবা বিশ্বাস-অবিশ্বাস কর্তব্য বা দায়িত্ববোধ অন্য প্রজন্মের কাছে অনেক সময় অনাবশ্যক, অতিরিক্ত কিংবা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। বাধে সংঘাত। ব্যক্তিত্বের কিংবা অধিকারবোধের। বিশ্বজুড়ে এ এক চিরন্তন সমস্যা। সব সমাজের কিংবা সব দেশের মানুষই এই সমস্যায় জর্জরিত। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ পারিবারিক পরিসরসম্পন্ন দেশে এ সমস্যা অনেকসময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রাচীনপন্থী পুরাতন প্রজন্ম জাত-পাত, জাতি-ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে চায়, নব্যপ্রজন্মে এ সবের বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতে চায়। এ নিয়ে বেধে যায় হানাহানি, হত্যা, প্রতিহত্যার মত ঘটনা। আজকের দিনে এই একুশ শতকের 'নেট-দুনিয়া'তেও খবরের কাগজ খুললেই প্রতিদিন আমরা দেখি এ ধরনের খবর – বাবা-মা'র অমতে বিয়ে করার জন্য সন্তানকে পিতা-মাতা কিংবা পরিবার হত্যা করেছে। একান্নবর্তী পরিবারে এ ধরনের প্রজন্ম ব্যবধান স্পষ্টত অনুভূত হয়। সেখানে তিন বা চার প্রজন্ম এক ছাদের তলায় বাস করে – তাদের রুচি, তাদের মূল্যবোধ, তাদের জীবনকে দেখার দৃষ্টি বহু ক্ষেত্রেই আলাদা, ফলতঃ সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

> "Due to the difference in bringing up, their mental framework differ from each other. Physiological &

behavioral patterns are formed on the basis of circumstances on under goes. When the people of the different generations meet each other they often are induced to difference in opinion, communication gap, conflicts etc."[১]

প্রতিটি প্রজন্মের সামাজিক প্রেক্ষিত আলাদা হয়। সময়ের সাথে সাথে বদলে যায় খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক রীতি-নীতি এমনকি ভাষার ধরন। ফলে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে, নির্দিষ্ট নৃগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য কিংবা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অবস্থিত হয়েও এক প্রজন্মের মানসিক গঠনের সঙ্গে অন্য প্রজন্মের মানসিক গঠন মেলে না। সময়-সমাজ ও বিশ্বপরিবেশের নিরিখে এক এক প্রজন্মের মানসিক ভাবনা, মূল্যবোধ ও চাহিদা এক এক রকমভাবে গড়ে ওঠে, ফলে দুই প্রজন্মের মধ্যে ভাবনাগত যে ফারাক বা ব্যবধান গড়ে ওঠে তার ফলেই এই প্রজন্ম ব্যবধান (Generation Gap) গড়ে ওঠে। প্রজন্ম ব্যবধানের সূত্রেই এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের সমালোচনা করে, দোষারোপ করে কিংবা মূল্যায়ন করে।

বাংলা প্রবাদ বাংলা মৌখিক সাহিত্যের এক অনন্য ধারা। এই সংক্ষিপ্ত রসাভিব্যক্তিতে লোকমননের তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রতিফলন বড় সূক্ষ্মভাবে বিম্বিত হয়। প্রজন্ম ব্যবধানের বহুমাত্রিক তাৎপর্য মৌখিক অভিব্যক্তির এই অনুপম ধারাটিতে নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। নিচে এরকম কিছু দৃষ্টান্ত সন্নিবিষ্ট হল যেখানে সমাজ পিতা ও পুত্রের মধ্যে আচরণগত ভেদকে প্রবাদে বিবৃত করেছে। অনেক সময় পূর্ববর্তী প্রজন্ম ধনে-সম্পদে বা শিক্ষাদীক্ষায় হয়তো কিছুটা পিছিয়ে ছিল, বর্তমান প্রজন্ম সেই ব্যবধান মুছে ফেলতে চায়, সেই আকাঙ্ক্ষা ভালো উদ্দেশ্যেও হতে পারে, আবার তা অনেক ক্ষেত্রে সমাজের চোখে নিন্দনীয়।

১।। বাপের পরনে নেইকো সুতো
বেটার পায়ে চৌদ্দসিকের জুতো।।[২]

অর্থাৎ পিতা এত দরিদ্র যে তাঁর পরনের কাপড়ও জোটে না, অথচ পুত্র দামি জুতো পরে 'স্টাইল' করছে। যাঁরা নিজের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে খরচ করেন তাঁদের সম্পর্কে এই প্রবাদ উক্ত হয়।

২।। বাপ জানে না সুক্তি খেলা, বেটা তীরন্দাজ![৩]

৩।। যার বাপ মারে না তেলাপোকা, তার ছেলে তীরন্দাজ![৪]

৪।। বাপ কা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া
কুছ নেহি তো, থোড়া থোড়া।।[৫]

৫।। যার বাপ খেত মাঠে শালুক পাতে ভাত
তার ছেলের কানে দেখি কলম চোদ্দ হাত।।[৬]

আজ সমাজের মানুষের কাছে এটাই স্বাভাবিক যে পিতার সব কিছুর উত্তরাধিকারী

হবে সন্তান। যখনই দুই প্রজন্মের মধ্যে অবস্থানগত কিংবা আচরণগত বিশাল পার্থক্য চোখে পড়ে, সমাজ তার সমালোচনা করে। তাই দরিদ্র পিতার সন্তানের সাজের বাহার নিন্দিত হয়, অদক্ষ বাবার সন্তান সুদক্ষ তীরন্দাজ হতে পারে – এ কথা সমাজ বিশ্বাস করে না, সেই সন্তানকে শ্লেষে বিদ্ধ করে (১নং, ২নং এবং ৩নং প্রবাদ)। বাংলা প্রবাদের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞ মানুষ বলে ওঠে বাবার মতই সন্তানের স্বভাব হয়, ঠিক যেমন সিপাইয়ের চরিত্র তার ঘোড়ার মধ্যেও ফুটে ওঠে – সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা তো বটেই (৪নং প্রবাদ)। আবার আজকের দিনের প্রেক্ষিতে অশিক্ষিত গ্রাম্য পিতার শিক্ষিত সন্তানকেও বিদ্রূপ সইতে হয় (প্রবাদ নং ৫) – যার বাবা মাঠে শালুক পাতায় ভাত খেত তার ছেলের কানে কলম গোঁজার ধৃষ্টতা কেন হবে! পূর্ববর্তী প্রজন্ম মনে করে লেখাপড়া শিখে নব্যপ্রজন্ম বহুক্ষেত্রেই গোল্লায় যায়। তাই পূর্ববর্তী প্রজন্ম এর জন্য লেখাপড়াকেই দায়ী করে –

৬।। দু'পাতা ইংরেজী পোড়ে
বাপকে বলে 'ড্যাম শুয়োর'।

৭।। বাপের শরীর পাকনা দড়ি
ছেলের মাথায় বাঁকা টেরি।।

প্রজন্মের ব্যবধান শুধু পিতা-পুত্রে নয়, মা-মেয়েতেও লক্ষ করা যায়। তবে সংসারের রণক্ষেত্রে পিতা যে সংসারের কর্তা সেখানে পুত্রসন্তান বড় হলে অধিকারের লড়াই বেধে যায়, ক্ষমতায়নের বৃত্তে দু'জনে হয়ে ওঠে পরস্পরের শত্রু। সামাজিক ক্ষেত্রে পিতা পুত্রের মতান্তর, বিবাদ, সম্পত্তি ও অধিকার নিয়ে গণ্ডগোল অতি সাধারণ এক ঘটনাপ্রবাহ।

সে তুলনায় মাতা ও কন্যার মধ্যে এক অবিসম্বাদিত টান লক্ষ করা যায়। সমাজও মনে করে মায়ের গুণেই কন্যা সর্বগুণান্বিতা হয়। মা ভাল না হলে তার মেয়েও ভালো হয় না।

৮।। মা গুণে ঝি, বাপ গুণে পো।

আবার মায়ের প্রাণ সর্বদাই কন্যার জন্য উতলা হয় কিন্তু কন্যা তার স্বামীর প্রতিই আকৃষ্ট থাকে। একথা খুব সম্ভবত মায়ের প্রজন্মেরই মন্তব্য, তাই পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি এই শ্লেষ লক্ষ করা যায় –

৯।। মা মরে ঝিয়ের তরে, ঝি মরে ভাতারের তরে।

১০।। মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ।।

১১।। মেয়ের মায়ের মত, কথাবার্তা যত।।

আবার কখনো দুই প্রজন্মের মধ্যে অবস্থার সামঞ্জস্য না থাকলেও সমাজ তাকে সমালোচিত করে। অসুন্দর মায়ের সুন্দরী কন্যা কিংবা দরিদ্র মায়ের ধনী কন্যাও ...লোচনার পাত্র হয়ে ওঠে। দুই প্রজন্মের এই গুণগত বা অর্থগত ব্যবধানও ... বাঁকা চোখে দেখে –

১২।। মায়ের নাম চিন্তেকানী, মেয়ের নাম পদ্মরাণী।।

১৩।। ঘুঁটে কুড়ুনির বেটি পেল রাজপুত্তুর বর,
মুড়ি-মুড়কি দেখে বলে 'কোন্ গাছের ফল!'

আবার মা-মেয়ের মধ্যে যতই রক্তের টান থাক না কেন, দুজনেই নিজের নিজের সংসারকেই প্রাধান্য দেয়, তাই দুজনেই ব্রত করে নিজের স্বামী সন্তানের মঙ্গলার্থে। সেখানে একের ফলে অন্যের মঙ্গল হয় না। তাই প্রবাদে শুনি –

১৪।। মায়ে-ঝিয়ে ব্রত করে, যার যার ভাল সে করে।

এর উল্টোটাও অবশ্য দুর্লভ নয়, যেখানে মা ও মেয়ে দুই প্রজন্মই পরস্পরকে টানে, কিন্তু জামাই সেখানে পরের ছেলে, তার জন্য মা-মেয়ের অত আগ্রহ নেই –

১৫।। যা ছিল আমানি-পান্তা মায়ে-ঝিয়ে খেনু
ঘরজামাই রামের তরে ধান শুকাতে দিনু।।

অর্থাৎ বাড়িতে যা খাদ্যবস্তু ছিল তা মা-মেয়ে ভাগ করে খেয়ে জামাইকে ধান শুকানোর গল্প দিয়ে ভবিষ্যতে খাবার পাবার আশ্বাসটুকু দিয়েছে। বাংলার সামাজিক প্রেক্ষিতে রসিক লোককবির সূক্ষ্ম শ্লেষ প্রবাদটিকে অন্যতর ব্যঞ্জনা দিয়েছে। ঠিক যেমন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পিতা ও পুত্রের লড়াইকে সমাজ কখনোই ভালো চোখে দেখে না। পুত্রের স্বাভাবিক প্রাপ্তিযোগ ঘটেই, তা সত্ত্বেও যখন পুত্র অর্থের জন্য সম্পত্তির জন্য বিবাদ করে, পিতার মৃত্যুকামনা করে তখন সমাজ প্রবাদের কষাঘাতে লোলুপ পরবর্তী প্রজন্মকে সচেতন করতে উদ্যোগী হয় –

১৬।। বাবা মরল ভালো হল
দুটো হুঁকোই আমার হল।।

শুধু পিতা-পুত্র কিংবা মাতা-কন্যা এই দ্বৈত প্রজন্মকে কেন্দ্র করেই প্রবাদের এই কষাঘাত আপতিত হয় না, সেই মহাভারতের সময় থেকেই মামা-ভাগ্নে সম্পর্কটি তথা গৃহস্থ পরিবারে মামার অযাচিত হস্তক্ষেপ বা এ জাতীয় ভূমিকা সমাজ ভালো চোখে দেখে না। কথায় আছে 'কংসমামার আদর' অর্থাৎ মামা মানেই কৃষ্ণের মৃত্যুকামী কংসমামার প্রতিরূপ!

১৭।। মামার বড় ভালোবাসা, কলা খেয়ে দেয় খোসা।।

১৮।। মামা বাপের জবানীতে 'শালা'।।

এ তো গেল ভাগ্নের জবানীতে মামার সমালোচনা, আবার মামার দৃষ্টিতেও ভাগ্নে সমালোচিত হয় প্রবাদেরই দর্পণে –

১৯।। জন জামাই, ভাগ্না, তিন নয় আপনা।।

২০।। মামার হলে ভাগ্নে পায়, ভাগ্নের হলে মামার বাবাও নয়।।

২১।। চালের দর কত? না মামার ভাতে আছি।

আবার একই সমাজ মামা ও ভাগ্নের মধ্যেকার হৃদ্যতাকেও ভালো চোখে দেখে না, উপমিত করে শকুনিমামা ও দুর্যোধনের সর্বগ্রাসী সম্পর্কের সঙ্গে।

২২।। মামা ভাগ্নে যেখানে, আপদ বালাই সেখানে।।

২৩।। মামা-ভাগ্নে-জামাই-শালা আর পোষ্যপুত।
ঘরে ঘরে বিরাজ করে এই পাঁচটি ভূত।।

এ নমুনা আরও বাড়ানো যায়। মামা ও ভাগ্নে দুই প্রজন্মের মধ্যে সময়, সমাজ প্রেক্ষিত কিংবা অবস্থানগত ব্যবধান সত্ত্বেও কখনো এ-দুই অনুষঙ্গ একাকার হয়ে যায় আবার কখনো দ্বৈত বৈপরীত্য আত্মীয়তা (kinship)-এর ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করে। পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা কিংবা মামা-ভাগ্নে একই পরিবারের প্রত্যক্ষ রক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েও প্রজন্ম ব্যবধানে দ্বন্দ্বে রত হয় কিংবা জটিল সম্পর্কের আবর্তে বিশ্লেষিত হয়। সুতরাং অনুমান করা কঠিন নয় শাশুড়ি-বৌমার সম্পর্কটি কত তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে! শুধু এদেশে নয় এ সম্পর্কটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমাজেও চর্চিত হয় এর বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা ও জটিলতার জন্য। সমাজ ও সভ্যতার সেই আদিকাল থেকেই পুত্রের দখল নিয়ে মাতা ও পুত্রবধূ লড়াই চিরন্তন। কখনো সমাজ শাশুড়ির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাদে বধূমাতাকে শ্লেষের চাবুক কষিয়েছে –

২৪।। বউ না রে বউ না, গরল ডাকিনী।
দিনের বেলা মানুষের ছা, রাত হলে বাঘিনী।।

২৫।। পুতের বিয়ে আপনি দিলাম বউ ঘরে এল।
সঁপে দিলাম গেরস্থালী, গিন্নিপনা গেল।।

২৬।। বউয়ের চলন ফিরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।

২৭।। লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে।

২৮।। পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
উনুনমুখী বউ এসে বাটায় পান খায়।।

২৯।। কাজ নেই, বউ অকাজ করে।
চালে ধানে এক করে।।

৩০।। জাড়কালে জাড় কাঁটা, গরম কালে ঘামাচি
কোন্‌কালে বউ রূপসী!

৩১।। বউয়ের গলার স্বর কেমন
শালিক কেঁকায় যেমন।।

৩২। দিন গেল হেসে খেলে। রাত হলে বউ কাপাস তোলে।।

৩৩।। মায়ে বিয়লো, বউয়ে পেল,
কার ধন কার!

৩৪।। বেটা বিয়োলাম বউকে দিলাম
ঝি বিয়োলাম, জামাইকে দিলাম
আমি হলাম বাঁদি।

এখন পা ছড়িয়ে কাঁদি।।

পারিবারিক সম্পর্কের পরিসরে শাশুড়ি-বউমার সম্পর্কটি-ই যে সবচেয়ে 'সরগরম' সৃষ্টিকারী তা এর সংখ্যাধিক্যই প্রমাণ করে। তবে শুধু শাশুড়ির চোখে পরের প্রজন্মের বউমাটিই যে সমালোচিত হয়, তা নয়, বউমার পক্ষ থেকেও শাশুড়ি সম্পর্কে বহু-বিষোদ্‌গার লক্ষ করা যায় –

৩৫।। শাশুড়ি মলো সকালে,
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে তো কাঁদবো আমি বিকালে।

৩৬।। বউমা ক্ষীর রইলো খাবে,
যদি খায় তো যমের বাড়ি যাবে।

শাশুড়ির প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্বেষে তার মৃত্যু চিন্তা এমন সর্বব্যাপী হয়ে যায় যে শাশুড়ি মরলেও আফশোস করার কোন অবকাশ সেখানে থাকে না। দ্বিতীয় প্রবাদটিতে বউমা বলছে যে শাশুড়ি তাকে মিষ্ট মুখে যখন ক্ষীর খাবার অনুরোধ করে তখন তার আড়ালে থাকে গূঢ় হত্যার অভিসন্ধি। ঠিক যেমন নিচের প্রবাদে বউমার মা'র জবানীতে প্রশ্ন ধ্বনিত হয় মৃত্যুপথযাত্রী শাশুড়িকে ঘিরে, দ্বিতীয় পংক্তিতে বউমার ব্যাখ্যান এ দুই সম্পর্কের জটিলতাকে প্রতিফলিত করে –

৩৭।। 'একলা ঘরের গিন্নী হলি নাকি মা?'
'নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নেই নড়ছে যেন পা!'

বাংলা মৌখিক সাহিত্যের সূক্ষ্ম স্থাপত্য তথা মৌখিক অভিব্যক্তির রসঘনতার এক অনন্য নিদর্শন এই প্রবাদগুলি। সরস অথচ তীব্র। সূক্ষ্ম অথচ গভীর দর্শন যে রচনার বুনোটে স্পষ্ট। শাশুড়ি ও বধূমাতার সম্পর্কের জটিল প্যাটার্ন এখানে শুধু প্রজন্ম ব্যবধানের কারণেই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমাজ-মনস্তত্ত্বের (Socio-psychology) আরও নিগূঢ় তত্ত্ব – ক্ষমতার লড়াই, দখলের প্রবণতা, এমনকি আদিম যৌন সম্পর্কের অন্তর্লীন অধিকারবোধ। তাই এই দ্বন্দ্ব পিতা ও জামাতার মধ্যেও সুবিস্তৃত। তাই শ্বশুরের আক্ষেপ –

৩৮।। সারাজীবনে কামাই, নিয়ে গেল জামাই।।

৩৯।। খেয়ে বাঁচলে কামাই, মেয়ে বাঁচলে জামাই।।

৪০।। মেয়ের জন্য জামাই আদর, নইলে জামাই গাছের বাঁদর।।

আবার জামাইয়ের দৃষ্টিতেও শ্বশুর কাঠগোড়ায় অবস্থিত। বিশেষ করে ঘরজামাইয়ের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সমাজ যেমন কঠোর, জামাইও স্পর্শকাতর –

৪১।। ঘর জামায়ে পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ।।

৪২।। শ্বশুর বাড়ি মধুর হাঁড়ি
তিনদিন বাদে ঝাঁটার বাড়ি

৪৩।। দূরের জামাই কৃষ্ণমোহন, ঘরের জামাই কেষ্টা।
খাত খাবে এসো কৃষ্ণমোহন, ভাত খাবি আয় কেষ্টা।

বাংলার প্রবাদ ভাণ্ডারে সম্পর্কের চালচিত্র এত সুবিস্তৃত যে প্রজন্মের প্রতিটি অংশই সেখানে বিম্বিত। শুধু দুই প্রজন্ম নয়, একসঙ্গে তিন প্রজন্মও সেখানে চিত্রিত হয় –

৪৪।। ছেলে দিয়েছে পোঁদে বাঁশ, বাকি রয়েছে নাতি।।

৪৫।। যার বংশ না বাড়ে, তার নাতি আগে মরে।।

৪৬।। যেমন মা, তেমন ঝি; তার বাড়া নাতনিটি!

৪৭।। নাতিপুতির গুষ্টি, নাই ঠিকুজি কুষ্টি।

৪৮।। নাতির নাতি, স্বর্গে বাতি।।

৪৯।। অভাবে নাতজামাই ভাতার।।

৫০।। একেই নাচুনিবুড়ি, তায় নাতনির বিয়ে।।

এভাবে দাদু-নাতি কিংবা ঠাকুমা-নাতি, মা-মেয়ে-নাতনি প্রজন্মের প্রতিটি ধাপ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, ধিকৃত হয়, সমালোচিত হয় কিংবা চর্চিত হয়। একাধিক প্রজন্মের সম্পর্কের বিভিন্ন মাত্রাগুলো বাংলা প্রবাদ বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ব্যাখ্যা করে। এ ব্যাখ্যান তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল, তাদের নিজস্ব ভাবনাপ্রসূত। এখানেই এই মৌখিক অভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতা।

তথ্যঋণঃ

১।। দে, সুশীল; বাংলা প্রবাদ (ছড়া ও চলতি কথা); ১৩৫২ বঙ্গাব্দ; এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা.লি ; কলকাতা।

২।। ঘোষ, বাসুদেব; প্রবাদের গল্প; ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র; তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ; প.ব. সরকার; কলকাতা।

৩।। সাহা, লক্ষ্মী; বাংলা লোকসাহিত্যে স্বজন সম্পর্ক; ২০০৮; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; কলকাতা।

৪।। 'The Blackwell Encyclopedia of Sociology'; Edited by George Pitzer, 2007 Vol IV, Black well Publishing, USA.

৫।। http: // dictionary, reference.com/browse/generation gap.

৬।। Ramaa Prasad, Generation Gap – a Sociological Study of Inter-generational Conflicts, 2012, Mittal Publication, India.

....

প্রজন্ম ব্যবধান ও লোকায়ত সংস্কৃতি

ড. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সেটটা নোকিয়া বা স্যামসং অথবা চায়না স্বল্পদামের কোন মোবাইল। 2 GB থেকে 16 GB বা তারও বেশি Expandable মেমোরী। উচ্চস্বরে, কখনোবা হেডফোনের সহযোগিতায় চলছে সংগীত রসাস্বাদন। হিন্দি, ফিল্মি গান, আধুনিক বাংলা গান প্রভৃতির চল বেশি। অধুনা বাউল, গাজন গান, লোকসংগীতের শ্রোতার সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিষ্ট সমাজের মানুষজনও লোকসংগীত ধারায় পুষ্ট হচ্ছেন। তার মানে এই নয় যে, শিষ্ট-সভ্য মানুষেরা কোনদিন লোকসংগীত শোনেন নি বা চর্চা করেননি। আমার বক্তব্য যেটুকু রেখে ঢেকে হত, সেই আবরণটা যেন বেশ শিথিল হয়েছে। ফলত মেঠো গেঁয়ো মানুষের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ আজ লোকসংগীত শুধু নয় লোকসংস্কৃতিমুখী। লোকসংস্কৃতির চর্চা করছেন বা চেষ্টা করছেন বা অন্বেষণ করছেন।

ব্লু-টুথ অন করে লোকসংগীতের আদান-প্রদান, ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ঘেঁটে পছন্দের লোকসংগীত খুঁজে বের করা বা লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান শিল্পের বিবিধ রূপ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা প্রভৃতি বর্তমানে লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাঙ্গণকে বিস্তৃত করেছে। বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংস্কৃতির বহু তথ্যের পাশাপাশি বিদেশের লোকচর্চার নানা তথ্য আধুনিক গণমাধ্যমের সহায়তায় আজ সহজলভ্য। যে কোন সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের উন্নত আবিষ্কারের প্রয়োগ সংস্কৃতির স্বরূপ, পরিসর, বিবর্তনকে শাণিত করে। সংগীতের চলচিত্রায়ণও হাতের মুঠোয়। অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় চলভাষ নামক ছোট্ট যন্ত্রটি আজ নানা আনন্দজনক উপাদানের সহায়ক। এবং এর ব্যবহার ধনী-দরিদ্রের সীমাকে মিলিয়ে দিয়েছে। অন্ধ ভিক্ষুও চলভাষ যন্ত্রের প্রভূত সুবিধা ভোগের অধিকারী।

মনে হতে পারে লোকসংস্কৃতিতে প্রজন্ম ব্যবধান আলোচনা প্রসঙ্গে চলভাষ যন্ত্রের বা কম্পিটার যন্ত্রের এত গুণাগুণ বর্ণনার কি কোন প্রয়োজন আছে? আর লোকসংগীতের উপস্থাপনায় বা শুধুমাত্র কেন? উদ্দেশ্য একটাই লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম জনপ্রিয় শাখা লোকসংগীতের উদাহরণকে সামনে রেখে বর্তমান প্রজন্মে লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রসার কীভাবে হচ্ছে বা হতে পারে, সেই দিকটিই স্পর্শ

করা। অত্যাধুনিক বিনোদনের বাজারে লোকশিল্প-সংস্কৃতি ব্রাত্য নয় বরং সময়কে মেনেই অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই লোকসংস্কৃতির বিলুপ্তি নয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রাকৃতিক নিয়মে প্রবাহিত হওয়াই তার ধর্ম। তাকে আটকানো যায় না। নিত্যনতুন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে তার সঙ্গমলীলা অস্বীকার করার অর্থ পিছিয়ে পড়া। সংকীর্ণ ফ্রেমবন্দী হয়ে যাওয়া।

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি ভাবনার কথা অনুরণিত হয় – লোকসংস্কৃতি তার মৌলিকতা হারাচ্ছে। বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রথমেই বলি এই ভাবনাটাই অমূলক। লোকসংস্কৃতির মৌলিকত্বও আছে আবার তার অশুদ্ধতা, কৃত্রিমতাও সমান্তরাল প্রবহমান। কোনটিকেই আমরা আটকাতে পারবো বলে মনে হয় না। বিষয়টি বহুচর্চিত। আমি সে বিষয়ে খুব বেশি প্রবেশ করবো না। আমার উদ্দিষ্ট প্রজন্ম ব্যবধানের মধ্যে লোকসংস্কৃতির প্রসার, চর্চা কীভাবে বিস্তার লাভ করছে। নব্যসমাজ কীভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সেখানে হা-হুতাশের কোন স্থান নেই।

লোকসংস্কৃতির এই পরিবর্তন, রূপান্তর নিয়ে দেশি-বিদেশি লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডাইকোটমি-ট্রাইকোটমি প্রভৃতি নানা তত্ত্ব খাড়া করেছেন। চেষ্টা করেছেন লোকসংস্কৃতির বিশুদ্ধ ধারাটিকে স্বতন্ত্র করে রাখতে। উদ্ভূত হয়েছে ফোকলোর থেকে ফেকলোর (Folklore), প্যারাফোকলোর (Para Folklore) প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্ব। লোকসংস্কৃতির বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য পরিবর্তন, পরিমার্জনকে রিচার্ড এম. ডরসন ফোকলোরের বিকৃত রূপ হিসাবে গণ্য করে তাকে Folklore হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এটিই ডাইকোটমি মডেল (Dichotomy Model)। ডরসন ফোকলোরের বাণিজ্যিক ব্যবহারকে সরাসরি একধরনের জালিয়াতি করা উৎপাদন হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। প্রয়াত শ্রদ্ধেয় স্যার ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় এই ডাইকোটমি মডেলকে ভারতীয় প্রেক্ষিতে প্রসারিত করলেন। প্যারা ফোকলোর (Para Folklore) নামে একটি স্বরচিহ্নিত করে ট্রাইকোটমি মডেল (Trichotomy Model) সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ ফোকলোর থেকে ফোকলোর (Folklore)-এর মধ্যবর্তী স্তর হল প্যারাফোকলোর। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন অনেক পরিবর্তন দেখা যায়, যা বিকৃত লোকসংস্কৃতি নয় আবার খাঁটি লোকসংস্কৃতিও বলা যায় না। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় একেই প্যারাফোকলোর বলেছেন। এ প্রসঙ্গে 'ফোকলোরিসমাস' (Folklorismus) বিষয়টিও উল্লেখের দাবি রাখে। লোকসংস্কৃতির উপাদানের বাণিজ্যিক ব্যবহারকে ফোকলোরিসমাস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। হান্স্ মোজা-র মতে অনেকেই ফোকলোরিসমাসের এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার লোকায়ত সমাজ বহির্ভূত মানুষজন লোক শিল্পকলার অনুরূপে কিছু সৃষ্টি করলে তাকেও ফোকলোরিসমাস (Folklorismus)

বলার চল আছে। এইভাবে নানা তত্ত্ব-তথ্যের প্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার, পরিবর্তন, পরিমার্জনকে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে।

আবার লোকসংস্কৃতির উদ্ভবের ক্ষেত্রে প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের অষ্টদ্বন্দ্ব তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। কৃষি-শিল্প, গ্রাম-নগর, স্বাক্ষর-নিরক্ষর প্রভৃতি বিবিধ পরিস্থিতিতে সংহত জনগোষ্ঠীর একক বা সার্বিক প্রচেষ্টায় লোকসংস্কৃতির জন্ম হতে পারে। কোন নির্দিষ্টকাল বা স্থানের মধ্যে লোকায়ত সংস্কৃতির উদ্ভব সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং আধুনিককালে পল্লীগ্রামের উন্নয়নের কারণে লোকায়ত সংস্কৃতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে – একথা সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম লোকসংস্কৃতির নানারূপান্তর, গ্রহণ-বর্জন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

প্রজন্ম ব্যবধানে লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি, প্রসার সবই স্বাভাবিক – এই কথাটি উপস্থাপনের জন্যই একটু পশ্চাতমুখী হওয়া এবং পূর্ব আলোচনা। লোকায়ত সমাজ বহির্ভূত শিষ্টসমাজের সংস্কৃতি স্বতত পরিবর্তনশীল। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্ট সংস্কৃতির পরিবর্তন পরিবর্ধন যেমন স্বাভাবিক লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই। লোকায়ত সমাজ রাষ্ট্রের বাইরে নয়। রাষ্ট্রের উন্নীত, সুফল, সর্বত্র প্রসারিত হওয়াই নিয়মসিদ্ধ। সেক্ষেত্রে পল্লীসমাজের উন্নয়ন, লোকায়ত সমাজের উর্ধ্বগমন তো থেমে থাকবে না। আজ গ্রামে বসেই অনলাইনে ফর্ম ফিল-আপ, টিকিট বুকিং থেকে শুরু করে ইন্টারনেট সংক্রান্ত সমস্ত কাজই সম্পাদিত হচ্ছে। মোবাইল এখন হাতে হাতে। সেখানে লাঙল, ট্রাকটার দিয়ে চাষের কাজের পাশাপাশি জমির আলে মোবাইলে মনের মত গানও বেজে চলেছে। গরুর গাড়ির বিলম্বিত লয় আছে, আবার বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারও সমান্তরালভাবে প্রবহমান। অতএব লোকসংস্কৃতির বারোটা বাজল, কারণ লোকসংস্কৃতি তো অপরিসীম দারিদ্র্যপূর্ণ পল্লীবাংলার গর্ভ ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং পল্লীবাংলার উন্নয়ন স্তব্ধ হোক অন্তত লোকসংস্কৃতির বেঁচেবর্তে থাকার জন্য। বিজ্ঞানের পরিবর্তন, রাষ্ট্রব্যবস্থার উর্ধ্বগমন, সামাজিক-রাজনৈতিক পালাপরিবর্তনে শিষ্ট সংস্কৃতির কৌলিন্য বিঘ্নিত হয় না। শিষ্ট সংস্কৃতি ভদ্রজনের সৃষ্ট বলে তার সময়ের সঙ্গে তাল মেলানোর হক আছে। কিন্তু অ-শিষ্ট সমাজের সংস্কৃতিতে আধুনিক সময়ের প্রভাব কেন পড়বে? অতএব আজ থেকে ২০-৩০ বছর পূর্বে বাংলার গ্রামগুলির যে দুর্দশা ছিল সেই অবস্থাতেই স্থবির হয়ে যাওয়া উচিত। টিভি, মোবাইল, কম্পিউটার – যান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা শহরে গণ্ডীবদ্ধ হওয়াই সমীচীন। তাহলেই লোকসংস্কৃতির জন্ম, শুদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে আর হাঁসফাঁস করার ভাবনা থাকে না।

ঘটনা হল বিজ্ঞানের, সমাজের অগ্রগতিকে কি স্তব্ধ করা যায়? কোনো একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়? করা যায় না। বরং বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে

অস্বীকার করার অর্থ পিছিয়ে পড়া, মূর্খামি। স্বাভাবিক নিয়মেই নগর-গ্রাম, স্বাক্ষর-নিরক্ষর সকল স্তরেই কালের প্রভাব পড়বে। সেই প্রভাব খারাপ- ভাল দুভাবেই আসবে – শিষ্ট বা অশিষ্ট উভয় সংস্কৃতিতে। দ্রুত সময়ের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, আধুনিকতার রঙ বদলাচ্ছে ঘন ঘন, সংস্কৃতি দূষিত হচ্ছে – শিল্প সাহিত্যে সর্বত্র সেই দূষণের গ্রাস চলেছে। তাই বলে কি শিষ্ট সংস্কৃতিতে সুন্দরের সৃজন হারিয়ে যাচ্ছে? একেবারেই না। বরং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নব নব উদ্ভাবনের জোয়ার আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিযোগিতা চলছে। সৃষ্ট হচ্ছে সময়ানুগ শিল্পকর্ম। মিডিয়ার কল্যাণে সে-সব খবর এখন মাউসে ক্লিক করলেই বিশ্বের কর্মসংস্কৃতি উন্মোচিত হচ্ছে। সেখানে লোকসংস্কৃতিই বা কেন পিছিয়ে থাকবে? নব্যযুগের দূষণ যেমন তাকে গ্রাস করছে আবার তারই মধ্যে শিষ্টসংস্কৃতির মতো নব নব ভাবনার জন্ম হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে লয় রক্ষা করে লোকায়ত সমাজ বদলাচ্ছে, তাদের সংস্কৃতিও সময়ের প্রভাবের স্পর্শে উজ্জীবিত হচ্ছে। এই কালধর্মকে মেনেই বর্তমান প্রজন্মের লোকায়ত সংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এখন কালান্তর কীভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির অন্দরকে দোলা দিয়েছে সে বিষয়ের আলোচনায় আসা যাক। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, সংগীত, ক্রীড়া, নাটক, হস্ত বা কুটিরশিল্প প্রভৃতি লোকায়ত সংস্কৃতির নানা শাখাতেই সময়ের প্রভাব কম-বেশি প্রবল। স্বীকার করে নেওয়া ভালো লোকসংস্কৃতির ছড়া-ধাঁধা-প্রবাদ শাখাগুলির নব নব সৃষ্টির স্থানে বর্তমানে খামতি বেশ। লোকায়ত সমাজে ছড়া যদিও কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, ধাঁধা-প্রবাদের ক্ষেত্রটি অনেকটাই এদিক থেকে পিছিয়ে। তবে চর্চার খামতি নেই। সারাদিনে প্রবাদ ব্যবহার করে না এমন মানুষ মেলা ভার। নিত্যনতুন প্রবাদের সৃষ্টি ক্ষীয়মান হলেও , প্রবাদচর্চা জীবনের প্রয়োজনে থেকে যাবে। ধাঁধা ক্ষেত্রটি বোধ হয় সবচেয়ে দুর্বল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, আনন্দমূলক অনুষ্ঠানে উচ্চ সমাজে ধাঁধার ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। কিন্তু লোকায়ত সমাজে ধাঁধার সৃষ্টি-প্রবাহ প্রশ্নের সম্মুখীন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় শিষ্টসমাজে প্রতিযোগিতার জন্য হোক বা অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্যই হোক ধাঁধার সৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে গাণিতিক ধাঁধা, চিত্রধাঁধা, পারিবারিক সম্পর্কজনিত ধাঁধা প্রভৃতির সৃষ্টি এবং ব্যবহার বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। প্রাচীন ধাঁধার পথ ধরেই এগুলি এসেছে। দূরদর্শনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধাঁধার প্রয়োগ চোখে পড়ার মতো এবং তাতে নবীন-প্রবীণ সব বয়সের উৎসাহ প্রবল। আমার মনে হয় ধাঁধার ব্যবহার-সৃষ্টি লোকায়ত সমাজ থেকে শিষ্ট সমাজে এখন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। অবশ্য এর পশ্চাতে ধাঁধার বুদ্ধিদীপ্ত দিকটিই প্রধান কারণ। ধাঁধার একটি বিজ্ঞান আছে – যা একসঙ্গে মজা আনে আবার মস্তিষ্ককে নাড়িয়ে দেয়।

ছড়ার সৃষ্টি কম হলেও লোকায়ত শিষ্ট উভয় সমাজেই এর ব্যবহার প্রবল।

বিশেষত ছেলে ভুলানোর ক্ষেত্রে ছড়ার প্রয়োগ করেন না – এমন মা-ঠাকুমা আজও বিরল। ছড়ার সাহিত্য বা শিল্পরস থাকার কারণে তার আবেদন মস্তিষ্ক ছাড়িয়ে হৃদয়ে স্পর্শ করে। সঙ্গত কারণে তাল মিলিয়ে ছড়া সৃষ্টির সহজাত অভ্যাস হারিয়ে যাওয়ার নয়। নববর্ষ, বিজয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ছড়ার মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন লোকসমাজেও প্রচলিত। মোবাইল নামক চলভাষ যন্ত্রটির মধ্যদিয়ে মুহূর্তেই প্রিয়জনের কাছে তার শ্রদ্ধাপূর্ণ মেসেজ পাঠাচ্ছেন কচি থেকে বুড়ো সকলেই। বিশেষত এ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা এই সিস্টেমের সঙ্গে অতিমাত্রায় জড়িত। এছাড়া প্রেম নিবেদনের ছড়া তো আছেই।

ক্রীড়ার সঙ্গে ছড়ার যোগ উল্লেখযোগ্য। গ্রাম-গঞ্জে এমনকি শহরের বিভিন্ন স্কুলগুলি ঘুরে দেখলে নানা ক্রীড়ামূলক ছড়ার সন্ধান পাওয়া যাবে। এটি একটি স্বতন্ত্র গবেষণারও বিষয় হতে পারে। ছড়া এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে ছড়িয়ে পড়ে। নিত্য নতুন ছড়াও চলে আসে। সৃষ্টিকর্তা অজ্ঞাত। প্রত্যেকেই কারো না কারোর মুখে শুনে স্কুলে অথবা স্কুলের বাইরে খেলার সময় সেটি অন্যান্য বন্ধুদের জানিয়ে দেয়। শিখিয়ে দেয় খেলার নিয়ম-কানুন। বর্তমানে গ্রাম-গঞ্জের স্কুলগুলিতে বা বিকেলে খেলার সময়ে বৌ-বাসন্তী, ছু-কিত-কিত – এসব খেলার পাশাপাশি ছড়াকেন্দ্রিক কিছু খেলার সন্ধান সহজেই মিলে যায়। এগুলি মূলত মেয়েদের খেলা এবং ছোঁয়াছুয়ি বা ফুড়ি হওয়ার খেলা। দু-একটি খেলা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে –

ক) মেলা রে মেলা
আমরা করি খেলা।
একটি মেয়ে বসে আছে
যার কোন বন্ধু নাই
উঠ রে উঠ চোখের জল মুছ
আকাশের দিকে তাকাও
যাকে পাবে তাকে ছো।   (বাঁকুড়া)

ছড়াটি বলার পরই মেয়েটি (যে মেয়েটিকে ঘিরে ছড়াটি কাটা হয়) উঠে দাঁড়িয়ে তার মনমত একজনকে ছোঁবে এবং পরে তাকে ঘিরে আবার ঐ একই ছড়ার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই ছড়াটিই শহরাঞ্চলে একটু পরিবর্তিত হয়ে যে রূপলাভ করেছে সেটি এরকম –

"মেলা রে মেলা
আমরা করি খেলা।
এই মেয়েটা ওঠ
চোখের জল মোছ
আকাশের দিকে তাকা

তোর প্রিয় বন্ধুর নাম বল।"

তবে খেলাটি একইরকম। তাই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

খ) "প্যাকেট প্যাকেট চেনাচুর
কে যাবি রে দুর্গাপুর
দুর্গাপুরের পাকা আম
আম খাবিত পয়সা আন।" (বাঁকুড়া)

'পয়সা আন' কথাটি যার কাছে এসে শেষ হবে সে উঠে যাবে। এইভাবে একজন করে উঠতে উঠতে যে শেষজন থাকবে সে হবে মোর বা ফুড়ি। তাকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত গুনতে বলা হবে। অন্যেরা তখন লুকিয়ে পড়বে। এরপর যে ফুড়ি হয়েছে সে তার বন্ধুদের এক এক করে খুঁজবে। যদি সবাইকে খুঁজে বের করতে পারে তবে প্রথমে খুঁজে পাওয়া ছেলে বা মেয়েটি ফুড়ি হবে এবং একই ভাবে তাকেও সংখ্যা গুনতে হবে ও লুকিয়ে থাকা বন্ধুদের খুঁজে বের করতে হবে। আর যদি ফুড়ি হওয়া খেলোয়াড় ধাপ্পা খেয়ে যায় তাহলে তাকেই আবার নতুন করে সংখ্যা গুনতে হয়। সংখ্যা সাধারণত ৫০-১০০ পর্যন্ত গোনার রীতি। অতএব আধুনিকতম জনমোহিনী আনন্দজনক মাধ্যমও আছে আবার ছড়াও আছে।

একথা তো ঠিক টিভি, মোবাইল প্রভৃতি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমগুলি গ্রামীণ জীবনের অখণ্ড অবসরকে ব্যস্ত করে তুলেছে। সুতরাং ছড়া-ধাঁধা- প্রবাদ তৈরির অবকাশ কোথায়? ছেলেভুলানোর অত্যাধুনিক উপকরণও যথেষ্ট। আর সিরিয়ালের ভুলভুলাইয়া ছেড়ে এসব নিয়ে মেতে ওঠার মানসিকতা অনেকখানি হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাচ্ছে। তাই বলে তো টিভি বা মোবাইল বা কম্পিউটারকে গালাগাল দিতে পারি না – অস্বীকার করতে পারি না। আগামী দিনে এসমস্ত অত্যাধুনিক দ্রব্য ব্যবহার মধ্যেই অন্যরূপে লোকসংস্কৃতির জন্ম হবে অনেকক্ষেত্রেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অন্যদিকে একথাও মানতে হবে সময়ের সঙ্গে যা কিছু পরিবর্তনশীল নয় কিংবা খাপ খাওয়াতে পারে না – তাকেই পিছিয়ে পড়তে হয়। হারিয়ে যেতে হয়। তখন সংরক্ষণের প্রশ্ন এসে পড়ে। শিষ্ট সংস্কৃতিতেও অনেকসময় বিষয় লুপ্তপ্রায়, লুপ্ত পাচ্ছে – নবসৃষ্টির জন্য স্থান করে দিতে হচ্ছে। বা নবসৃষ্টিই তার বৈশিষ্ট্যগুণে জনসমাজে স্থান করে নিচ্ছে। এতে আপত্তির কিছু নেই। দীর্ঘশ্বাস অপ্রয়োজন। এক্ষেত্রে যেটি বাঞ্ছনীয় তা হল অতীতের সংরক্ষণ, মর্যাদাদান। সে শিষ্ট বা অশিষ্ট সব সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই। সেদিক থেকে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা অন্যতম।

এবার আসি লোকসংগীত প্রসঙ্গে। লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম উজ্জ্বল শাখা। দিনের পর দিন এই সঙ্গীতধারার প্রাসঙ্গিকতা বেড়েই চলেছে। দেশে-বিদেশে বাংলা লোকসংগীতের জয় জয়কার। অনেকক্ষেত্রে লোকশিল্পীরা হয়তো মূল্য পান না কিন্তু তাঁদের মেঠো সঙ্গীত পরিবেশন করে শিষ্টসমাজের মানুষজন করে-কম্মে

খাচ্ছেন। বর্তমান প্রজন্মে লোকসঙ্গীত ধারাটি কেমনভাবে সময়কে আত্মস্থ করছে সেই বিষয়টি আলোকপাতের প্রয়োজন আবশ্যিক। লোকসঙ্গীত মানেই দোতরা, একতারা, হারমোনিয়াম, বাঁশি, ঢোল এসব আর ভাবলে চলে না। গানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক সময়ে এর পাশাপাশি গীটার, কীবোর্ড, অক্টোপ্যাড প্রভৃতিও ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং তাতে গানের মর্যাদাহানি হয় না। এক্ষেত্রে গানের কথা-সুর লোকায়ত বৈশিষ্ট্য যাতে হারিয়ে না ফেলে সেদিকটাই লক্ষণীয় বিষয়। স্বভাবতই বাউল –ফকির কিংবা কোনো শিল্পীর অনুষ্ঠানে অত্যাধুনিক বাদ্যযন্ত্র, সাউণ্ডসিস্টেম থাকাটা সময়োপযোগী এবং এখন এটিই চলছে। লোকশিল্পীর দলে হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোলের সঙ্গে কীবোর্ড (Key board) আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। দোতরা শিল্পীর অভাব কীবোর্ড যন্ত্রটি সহজেই মিটিয়ে দেয়। উন্নতমানের কীবোর্ড একটা অনুষ্ঠানের হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, দোতরা প্রভৃতি নানা বাদ্যযন্ত্রের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারে। তবে একজন লোকশিল্পী সেই সুযোগ নেবেন না কেন? সুতরাং লোকগানের কথা-সুরে আঞ্চলিকতাকে অক্ষুণ্ন রেখে বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তন খুবই সঙ্গত ঘটনা। সুখের বিষয় বিগত-বর্তমান সরকার বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বহু লোকশিল্পী আজ প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা অত্যাধুনিক যন্ত্রসহযোগে লোকগান পরিবেশন করে দেশ-বিদেশ মাতাচ্ছেন। এবং নিত্যনতুন সঙ্গীত তৈরি করছেন। পুরানো ভাবনা, আধ্যাত্মিকতা, আধুনিকভাবনা রাজনৈতিক ভাবনা সবই তাঁদের সৃষ্টিকর্মে ধরা পড়েছে। আগেও পড়েছে এখনও পড়ছে। পড়বেও। সিডিও বেরুচ্ছে যথেষ্ট – এখন লোকগানকে তার কৌলিন্য বজায় রাখতে গেলে সিডিও বের করা উচিত নয়। দুয়োরে দুয়োরে, ট্রেনে-বাসে ভিক্ষা করে বা নৌকায় বসে গান করাটাই তো লোকশিল্পীর শোভনীয়। তার সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন সহজে মেনে যায় না। বিশেষত গতিশীল জীবন্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তা খাটে না। লোকগান সে রকমই একটি বিষয়।

এক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্যই উত্থিত হয় – গীটার, ড্রাম প্রভৃতি ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে একদল শিল্পী লোকসংগীত উদ্দাম নৃত্যসহযোগে চিৎকার করে পরিবেশন করছেন, সুর-তাল-কথার কোন ধার ধারেন না, পাশ্চাত্যবাজনা, সুরের পাঞ্চে লোকগানকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি নিজেদের তৈরি গানকেও লোকগান বলে চালিয়ে দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি – এর কী হবে? উত্তর একটাই এ জিনিস থাকবে, আটকানোর পন্থা অগণতান্ত্রিক। কারণ বহুমানুষ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতোই এধরনের পরিবেশিত লোকগান খাচ্ছেন। বিশেষত বর্তমান প্রজন্ম। এর বিরোধিতা মূল্যহীন বলেই মনে হয়।

এরই সঙ্গে আরো একদল লোকসংগীত শিল্পীর কথা উল্লেখ করতে হবে। যারা নানাভাবে লোকায়ত গানগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। চেষ্টা করছেন মূল সঙ্গীতের সুরকে খানিকটা বজায় রেখে আধুনিকগানের চলনকে আরোপিত

করা। আবার নানা রাগের মিশেল দিয়ে প্রচলিত লোকগানগুলিকে রাগাশ্রয়ী করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাও চালানো হচ্ছে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তান ব্যবহার করে মূলগানটিকেই গুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে কিছু নতুন করার প্রবণতায় তাঁদের উৎসাহ প্রবল। এঁরাও আছেন এবং থাকবেন।

আবার লোকায়ত শিল্পীদের থেকে গান সংগ্রহ করে, তাঁদের কাছে শিখেও যথাযথভাবে অর্থাৎ কথা-সুর-আঞ্চলিকতাকে রক্ষা করেও একদল শিল্পী লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন। আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে প্রচলিত লোকবাদ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে পরিবেশন করছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হারিয়ে যাওয়া লোকগানগুলি জনসমক্ষে এনে, পরিবেশন করে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটাচ্ছেন। এঁদের সঙ্গে প্রকৃত লোকশিল্পীদের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। শ্রেণিগত বা অবস্থানগত পার্থক্য একটা থাকে। কিন্তু তাতে লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না। এই দলের শিল্পীর সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সমস্ত শ্রেণি থেকেই আজ লোকগান চর্চার অঙ্গনে উপনীত হচ্ছেন। এটি লোকসংস্কৃতি তথা লোকসংগীতের ক্ষেত্রে এক বিরাট যুগোপযোগী পরিবর্তন। বড় বড় দাড়ি-চুলওয়ালা, আলখাল্লা পরা মাটির শিল্পীর পাশাপাশি জিন্স্- টি-সার্ট পরা যুবক-যুবতীও অনায়াসে মাটির গান যথাযথ রূপে উপস্থাপনের প্রয়াস চালাচ্ছেন। মাটির গানের এই বিস্তার বর্তমান যুগচাহিদারই সুফল।

সুতরাং লোকগানের মূলধারার শিল্পীদের সমান্তরালে পূর্বালোচিত ত্রিধারার শিল্পীরা থাকবেন। তাতে লোকসংগীতের ক্ষতি তো হয় না বরং যেভাবেই হোক লোকায়ত শিল্পের প্রসার ঘটে। আধুনিকতার চাপে কী ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, চটকা, জারি-সারি, টুসু-ভাদু, ঝুমুর বাউল হারিয়ে যাচ্ছে? গ্রাম-গঞ্জে কান পাতলে শুনতে পাবেন নিত্যনতুন বাউল-ঝুমুর-টুসু, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি নানা প্রকারের লোকসংগীতের ভাষা ও সুর। সি.ডি., চিপের (মোবাইল) মাধ্যমে শহরে বসেও সেই রূপান্তরের আঁচ উপলব্ধি করা যায়। দু-একটি গানের উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। প্রথম যে গানটির কথা বলব সেটি সমীরণ দাস বাউলের। আধ্যাত্মিকতার মোড়কে মানব জীবনের অসারতার এবং ঈশ্বর ভজনার প্রতি মনযোগী হওয়ার গান। ইদানীংকালের তৈরি। গানটি রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে এত বেশি বেজেছে তা কল্পনাতীত এবং আশ্চর্যের। লোকশিল্পীসহ বিভিন্ন মানুষের কণ্ঠেও এই গানটির পরিবেশন যথেষ্ট বলেই মনে হয়। গানটি হল –

“কত সাধনার ফলে
এমন সাধের মানব জনম পেলে
দু-দিন বাদেই সবাই চলে যাবে।
এই হরিনাম তুমি গাইবে কবে?”

আরেকটি লোকগানের কথা উল্লেখ করবো যেখানে সমাজে শ্রেণিবিভাজন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি সহজ-সরল স্বাভাবিকতায় উঠে এসেছে। তৎসহ উচ্চ সমাজের প্রতি একটু কটাক্ষও মিশে আছে –

"হামাক সান্তাল করেছেন ভগবান গ
হামি যদি ডাক্তার হতম
প্যাট করে ফুড়ে দিথম
পঁচিশ টাকা ভিজিট নিথম
দেখতিস আমার মান গ।"

এইভাবে গানটিতে শিক্ষক, বামুন প্রভৃতি অর্থনৈতিক সচ্ছল সমাজের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এবং সাঁওতালের মতো নীচু জাত হওয়ার আক্ষেপ প্রকট হয়েছে। ঝুমুর আঙ্গিকের এই গানটি বর্তমানের এক প্রখ্যাত লোকশিল্পী ষষ্ঠীক্ষ্যাপার রচনা। জনসমাজে গানটির সমাদরও যথেষ্ট। এভাবে নবীন লোক শিল্পীদের হাত ধরে বাংলা লোকগান এখন জোয়ারে বইছে।

ইদানিং আরো একটি প্রশংসার বিষয় লোকসংগীতের প্রসারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। উচ্চাঙ্গ সংগীত বা আধুনিক সংগীতের প্রোথিত যশা মানুষ-জন লোকশিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠান করছেন। বলা যায় Experiment করছেন। লোকগান, লোকবাদ্যের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ বা আধুনিক সংগীতের এমন Blending বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিদেশেও এই মিশ্রণ উপস্থাপন বেশ সমাদৃত।

প্রজন্ম ব্যবধানের কথা বলতে গিয়ে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে দেখা যাবে লোকগান আর লোকশিল্পীদের অবস্থান প্রাচীন অবস্থানে নেই। গুণি ব্যক্তিদের সহায়তায়, সরকারের সহায়তায় তাঁদের অবস্থান অনেক বদলেছে। লোকশিল্পীদের মুখে যখন বিদেশের গল্প শুনি, তখন গর্বে বুক ভরে ওঠে। অব্যক্ত ভালোবাসা আবেগপ্রবণ করে। পুরুলিয়ার ছৌ-শিল্পীদের কাছে শুনেছি দিনের পর দিন কীভাবে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পাশ্চাত্যের এক দেশ থেকে অন্যদেশে ঘুরে বেড়িয়ে বাংলার ছৌ-শিল্পকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছেন। বাউল, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া শিল্পীরাও একই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এ সবই সম্ভব হয়েছে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়। এই সহযোগিতা যত প্রসারিত হবে, সংকীর্ণতা মুক্ত হবে লোকশিল্পী ও শিল্পের ক্ষেত্রে ততই মঙ্গল। গ্রামে-গঞ্জে এখনও বহু গুণি লোকশিল্পী আছে যাঁরা আজও অন্ধকারে। অনাহার, দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। মানবতার হাত তাঁদের কাছে পৌঁছাক। সরকারি ব্যক্তি-প্রাতিষ্ঠানিক যেভাবে হোক। উপদেশ নয় – এটি উপলব্ধির ব্যাপার। এবং আমরা সবাই দায়বদ্ধ। এই মহৎ কর্মটির ওপরেই লোকশিল্পের তথা লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নয়ন আরো বেশি সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু তা বলে এই সহযোগিতার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির বেঁচে থাকা, বাড়বাড়ন্ত একেবারেই সম্পৃক্ত হয়। খালি পেটের, বিষাদময়তা, উদয়-অস্ত শ্রম যন্ত্রণা থেকেই

লোকসংগীত-শিল্প উঠে এসেছে, উঠে আসছে একথা স্মরণে রাখা আবশ্যিক।

লোকনাট্যের বিভিন্ন প্রকার – গাজন বা গম্ভীরা, আলকাপ, বোলান প্রভৃতি। গাজনের চর্চা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। টিকিট কেটে আজও গ্রামে মফঃস্বলে গাজন গান শোনার ব্যবস্থা করা হয়। মূলত শীতকালীন কৃষিকাজের অবসরে গাজনের দল কলকাতার যাত্রাপাটির মত ছোট গাড়ি, ম্যাটাডোর প্রভৃতি যান ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ে। যাত্রার মত পালার আকর্ষণীয় নাম থাকে। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পালার শুরুতে শিবের বন্দনা গান, দেব-দেবীর ভজনা সমাপ্ত করে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা, পারিবারিক সম্পর্ক-কেচ্ছা, আধুনিক জীবনযাত্রার কুরুচিকর দিক সবই এসে পড়ে। রচনা যে খুব উন্নত মানের হয় না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকক্ষেত্রে খিস্তি খেউড়, অশ্লীলতা প্রাধান্য পেয়ে যায়। উল্লেখ্য গাজন গানে এখনও পুরুষেরাই নারীর অভিনয় করেন। এমন দক্ষ অভিনয় অভিনীত হয় যে, সহজে ধরা মুশকিল। দঃ ২৪ পরগনায় এই গাজন গানের ধারাটি এখনও বেশ জনপ্রিয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন বা গম্ভীরা গানের সূচনা হলেও, শীতে এই ধারার চল সর্বাধিক। এখনকার ছেলে-ছোকরার দলও এই গাজন গানের সঙ্গে যুক্ত। পোশাকে তারা আধুনিক, চলমান সময়ের প্রতিনিধি আবার গাজনেও আধুনিকতা স্থাপনে সদা সচেষ্ট। অত্যাধুনিক লাইট, মিউজিক থেকে শুরু করে চরিত্রানুযায়ী পোশাকে দলগুলি চমকপ্রদ পালা পরিবেশন করছেন। এটাই স্বাভাবিক। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ঠিকই কিন্তু সময় থেকে পিছিয়ে পড়তে রাজি নয় সেই ভূমিজ চরিত্ররা।

এখানে অবশ্য উল্লেখের প্রয়োজন মালদহের গম্ভীরার সঙ্গে দঃ ২৪ পরগনার গাজন গানের পার্থক্য আছে। সে বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। আলকাপ, বোলানও স্বতন্ত্র। বিশদ আলোচনার অবকাশ এস্থলে নেই। উদ্দিষ্ট বক্তব্য এটিই বিশেষত গম্ভীরা আলকাপ প্রভৃতি লোকনাট্যগুলিতেও পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, বিষয়, উপস্থাপনা সমস্ত বিভাগেই কালকে ধরার প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায়। আধুনিক সমাজের অবক্ষয়, কুরুচিকর ছবি বিজ্ঞাপন, মানুষের চাওয়া-পাওয়া, রাজনৈতিক-সামাজিক সমকালীন ঘটনা প্রভৃতি কখনো সরাসরি কখনো বা ব্যঙ্গের আকারে উপস্থাপিত হচ্ছে। আবার সমাজের ভালোদিকগুলিও তাঁদের চোখ এড়ায় না। এবং পালাগুলিকে কীভাবে জনসাধারণের চিত্তগ্রাহী করা যায়, তার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা থেকে। Content, Form এবং Presentation সবক্ষেত্রেই সিনেমা-যাত্রা-নাটকের প্রভাব লোকনাট্যগুলিকে প্রভাবিত করছে। যাত্রা-সিনেমা-নাটকগুলিও তো প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বারা প্রভাবিত। ভিনরাজ্যের সিনেমার রীতি হুবহু বাংলা সিনেমা যাত্রায় বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। তা বলে কি ক্লাসিক বাংলা সিনেমা-নাটক-যাত্রা হারিয়ে যাচ্ছে। আসলে দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে – এই নিরন্তর প্রক্রিয়াতেই সংস্কৃতি অগ্রসরমান। সুতরাং আখড়াও থাকবে, ধানও থাকবে। অথবা ধান থাকলে আখড়াও

থাকতে হবে।

লোকসংগীতের মতো লোকশিল্পও বহুপূর্বেই আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। বাঁকুড়ার পোড়া মাটির হাতি-ঘোড়া, টেরাকোটার কাজ, বালুচরী, শান্তিপুরের তাঁতের শাড়ী, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল সবই আজ জগৎ বিখ্যাত। এসবই পুরানো কথা। বক্তব্যের বিষয় হল, এই লোকায়ত শিল্পগুলি কিন্তু পুরানো অবস্থানে এখন আর নেই। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আধুনিক যুগ চাহিদার ছাপ স্পষ্ট। রঙ, তুলি, সুতো, যন্ত্রপাতি, বিষয়ভাবনা প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি যুগান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে। এছাড়া আরো বহু কুটির শিল্প বাংলার ঘরে ঘরে সযত্নে লালিত হচ্ছে। বিশেষত যেগুলির বাজার আছে। যার ব্যবহার নেই, বাজার নেই – সে লোকশিল্প হোক আর শিষ্টশিল্প হোক, তা লুপ্ত হবে। কিন্তু যে লোকশিল্পগুলির বাজারে চাহিদা আছে সেগুলির বাজার তৈরি করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সরকারিদপ্তরে সে প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছে। হস্তশিল্প মেলাগুলিতে গেলে বোঝা যায়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি নানা লোকজ উপাদান শহরবাসীর মন আকৃষ্ট করছে। ঘর সাজানোর উপকরণ, নিত্য ব্যবহার্য জিনিস-পত্র, আচার-বড়ি প্রভৃতি খাদ্য বস্তু, আসবাবপত্র সবই সহজেই আকৃষ্ট করে। দামও যথেষ্ট। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ডিজাইনিং দিন দিন বদলাচ্ছে। ছেনি, হাতুড়ির সঙ্গে সূক্ষ্মতার জন্য উন্নত ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে থাকলে পিছিয়ে পড়তে হবে এবং হারিয়েও যেতে হতে পারে। বরং যেটি দরকার ক্ষুদ্রশিল্প, কুটির শিল্প অবহেলার কারণে যেগুলি হারাতে বসেছে অথচ সাহায্য সুযোগ পেলে সে সমস্ত লোকজ শিল্পগুলি ঘুরে দাঁড়াবে, তাদের প্রতি সরকার, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া। এতে লোকশিল্প যেমন বাঁচবে লোকশিল্পীও নিজ কর্মের মধ্য দিয়ে, দক্ষতা প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে বাঁচার আনন্দ খুঁজে পাবেন। সঙ্গত কারণে বিশ্ববাজারের সঙ্গে লোকায়ত শিল্পকে যুক্ত করতে হবে। প্রক্রিয়া যেটুকু শুরু হয়েছে তাকে প্রসারিত করার প্রয়াস বৃদ্ধি পেলে লোকশিল্পীর ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে না।

যে পটুয়া খেতে পান না তার পট চিত্র যখন দামি পোশাকের গায়ে অঙ্কিত হচ্ছে তার কদর বেড়ে যাচ্ছে। যে মহিলা কুপি বা বিজলিবাতির আলোয় কাঁথায় আলপনা আঁকছেন তাঁর কদর নেই, অথচ সেই শিল্পই পোশাকের মোড়কে সমুদ্রের ওপার চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা পুরোপুরি 'নেপোয় মারে দই' আর কি। এখানে শিল্প দাম পাচ্ছে কিন্তু শিল্পীর পেট চালানো দায়। এই বৈষম্য কীভাবে দূর করা সম্ভব তা ভাবা দরকার এবং তা জরুরি।

এক্ষেত্রে মাদুরশিল্প, ডোকরা শিল্প, কাঁথা-শঙ্খ প্রভৃতি বহু শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায় যেগুলি আধুনিক উপকরণের সঙ্গে লোকায়ত উপকরণ, প্রণালী মিশ্রিত হয়ে অনেক বেশি উন্নত হচ্ছে। সুতরাং প্রজন্ম পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই লোকসংস্কৃতিও পরিবর্তিত হচ্ছে। শিষ্টসমাজের নানাক্ষেত্রে তার ব্যবহার বর্তমানে

বহুল বৃদ্ধি পেয়েছে – সেটা ফোকলোর হতে পারে, ফোকলোরিসমান বা প্যারাফোকলোর হতে পারে। কিন্তু লোকসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিও যুগের তালে এগিয়ে চলেছে এবং লোকায়ত মানুষই সেটি করছেন।

'লোকসংস্কৃতিতে প্রজন্ম ব্যবধান' বিষয়টি নিঃসন্দেহে বেশ বড় এবং আরো গভীর আলোচনার দাবি রাখে। সেক্ষেত্রে উক্ত আলোচনা সংক্ষিপ্ত। সমস্ত দিক তুলে ধরাও সম্ভব হয়নি। তবে প্রকৃত বক্তব্যটি বলবার চেষ্টা করেছি। লোকসংস্কৃতির রূপান্তর আর লোকসংস্কৃতির ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নানাভাবে ব্যবহার – দুটি বিষয় এক নয়। ভূমিপুত্র তাঁর নিজস্ব শিল্পের পরিবর্তন সাধন করবেন সেটি স্বাভাবিক। জোর করে তার রূপবদলের জন্য শিষ্ট সমাজের কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া বাসনা সেখানে খাটে না। লোকায়ত জীবনের স্বাভাবিক ছন্দেই তা পরিবর্তিত হবে। আবার সমস্ত লোকসংস্কৃতি, লোকায়ত সৃষ্টি বেঁচে থাকবে লুপ্ত হবে না – এমন মাথার দিব্যিও নেই।

একটি কথা উল্লেখ করে আলোচনা এবার সমাপ্ত করব। শুরু করেছিলাম মোবাইল দিয়ে শেষও করব সদ্য পাওয়া মোবাইলে একটি সচিত্র মেসেজের কথা দিয়ে। পুরানো কাক ও নতুন কাকের গল্প। পুরানো কাক কলসির তলার জল পাথর টুকরো ফেলে কলসির জল খাওয়ার চেষ্টা করেছে আর নতুন বা আধুনিক কাক স্ট্র বা পাইপ দিয়ে কলসির তলার জল সহজে পান করছে। এটিই প্রজন্ম ব্যবধান। শুধু লোকসংস্কৃতি নয় পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতিতেই এই বীক্ষণ প্রযোজ্য।

....

মেয়েলি আড্ডার একাল-সেকাল

মনুয়া পাঁজা

কোনো একটা কারণে ক্লাস সাসপেণ্ড ছিল সেদিন। স্টাফরুমে বসে হঠাৎই শ্রাবণীদি-র একটা 'slip of tongue' হয়ে যাওয়া কথাকে প্রায় লুফে নিল প্রিয়াঙ্কা। কারণ ওটা ওর পছন্দের বিষয়। slang বা গালাগাল। আড্ডা চলল প্রায় কয়েকঘন্টা। রীতিমত খাতা-পেন নিয়ে গালাগালের একটা লিস্ট বানাল সবাই মিলে। মেয়েদের, তায় আবার শিক্ষিকাদের আড্ডা এটা। ভাবা যায়! আসলে আড্ডার তো কোনো নির্দিষ্ট বিষয় হয় না কোনোকালেই। আড্ডা মানেই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়া। কথায় বলে 'আড্ডাবাজ ছেলে'। কিন্তু মেয়েরাও তো আড্ডা দেয়রে বাবা!

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' "... ... বকুলের গল্প নয়। বকুল বলেছে 'আমার গল্প যদি লিখতেই হয় তো আজ নয়।' পরে জীবনের দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে বুঝতে শিখেছে বকুল, পিতামহী প্রপিতামহীর ঋণশোধ না করে নিজের কথা বলতে নেই।" বকুলের মতো আমরাও মেয়েলি আড্ডার গল্প শুরু করব শুরুর দিন থেকেই।

কখনও শীতের দুপুরের মিঠে কড়া রোদ পিঠ করে বসে, কখনও বা গরমের দিনে শীতল পাটির আরামের আসরে বাড়ির বৌরা জমায়েত হয় সংসারের কাজকর্ম সেরে। জেঠিমা, কাকিমা, বৌদি সম্পর্কের সবস্তরেই বয়সের হেরফেরে তাদের পরিচয়। দু'একজন ঠাকুমা দিদিমা আর অবিবাহিত ননদ বা ঠাকুরঝিদেরও দেখা মিলতে পারে অবশ্য এই বৈঠকী মজলিশে। তবে অবিবাহিতরা সে আড্ডা থেকে একটু দূরে দূরেই ঘোরাফেরা করে। কারও হাতে উলকাঁটা, কুরুশকাঠি, কেউ বা ব্যস্ত আসনে ময়ূর কিংবা প্রজাপতির নক্‌সা তুলতে। কেউ আবার কাঁথা মিলে বসেছে একটু দূরে। সেলাইয়ের ফোঁড় তোলে আর আড্ডার কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটে। আড্ডাস্থলের চারপাশে কাঁচের বয়ামভর্তি আচার। কখনও আবার আমসত্ত্ব কিংবা বড়ি। যখন যেমন আর কি? এ আড্ডা জমতে পারে কারও বাড়ির রোয়াকে, চণ্ডীমণ্ডপের চাতালে, কখনওবা বৃষ্টিবাদলার দিনে কারও বাড়ির ভিতর ঘরের মেঝেতে চাটাই পেতে।

একালে এইসব আড্ডার জায়গা নেহাতই কল্পনার। চণ্ডীমণ্ডপ তো কোনকালেই বিলীন হয়েছে। আর আজকাল এমন বাড়িও বিশেষ দেখা যায় না, যার রোয়াক বা চাতালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতে পারে জনা দশেক মহিলা। প্রথমত

বাসা তো পায়রার খোপের মতো, ফ্ল্যাট বাড়ি। আর সে সব বাড়িতেই তো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। তিনজনের সংসার, খুব বেশি হলে পাঁচজন। আর ফ্ল্যাট কালচারে তো কারও সাথে কারও যোগাযোগও নেই বিশেষ। তাই আড্ডার জায়গা যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি আড্ডা দেওয়ার লোকই বা কোথায়?

"রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা –
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।"

অনেকটা সময় আগে জীবন যে এমনটাই ছিল, তাতে সন্দেহ নেই কোনো। তবুও সে জীবনেরও তো গল্প ছিল আর সেইসব গল্প অনায়াসে চলত ঐসব আড্ডায়। কার কেমন বিয়ে হল, বিয়ের খরচা, আয়োজন, তত্ত্ব, গয়নাগাটি, কারইবা ছেলে-মেয়ে কিংবা নাতি-নাতনি হল, কার কপাল পুড়ল, শাশুড়ি নিন্দা, বৌ-এর দুর্নাম, ননদকে খোঁটা সবই আলোচ্য ওই আড্ডায়। আর এসবের পাশাপাশি রান্না-বান্না, সেলাইবুনোন তো ছিলই। তবে আড্ডার আলোচনা যে সবসময়ই খুব নির্ভেজাল, নিরামিষ ছিল, এমনটা নয়। কার বর কীভাবে আদর করে, নেশা করে ঘরে ফিরলে ভালোবাসা বাড়ে কিনা, কোন্ পুরুষকে দেখলে কেমন যেন হয়, সেসব গল্পও চলত অবলীলায়। সে পুরুষ হতে পারে সিনেমার নায়ক কিংবা নিছকই পরপুরুষ। আর অবিবাহিত ননদ বা ঠাকুরঝিরা এইসব কথার চারপাশেই ঘোরাফেরা করত। যদি কোনোভাবে কানে আসে কোনো একটা কথা, কী নিয়ে এত হাসাহাসি আর কী নিয়েই বা এত ঢাকঢাক গুরগুর। তবে দু-চারটে অবিবাহিত মেয়ে জমা হলে তাদের একটা ছোট্ট গণ্ডী দেওয়া আড্ডা তৈরি হয়ে যায়। সেখানে তাদের প্রেম, বিয়ে, স্বপ্ন কোনো কিছুই বাদ যায় না। আবার এর মধ্যেই থাকত সত্যবতীর মতো মেয়েরা। যারা ঐ প্রতিদিনের বাঁধাধরা ঘেরাটোপ থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল বাকিদের। 'কিন্নরদলে'র আলো যেমন অজ পাড়াগাঁর অন্ধকার জীবনে আলোর দিশা দেখিয়েছিল। যাইহোক মোদ্দাকথা হল যখন মেয়েজীবনের স্বীকৃতিই ছিল না সেভাবে তখনও জীবনের উপভোগ ছিল আড্ডাতে।

নাগরিকতা যখন ছুঁয়ে গেল জীবনকে, তখন তো সে ছোঁয়াচ লাগল জীবনের সবক্ষেত্রেই। একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে গেল। মেয়েরা এতদিনের শুধুমাত্র রাঁধাবাড়ার জীবন ছেড়ে বাইরের জগতে পা রাখল। চাকুরে মেয়েরা দুপুরের অবসরটাই পেল না, তো আর দুপুরের বৈঠকী আড্ডা থাকে কেমনভাবে? কিন্তু অবকাশের আড্ডা ছাড়া তো জীবনই সম্ভব নয়। আসলে আড্ডা থাকল, শুধু তার ধরনটার বদল হল। স্কুল-কলেজ-অফিস করতে গিয়ে সেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোও আড্ডার বিষয় হল। নিজের জীবনে নিজের মতো করে বাঁচার ইচ্ছা, স্বপ্ন এই সমস্ত গভীর জীবনবোধের আদানপ্রদানের পাশাপাশিই থাকল নানাবিষয়। স্বাধীন প্রেম, বন্ধু মারফত প্রেমের চিঠি চালাচালি, কখনও বা শিক্ষক-শিক্ষিকা-অফিসকলিগ, বস প্রভৃতিদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা মজা। কে কখন কাকে পাত্তা দিচ্ছে আর কখনবা পাত্তা

না দিয়ে ল্যাং মেরে সরিয়ে দিচ্ছে -এ সমস্ত কিছুই এল মেয়েলি আড্ডার পরিধিতে। এমনকী এতদিনের অবদমিত যৌনতার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পেল আড্ডার আসরে। তবে আধুনিকতা এলেও শাড়ি, গয়না, বর, শাশুড়ি এসব চিরন্তন বিষয়গুলোও কিন্তু থাকল। আর এক্ষেত্রে চাকুরে মহিলা তা সে সরকারি বা প্রাইভেট অফিসের কর্মী কিম্বা শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা প্রায় সকলের গল্পেই শাড়ি, গয়না, বরের দেওয়া উপহারের গল্পে স্ট্যাটাস দেখাতে থাকল। আর বৌ, শাশুড়ি, ননদের শ্রাদ্ধ তো আড্ডার টেবিলে অবধারিত আজও। তবে এই গল্পের একটু হলেও হেরফের ঘটেছে এবং ঘটছে। এখন শাশুড়িও ভালো শাশুড়ি হতে চায় আর বৌমাও শাশুড়ির নামে নিন্দেমন্দ করে না বিশেষ। তবে কিনা মেয়েলি আড্ডার মতোই আদি অনন্তকাল ধরে শাশুড়ি-বৌ-ননদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। তাই ভালোর মুখোশ খুলেই যায় অনেকক্ষেত্রে। আর বর বা প্রেমিকের ভাগ্য অবশ্য নির্ধারণ করা যায় না কোনোভাবেই। মুহূর্তে মুহূর্তে আড্ডাতে তার ভিন্নভিন্ন দশা। কখনও তার প্রতি ভালবাসায় হাবুডুবু অবস্থা আর কখনও বা তার নিশ্চিত মুণ্ডপাত।

বোঝাই যাচ্ছে মেয়েলি আড্ডার হাল হকিকত বদলেছে। দিনে দিনে বদলাবেও। একালের মেয়েলি আড্ডা একেবারে খুল্লমখুল্লা, বিশেষত টিনএজার মেয়েদের। বিশ শতকের বদলের পর একবিংশ শতকে এসে মেয়েলি আড্ডা ঝকঝকে স্মার্ট। ফেসবুক, হোয়াটস্ অ্যাপের প্রেম, এন. আর. আই. বয়ফ্রেন্ড, লেসবিয়ান বা হোমোসেক্সুয়ালিটি পিরিয়ড – ইত্যাদি কোনো আলোচনাতেই তাদের কোনো রাখঢাক নেই। এমনকী যৌনতার আনন্দকে সাদরে অভ্যর্থনা করে তারা। বিয়ে নামক প্রথাকে অগ্রাহ্য করে, সম্পর্ক বা বয়সের বাধাকে অস্বীকার করতে চায় প্রেমে। আড্ডায় আসে সে সব দাবি –

> "বিবাহে বিশ্বাস নেই, জানাই প্রস্তাব ... ...
>
> ... ...
>
> অভিমান কোরো, তবু বিবাহ প্রস্তাব
> কখনো করবো না বলে কোরো না আক্ষেপ
> এই বালিয়াড়ি জুড়ে আভূমা প্রণয়
> দেখো, অনশ্বর থাকবে, সমুদ্র সাক্ষী।" ('প্রাকৃত' / সুতপা সেনগুপ্ত)

অথবা,

> "শহিদ মিনারে উঠে গিয়ে
> বলে দেব আকাশ ফাটিয়ে
> ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক।" ('একটি অসম পরকীয়া' / মন্দাক্রান্তা সেন)

আসলে অর্ধেক আকাশকে আজ ভরিয়ে দিতে চায় মেয়েদের আড্ডা। তবে একালের এইসব আড্ডাতে কিন্তু ছেলেদেরও অবাধ গতিবিধি। মানে এ আড্ডা একেবারে নির্ভেজাল মেয়েলি আড্ডা নয় হয়ত বা। তবুও এসবের মাঝেও আজকের দিনেও

যখন বৌ-এর দল বা শাশুড়ির দল আড্ডা দেয়, তখনও মেয়েলি আড্ডার সেই পুরোনো গন্ধটাই মেলে। বৌ কীভাবে ছেলেকে ক্যাপচার করে নিল অথবা বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মা-র কথায় ছেলে ওঠে বসে, বৌ-এর কথা একটুও শোনে না ইত্যাদি।

একটা কথা খুব প্রচলিত 'আড্ডাবাজ বাঙালি'। কিন্তু বাঙালি জীবনের জমিয়ে বসে আড্ডা দেওয়া কমেছে কিছুটা হলেও। আজকাল ফেসবুক, হোয়াটস্ অ্যাপেই আড্ডা হয়ে যায়। মেয়েদের আড্ডার বেলাতেও একই কথা। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা না বললেই নয় যে, মেয়েদের সাথে তফাত আছে ছেলেদের আড্ডার। যদিও আজকাল ছেলে-মেয়ে আড্ডা দেয় একসাথে। তবুও এ পার্থক্য আগেও ছিল, এখনও আছে। ছেলেরা আড্ডায় নেহাতই 'ডায়লগবাজি' করে। একে অন্যকে ছাপিয়ে শুধুই নিজের মাহাত্ম্য প্রমাণের চেষ্টা। আর মেয়েরা যেমন নিজের বরের সাথে ভালোবাসার গল্পের আলোচনাতে খুঁটিনাটি বিষয়েও পঞ্চমুখ, ছেলেরা কিন্তু একেবারেই তা নয়। নিজের বৌ-কে পাবলিক প্লেসে আনে না কিছুতেই। অবশ্য অন্যের বৌ কিংবা অন্য যে কোনো মেয়েকে বিষয় করে রসিয়ে রসিয়ে তারা আড্ডা দেয় নির্দ্বিধায়। সেদিক থেকে মেয়েরা অনেক বেশি মুক্তমনের, হিপোক্রেসিবিহীন। আর পি.এন.পি.সি.-তেও মেয়েদের জুড়ি মেলা ভার। কার ঘরে কে এল, কে কার সাথে পালিয়ে গেল, কার সংসার ভাঙল, কার বরের সাথে কার কেমন সম্পর্ক এসব হাঁড়ির খবরে মেয়েদের মতো আগ্রহ নেই কারও। আর এসব খবর তারা এমন সুচারুভাবে পরিবেশন করে যে আড্ডার সব সদস্যই মুখিয়ে থাকে সেই মুখরোচকের জন্য।

পুরুষতন্ত্র এতটাই বেঁধে রেখেছে মেয়েজীবনকে যে মেয়েলি আড্ডাটাও তাচ্ছিল্যের। কথায় কথায় পুরুষেরা বলেই দেয় – মেয়েদের আড্ডার বিষয় তো শাড়ি, গয়না। এমনকী নিজেরা কলেজ ফেরত, কিংবা অফিস ফেরত আড্ডা দেওয়াকে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় মনে করলেও, মেয়েরা একসাথে জমা হয়েছে দেখলেই তাদের বাঁকাকথা, "আজ সংসারের বারোটা বেজে গেল"। কেন রে বাবা, সংসারটা তো তারাই সামলে এল চিরকাল। কটা পুরুষ তার সংসারের কথা ভাবে সেভাবে? – এটাও যদিও মেয়েদের আড্ডার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। তবুও অস্বীকার তো করা যায় না, সংসার সামলানোর পর আড্ডার আমেজ ভালোই। আসলে আড্ডা বাঁচার অক্সিজেন দেয় তো। আর তাছাড়া মেয়েলি আড্ডাকে বোধহয় আজ আর ঐ সংকীর্ণ 'মেয়েলি' শব্দে বাঁধাও যায় না। কোনো পুরুষের তোয়াক্কা না করেই মেয়েরা আজকাল বেশ বাঁচে। হৈ-হুল্লোড়, আড্ডায় মাতে। রীতিমতো নিজেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এদিক-সেদিক, দেশে-বিদেশে। আড্ডা দেয়। আর এসবকিছু এতটাই সুন্দর আর সাজানো গোছানো যে মনে হয়, মেয়েরাই পারে এমনটা! বলাই যায়, আড্ডাতে মেয়েরা ভরিয়ে নিয়েছে যে আকাশ, সে আকাশে একটাই সুর বাজে

"আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়, নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।"

নির্জন শিখর : দুই কালের দ্বন্দ্ব

স্বাতী চক্রবর্তী

রূপান্তর সময়ের ধর্ম। রূপান্তরিত কালের মাত্রায় পুরোনো পৃথিবীর পরিচিত রূপ যেমন বদলায়, তেমন-ই তার ন্যায়নীতি, আদর্শ, উপলব্ধি – সমস্তই বদলে নেয় নিজের রঙ। এমনকি বদলে যায় মানুষের উত্তরাধিকারও। শুরু হয় নির্মাণ ও বিনির্মাণের নতুনতর অধ্যায়।

ব্যস্ত বিশ শতকে সময় এগিয়েছে দ্রুত, সভ্যতার নাড়ীর স্পন্দন হয়েছে দ্রুততর। মানুষের জীবনের উপর দিয়ে নিরন্তর বয়ে চলা সময়ের ঢেউ কোন্ জাদুমন্ত্রে মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে দ্রুত এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে। নিজের নিজের কালের জ্ঞান-চেতনা নিয়ে প্রতি প্রজন্মই গড়ে নিয়েছে নতুন পথ। আর ঘটেছে দুই প্রজন্মের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী কিছু সংঘাত ও অমিল – যার জন্ম ও বিকাশ পর্ব মূলত আদর্শ ও অবস্থানগত ব্যবধান থেকে। সেই ব্যবধান কালের নিয়মে এক মহাজাগতিক সত্য। এককথায় তা প্রজন্ম ব্যবধান।

১৩৭৫ সালের বৈশাখ মাসে (ইংরেজি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্জন শিখর' উপন্যাসটি লেখক উৎসর্গ করেছিলেন অগ্রণী কথা সাহিত্যিক বনফুলকে। আদ্যন্ত অতীত কথনে ('ফ্ল্যাশ ব্যাক' রীতিতে) বর্ণিত উপন্যাসটিতে বিষণ্ণ বীক্ষণে স্থান করে নিয়েছে দর্শনের অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্যের আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে জীবন-সত্যে উপনীত হতে চাওয়া, সেইসঙ্গে উপন্যাসের বহতা ধারায় মিশে থাকে দেবনাথের পরবর্তী প্রজন্ম প্রবল 'বাস্তববাদী' পুত্র বারীনের অবস্থানগত দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌণিক দূরত্বে অবস্থান। গভীর উপলব্ধি থেকে পুত্র সম্পর্কে দেবনাথের মন্তব্য – "আমার সঙ্গে ওর কোথাও মেলে নি।" এই অমিলের হাত ধরেই পিতা-পুত্রের জীবনে ঘটেছে অবশ্যম্ভাবী সংঘাত। কখনো তা অনাবৃত আত্মার অস্ত্রোপচারের মতো বড় বেশি প্রত্যক্ষ, আবার কখনো বা তা অন্তর্জগতের স্বরলিপির মতোই পরোক্ষে বহমান।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ পর্বের উপন্যাস 'নির্জন শিখর' স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস। স্বীকারোক্তি ও অন্বেষণের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে সত্য উপলব্ধিতে পৌঁছাতে চাওয়া উপন্যাসটিতে লক্ষিত। এই অন্বেষণের তীব্র দার্শনিক জিজ্ঞাসায় ঔপন্যাসিকও শ্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন তাঁর সৃষ্ট দেবনাথ চরিত্রের সঙ্গে। এই আত্মবীক্ষণের পালায় সুর মিলিয়েই তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন 'নির্জন শিখর'-এর

পাদমূলে।

দেবনাথ এই উপন্যাসের নায়ক। আত্মকথনের ভঙ্গিতে তিনি নিজের পঁয়ষট্টি বছরের জীবনকে পর্যালোচনা করেছেন। এই পর্যালোচনায় যে শান্ত, নিরাসক্ত অথচ বিষণ্ন ভঙ্গিটি আছে তার মূলে রয়েছে নিজ জীবনপ্রবাহের কাছে তাঁর পরাভূতের মত আত্মসমর্পণ – "এক সময়ে আমার 'ডিটারমিনিজমে'র ওপর ঝোঁক ছিল, পরে ব্যার্গসঁকে অসম্ভব ভালো লেগেছিল। তত্ত্বের দিক থেকে দুইয়েরই মধ্যে যতই ফারাক থাক – আমার কাছে এখন দুইয়েরই যোগফল এক। আমি থাকব না – আমার স্মৃতি অবস্থা হয়ে যাবে, ... এ সব পূর্ব নির্দিষ্ট হয়ে আছে; এর ব্যতিক্রম নেই –এর অন্যথা হবে না, সব নির্ধারিত, সব নিয়ন্ত্রিত হয়ে রয়েছে।" দেবনাথের এই দর্শনের মূলে রয়েছে – "... ... ব্যক্তিগত জীবনের আত্মকেন্দ্রিকতা ও ব্যর্থতা, ... দেবনাথ বিশ্বাস করতেন 'ডিটারমিনিজমে', যা আজ দর্শনক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত। দেবনাথ সেই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু জীবনে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন।"[১]

কাহিনি অনুসরণ করলে দেখা যায় প্রবল দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় দেবনাথ লাভ করেছেন শিক্ষা, লাভ করেছেন বৃহত্তর জগতের স্বাদ, কিন্তু নিজেকে সেই জগতের অন্যতম অংশীদার করে তুলতে পারেননি। বহরমপুরে রমাপদ চৌধুরীর বাড়িতে আশ্রিত থাকাকালীন আই.এ. পড়ার সময় স্বদেশী সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জীর সংস্পর্শে এলেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে নিজেকে ব্যাপ্ত করতে পারেননি, কারণ – 'সে ভবনা নেবার শক্তি' – তাঁর ছিল না। সেইসঙ্গে ছিল না নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের কোনো সুযোগ। মাত্র উনিশ বছর বয়সে পিতৃ আদেশে তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং অতিরিক্ত সঞ্চয় হিসাবে লাভ করেছেন স্ত্রী মাধুরীর দুর্ব্যবহার। বিবাহ সম্পর্কে তাঁর নিজের কথায় – 'আমার জীবনে এই স্মৃতিটাই সবচেয়ে ঝাপসা।'

বিবাহের দুর্বিষহ স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে জীবনে একবারই বিদ্রোহীর পরিচয় দিয়ে দেবনাথ পাড়ি দেন কলকাতায়। এরপর শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভ ও অধ্যাপনার জগতে প্রবেশ করে এক একাকীত্বের জগতে নিজেকে নির্বাসিত করেন। এই চলিষ্ণু জীবনধারায় একমাত্র আলো হয়ে দেখা দেয় দেবনাথের মুক্তির সমুদ্র বিদ্যুৎ। একদা তাঁর আশ্রয়দাতা রমাপদবাবুর পৌত্রী। কিন্তু বিদ্যুৎকে নিয়ে নতুন জীবন শুরুর মুহূর্তে তাঁর জীবনে দীর্ঘ বারো বছর পর ধূমকেতুর মত ফিরে আসে স্ত্রী মাধুরী। বিদায় নিতে হয় বিদ্যুৎ-কে। নিরুপায় দেবনাথ সেদিনও মুক্তি খুঁজেছেন, সামনে থাকা সত্যাগ্রহীদের শিবিরে সেই পটভূমি ছিল প্রস্তুত – 'সেই রাতে আত্মমুক্তির জন্য আমার শেষ সুযোগ ছিল।' অথচ 'দেশের কান্না' তাঁর পথের প্রদীপ হল না, নিয়তি নির্দিষ্ট একটা দুর্বোধ্য ভয় তাঁকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে, দেবনাথ ফিরে আসতে বাধ্য হন মাধুরীর কাছে। তীব্র সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে

এই বিবাহের দায়ভারই তিনি স্ত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সারাজীবন বহন করে চলেন। আর সুখের সংজ্ঞাকে আপেক্ষিক অর্থে জীবনে গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উপন্যাসের দেবনাথের সঙ্গে নিকট সাহায্যের কথা লেখক স্বীকার করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে লেখককেও একসময় বহন করতে হয়েছিল গ্রস্ত জীবনের চাপ। সেই জীবন থেকে অর্গল মুক্তির তিনি চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। সেইসঙ্গে দেবনাথ চরিত্রটি মনে করিয়ে দেয় লেখকের 'ভস্মপুতুল উপন্যাসের সত্যজিৎ চরিত্রকে, অথবা Tolstoy–এর 'The Death of Ivan Ilyich' গল্পের Ivan চরিত্রটিকে। ভালোবাসাহীন 'নিষ্প্রয়োজনের'- জীবন বহন করে যারা মানসিক দিক থেকে ছিল একাকী।

দেবনাথ অন্তর্মুখী চরিত্র। বিপর্যস্ত দেবনাথ আত্মসন্ধানের প্রয়াস ও ব্যর্থতা থেকে বলেছেন – "না – কাউকেই আমি সুখী করতে পারলুম না। ... নিজেকে তো নয়ই। আমার মতো মানুষেরা ... জোর করে দিতে পারি না, নিতেও পারি না। ... শেষ পর্যন্ত একটা নিরাপদ স্বার্থপরতার, একটা আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্গকেই আমরা বেছে নিই।"

দেবনাথের এই আত্মবিশ্লেষণ তৎকালীন বুদ্ধিজীবী চরিত্র বিশ্লেষণের সাথে মিলে যায়। প্রখ্যাত সমালোচকের মতে – "ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এক নির্ভুল আলেখ্য এই উপন্যাস। স্বীকার্য, স্বাধীন ভারতের পঞ্চাশোত্তীর্ণ ও প্রবীণ বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিমণ্ডলেই মানুষ হয়েছিলেন; ফলে ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে মৌলিক কোনো সমালোচনায় তাঁরা এগিয়ে আসেননি ... তাঁরা মূলত এস্‌টাব্লিশমেন্টের সমার্থক। আর সে-কারণেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরেও মননের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে পেরেছেন। 'নির্জন শিখর' উপন্যাসের বুদ্ধিজীবী চরিত্ররা এই ধারার ব্যতিক্রম নয়।"[২]

সমস্ত পরাভবতা মেনে নিয়েই দেবনাথ আত্মবীক্ষণে রত হয়েছেন – "চোখের সামনে বছরগুলোর শোভাযাত্রা দেখছি। এই উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ... আমি আজ এক নিঃসঙ্গ দর্শক। দাঁড়িয়েছি একটা পাহাড়ের চূড়ার কাছে – আর একটু এগিয়ে গেলে সেই শুভ্র তুষার ... আমার বিবর্তনের পালাটা চুকিয়ে দেবার আগে, আমি জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়েছি।"

দেবনাথ ভট্টাচার্যের আত্মধ্বংসী দর্শনের মূলে তীব্র আঘাত হেনেই যেন প্রবল বাস্তববাদী পুত্র বারীনের আবির্ভাব। আর অনুভূতির সব স্পন্দন তার মায়ের সঙ্গে, সেই প্রথম নাড়ীটির সম্পর্কের মধ্য দিয়েই পিতার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তার দূরত্ব। তাই দেবনাথ ভট্টাচার্যের জীবনের যা পাথর-প্রতিমা, তার সম্পর্কেই বারীনের মন্তব্য – "আয়্যাম প্রাউড অব্ মাই মাদার।"

জীবন তার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। সে 'পলিটিকস্' করে – 'মুঠো পাকিয়ে বক্তৃতা' দেয় – "সে সক্রিয় রাজনীতিতে উৎসাহী। তার পড়ার টেবিল-এর মধ্যেই

নানা জাতের দিশী-বিদেশী পলিটিক্যাল লিটারেচারে ছেয়ে গেছে।" পিতার ভীরুতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বিপরীতেই তার বলিষ্ঠ দীপ্ত পদক্ষেপ।

অধ্যাপক পিতার দর্শন বিষয় তার কাছে – 'ডেড থিং', পরিবর্তে সে আগ্রহী 'লিভিং সাবজেক্ট', ইকনমিকিস্-এ। কারণ তার মতে 'হিউম্যানিটিজ্'-এ এই বিষয়টিতেই একটি 'ইন্টেলিজেন্সের' অবকাশ আছে। দর্শন পড়া মানে কতকগুলো চিন্তার কুয়াশা তৈরি করা। স্পষ্ট ভাষায় উদ্দীপিত চোখ নিয়ে পিতার দিকে তাকিয়ে সে বলেছে – "তোমার পরামর্শে হিউম্যানিটিজ্ লাইনে গেলুম, সেইটে আমার সব চাইতে বড়ো ব্লানডার। ফিলসফি পড়ে সে ভুলটা আর বাড়াতে চাইনে।"

আসলে এই সংঘাতের বীজ বাতাসে উড়েছিল, কারণ বাতাবরণ ছিল তৈরি। নতুন বার্তা নিয়ে প্রকাশের তাগিদ ছিল দ্রুত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবিশ্বাস্য তমসার দিনে, দেশ-বিভাগের জুয়া খেলার প্রতিবাদে মিছিলের পুরোভাগে বলিষ্ঠ বক্তৃতা দিয়েছে বারীন। 'কলকাতার দুঃস্বপ্নের পথে মন্বন্তরের মড়ার হোঁচট খেতে খেতে' একদা দেশের স্বাদেশিক আন্দোলন সম্পর্কে অনুভূতিশূন্য 'ভীরু দার্শনিক' দেবনাথ ভট্টাচার্যও দেশের পরিস্থিতিতে গ্লানিবোধ করেছেন। তাই পুত্র বারীনের বক্তৃতায় সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার প্রশ্নে বিচলিত হ'লেও মনে মনে প্রাণভরে ছেলেকে আশীর্বাদ করেছেন – "তোর জয় হোক – তোর কাছে হেরে গিয়ে আজ আমার অহঙ্কারের সীমা নেই।"

অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্যের কাছে প্রথম মহাযুদ্ধ 'কয়েকটা রোমহর্ষক খবরের' বেশি ছিল না, কারণ সে যুদ্ধের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ যোগ বোধ করেননি, গান্ধীজীর আশাভঙ্গের সঙ্গেও না। এই আত্মকেন্দ্রিকতার জগতে বন্দী ছিলেন। অন্যদিকে পুত্র বারীন অন্যতম ছাত্রনেতা হিসাবে অনায়াসেই এগিয়ে গেছে 'ডিসটার্বড্ এরিয়ায়', উপেক্ষা করেছেন নিজের পড়াশুনা, 'ক্যারীয়ার'কে। দেবনাথের মনে হয়েছে – "দেশের জন্য যা আমি পারিনি, বারীন তা করেছে। ... আমার প্রায়শ্চিত্ত – ও –ই খানিকটা করুক।"

অবশ্য রাজনৈতিক মতাদর্শের সুর পিতা-পুত্রের এক তালে বাজেনি। পিতার কাছে শোনা একদা স্বদেশী সিদ্ধার্থর মরণপণ লড়াই বারীনের কাছে নেহাতই – 'পোলিটিক্যাল অ্যাডভেঞ্চারিজম্'। বারীনের মন্তব্যে মানসিকভাবে ক্ষুব্ধ হ'ন দেবনাথ, বুঝতে পারেন কাল ব্যবধানে, প্রজন্ম ব্যবধানে রাজনৈতিক আদর্শেও ঘটে পরিবর্তন। তাঁর উপলব্ধি "ওরা বলতে পারে, ওরা সে কালটাকে দেখেনি। ... আমরা অন্য দেশকে দেখেছিলুম।"

পিতাকে বারীনের পরামর্শ – "বাবা তোমার মার্ক্স্ পড়া উচিত।" কান্ট-স্পিনোজা-ব্যার্গসঁর নয়, মার্কস-লেনিনের আদর্শে সে অনুপ্রাণিত। নিজের দলীয় কর্মীদের নিয়ে উচ্চকণ্ঠে চলত তার আলোচনা। দর্শনের অধ্যাপক দেবনাথের কাছে পরবর্তী প্রজন্মের কোলাহল অসহ্য – "এই যুগটাই বোধ হয় এই, সবাই শোনাতে

চায়, কেউ শুনতে চায় না। ... আমার দর্শন নিজেকে নিয়ে নৈঃশব্দ্যে ডুবে যায়, আর অর্থনীতি তার যাবতীয় বাস্তব সমস্যা নিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে। আমার যেখানে শান্ত মৌন, তার সেখানে উদ্ধত কোলাহল ... দর্শনের জন্যে নির্জন শিখর, পলিটিক্যাল ইকনমির জন্যে মন্দ্রিত সমুদ্র।"

বারীন সর্বক্ষণের বামপন্থী পার্টিকর্মী। কর্মসূত্রে সে পিতার কলেজেই অধ্যাপনার চাকরি নেয়। হয়ে ওঠে পিতার প্রতিপক্ষ। কলেজের গভর্নিং বডির ইলেকশনে পিতার বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়। জুনিয়র টিচাররা পূর্ব-নির্বাচিত দেবনাথ ভট্টাচার্যের পরিবর্তে নতুন প্রজন্মের বারীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে পছন্দের প্রার্থী হিসাবে চায় গভর্নিং বডিতে। প্রবীণ-নবীন অধ্যাপকদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত মূলতঃ প্রবীণদের সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে ভোটে জয়ী হ'ন দেবনাথ। পিতার নীতির বিরোধী হ'লেও স্পোর্টসম্যান স্পিরিটে সর্বাগ্রে বারীন পিতাকে অভিনন্দন জানাতে ভোলে না। এই স্পোর্টস্ ম্যান স্পিরিটেরই পরিচয় সে দিয়েছে কলেজে চাকরি পাওয়ার মুহূর্তে। যখন দেবনাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে বারীনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংসর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বিষয়টিকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করে সেদিনও বারীন বলেছে – "তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করেছ বাবা। দ্যাট্স্ লাইক্ মাই ফাদার।"

মেধায়, চরিত্রের জোরে বারীন দেবনাথ অপেক্ষা প্রতিভাবান। নীতিগত আদর্শে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করলেও বারীন সম্পর্কে দেবনাথ তাই আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। কারণ যেখানে তাঁর দ্বিধা-সঙ্কোচ, সেখানে হ্যামলেটের মত তাঁর গতি থমকে গেছে, সেখানেই বারীন এগিয়ে গেছে – "নিজের লক্ষ্যকে সে লোহার মতো শক্তমুঠোতে আঁকড়ে ধরেছে।" জন্মগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়েই সে দেবনাথকে ছাড়িয়ে গেছে। একইসঙ্গে সে সাহসী নিজের পছন্দের পাত্রী নির্বাচন ও বিবাহে।

অথচ সেই বারীন-ই একদিন সবকিছু ছেড়ে এল – আই.সি-র অফিসার হয়ে গেল। কারণ – "স্টার্টিংয়েই প্রোফেসারীর তিনগুণ বেশি মাইনে দেবে"। কিন্তু চাকরি বারীনের কী করে হবে? পুলিশ রিপোর্টেই তো আটকাবে। বারীন সহজ গলায় বললে, "তাতে আটকাবে না। সে আমি ম্যানেজ করে নিয়েছি। ... রিয়্যালি, ভেবে দেখলুম কী হবে পলিটিক্সে? আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়েছি – ওসব আমার অল্প বয়সের পাগলামি – এখন আমি আর ওগুলোর মধ্যে নেই। নিজের ভবিষ্যৎটাতো দেখতে হবে, কী বলো বাবা?"

মুহূর্তে এই দিনটাই দেবনাথ তাঁর জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার দিন বলে আবিষ্কার করেন – "সেই সাংঘাতিক দিনটাই আমার কাছে সবচাইতে কালো – যেদিন আমার ছেলের মধ্যে আমারই ভীরু, কাপুরুষ সত্তাকে আমি জেগে উঠতে দেখলুম, দেখলুম আমার ভয়ঙ্কর হেরিডিটির স্বরূপ। দেবনাথ ভট্টাচার্য সেইদিনই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।"

'ব্যক্তিগত জীবনে যে ভীরুতা, যে আত্মকেন্দ্রিকতা দেবনাথকে বৃহত্তর মুক্তির জগতের অংশীভূত করতে পারেনি, নিক্ষেপ করেছে এক বিষণ্ণ নিরাসক্তির জগতে – পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সবকিছুর চরিতার্থতা চেয়েছিলেন। অথচ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে, চরম আদর্শহীনতায় দেবনাথের আত্মজ পিতাকেও ছড়িয়ে গেল। স্বাচ্ছন্দ্যবিলাসী বারীন শুধু বিপ্লবের পথ-ই এড়ায়নি, নিজের পথ মসৃণ করে নিতে পুলিশকে অসঙ্কোচে 'ম্যানেজ' করেছে, 'বিট্রে' করেছে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন – "এই কমিউনিজম আমার শত্রু। আমার লেখায় তার বিরুদ্ধে ধিক্কার সহস্র কণ্ঠে ফেটে পড়ুক।"[৩] উপন্যাসে বারীনের মত বামপন্থী কর্মীদের সংগ্রামী চেতনাকে বিসর্জন দেওয়াই হয়তো লেখককে পীড়িত করেছিল।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় দুই কালের দ্বন্দ্ব সর্বাধিক লক্ষণীয়। তাঁর 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন'-এর মতো উপন্যাসগুলিতে, 'দুই পুরুষ', 'পথের ডাক'-এর মতো নাটকগুলিতে বা 'জলসাঘর'-এর মতো ছোটগল্পে পুরোনো ও নতুনকালের দ্বন্দ্ব ও ব্যবধান লেখক-কলমে সুচিত্রিত। 'তারাশঙ্করের প্রভাব' পুষ্ট নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় এই কালগত দ্বন্দ্ব নিজস্ব স্বাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ইতিহাস-চক্র ঘুরছেই। প্রজন্ম ব্যবধানে আদর্শ, চিন্তাধারা সব-ই বদলে যায়। তবু 'হেরিডিটি', জন্মবীজ কি পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় ? আলোচ্য উপন্যাসটিতে বারীন চরিত্রের চমকপ্রদ পরিবর্তন যেন সেই অমোঘ সত্যকেও তুলে ধরেছে। উপন্যাসের অন্তিমে তাই আদর্শহীন পুত্রের কাছে নয়, জীবনের 'নতুন চক্ররেখা' দেবনাথ খোঁজেন তাঁর জন্য আজীবন অপেক্ষারত বিদ্যুৎ-এর কাছে। নিজের ব্যর্থতা, গ্লানি, বিপর্যস্ত বেদনাবোধ নিয়ে যথার্থই পরাভূত দেবনাথ এসে দাঁড়ান 'নির্জন শিখর'-এর পাদমূলে, যেখানে দাঁড়িয়ে এমনকি শোনা যায় মৃত্যুর পদধ্বনিও।

উল্লেখপঞ্জি

১. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার – 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা – ১৮৮-১৮৯।
২. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার – 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : শেষ পর্বের উপন্যাস', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা – ৪১।
৩. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ – 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'দেশ', ২০ পৌষ ১৩৬৯, পৃষ্ঠা – ৮৯৫।

প্রজন্ম ব্যবধান ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি লেখা

কিঙ্কর মণ্ডল

মানবজীবন স্রোতস্বিনীর মতো এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলার পথে বাঁকবদল ঘটে। কিন্তু তার গতি স্তব্ধ হয় না। বিরামহীন এই চলা আবহমানকালের। যুগের পরিবর্তন, কালের হাওয়া সে জীবনকে পাল্টাতে থাকে। চলার পথেই রচনা করতে থাকে নবজীবনের ধারাপাত। ফলে সেই অভিঘাতে বদলে যেতে থাকে জীবনচর্যা। চেনা জীবনকে তখন বড় অচেনা মনে হয়। একথা যেমন পৃথক দুটি মানুষের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি সত্য ব্যক্তি মানবের ক্ষেত্রেও। পৃথক দুটি প্রজন্ম মানে পৃথক দুটি কাল। তাই কালের পালে হাওয়া লাগলে জীবন বদলে যাবে, বদলে যাবে বহুলালিত জীবনাদর্শ কিংবা মূল্যবোধ, এতো স্বাভাবিক। অভিজ্ঞ আর অনভিজ্ঞের মধ্যে তৈরি হয় ব্যবধানরেখা। মানসিকতার ফারাক, বিশ্বাস-সংস্কার-স্বপ্নসাধনার মূল্য বদলে যায় উত্তরসূরির ভাবনায়। তখনই ওঠে ত্রাহি ত্রাহি রব। রসাতলে যাওয়ার আশঙ্কা। আবার ব্যক্তিজীবন যাপনেও সময়ের অভিঘাত বলবান হয়ে ওঠে। দীর্ঘজীবনে মানুষ নিজেকে বদলাতে বদলাতে এগিয়ে চলে। পরিস্থিতি চিরলালিত জীবন যাপনের রীতিকে নতুনত্বের বার্তা দেয়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সেই বার্তা বহন করতে মানুষ বাধ্য থাকে। ভাল-মন্দের বিচার করবে তো মহাকাল। সুতরাং আমরা চাই বা না চাই যুগবদল দুটি ব্যক্তি মানুষের মধ্যে দুটি সমান্তরাল সরলরেখা রচনা করে। একথা অনেকাংশে একক মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রেও সত্যি। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রজন্ম ব্যবধানের বিষয়টি।

এই জগৎসংসারে প্রতিটি মানুষ কোন না কোন সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ। এর ব্যত্যয় হয় না। আমরা কারও ছেলে বা মেয়ে কিংবা বাবা বা মা ইত্যাদি। রক্তের সম্পর্ক হোক কিংবা আত্মার, একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা ব্যক্তিমানুষ আলাদা। আলাদা দুটি মানুষ আলাদা ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে প্রজন্ম ব্যবধান বা Generation Gap ছাড়া মানবজীবন এগোতে পারে না। প্রথমে আভিধানিক সংজ্ঞা ও বক্তব্যের দিকে আলোকপাত করা যাক। প্রজন্ম ব্যবধান প্রসঙ্গে প্রথমে Oxford Dictionaries Language Matters—এর বেঁধে দেওয়া বক্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে :

> "A difference of attitudes between people of different generation, leading to a lack of understanding."

British Dictionary-তে প্রজন্ম ব্যবধান প্রসঙ্গে বলা আছে –

> "...the years separating one generation from the generation that precedes of follows it, esp when regarded as representing the difference in outlook and the lack of understanding between them."

এবার উদ্ধৃত করি American Psychological Association–এর বক্তব্য :

> "A lack of communication between one generation and another especially between young people and their parents, brought about by differences of tastes, values, outlook etc."

উদ্ধৃত বক্তব্যগুলো থেকে পরিষ্কার যে, দুটি প্রজন্মের মধ্যে তথা দুটি কালের মধ্যে যখন ভাবনাগত, মানসিকতাগত, আদর্শগত, জীবনাচরণগত প্রভৃতি দিক থেকে তফাৎ বা ব্যবধান তৈরি হয় তখন তা হয়ে ওঠে প্রজন্মগত ব্যবধানের নামান্তর। এই ব্যবধান মূলত পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতামাতার সঙ্গে তার সন্তানের মধ্যে ঘটে থাকে। আবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণ প্রজন্মের ব্যবধানের কথাও এক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। দুটি প্রজন্মের মধ্যে ব্যবধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। পিতামাতা ও সন্তান দুটি পৃথক কালের প্রতিনিধি বলে ব্যবধান স্বাভাবিক। পিতা-মাতা সন্তানের জীবন নির্দেশিকা দেন তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে ব্যবধান গড়ে উঠতে বাধ্য। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে সন্তানের যেসব নিজস্ব চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে তার মূল্য দেওয়া প্রথম ও প্রধানতম কর্তব্য তার পিতামাতার। সন্তান তা থেকে বঞ্চিত হলে মানসিক ব্যবধান গড়ে ওঠে। পিতামাতা অনেক সময় মনে করেন তার সন্তান কিছুই জানে না, জীবন সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। এ মূর্খতার নামান্তর। এটা ঠিক, সন্তান অভিজ্ঞতার নিরিখে জীবনকে কম দেখেছে। কিন্তু প্রত্যেকের একটা নিজস্বতা আছে। পিতামাতার নিজস্বতা আর সন্তানের নিজস্বতা মিলবেই এমনটা নয়। এই বৈপরীত্য দুই প্রজন্মের মধ্যে ভাবনাগত দূরত্ব তৈরি করে। তৈরি হয় অপরিচয়ের সংকট। পরস্পর কাছে থাকলেও তাদের মধ্যে বিরাজ করে 'সুদূর দুর্গম ব্যবধান'।

প্রশ্ন হতে পারে, কেন এই প্রজন্ম ব্যবধান? এর প্রধান কারণ যুগের পরিবর্তন। এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে আরও কিছু বিষয়। একটা সময় পর্যন্ত কয়েকটি প্রজন্ম একই জীবনচর্যা, পরিবেশ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জীবনধারণ করেছে। কেননা প্রগতি তখন ছিল বড্ড শ্লথ। একুশ শতকের কথা আলাদা। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাল্টাতে থাকছে মানুষের জীবন। যুগপরিবর্তনের মূল দিক হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি। একসময় সমাজ ছিল গতিহীন। প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। একসময় যা ছিল

কষ্টকল্পনা কিংবা স্বপ্নের অতীত, এখন তা হাতের মুঠোয়। মোবাইল, ইন্টারনেট, হোয়াট্‌সঅ্যাপের যুগের বাসিন্দা আজকের প্রজন্ম। তাই সে চিরাচরিত জীবনকৌশল ছেড়ে প্রযুক্তিকে সম্বল করে এগিয়ে যেতে চাইবে। আর প্রবীণ প্রজন্ম মনে করেন, এই বুঝি তার ধ্বংসের কারণ। কেউ কাউকে 'বুঝিতে বোঝাতে নারে'। এই ব্যবধান তাই পারস্পরিক সম্পর্কের বাঁধনকে আলগা করে দিতে থাকে।

প্রজন্ম ব্যবধানের বিস্তার সর্বব্যাপক। জীবনের প্রতিটি পরতে তার প্রবেশ ঘটে গেছে। যুগবদল যেমন মানবজীবনের বদল ঘটিয়েছে, তেমনি বদলে গেছে তার সংস্কৃতির হালহকিকত। গ্রামীণ সংস্কৃতি, পঠন সংস্কৃতি, আড্ডা সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, পারিবারিক কাঠামো-সর্বত্রই তার অমোঘ পদপাদ। এমন কি মানুষের কর্মক্ষেত্রেও তথা কর্মসংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বিষয়গুলো সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। গ্রাম চিরকাল আঁধারে থাকবে, আর শহর আলোর রোশনাইয়ে ভরে উঠবে, এটা কখনও কাম্য নয়। উন্নয়নের হাওয়ায় গ্রামও এখন অনেকটা আলোকিত। প্রযুক্তির ফসল গ্রামজীবনের অন্দরমহলে স্থান দখল করে নিয়েছে। ফলে জীবনযাপনের ধারাও পরিবর্তিত হয়েছে। কর্মকেন্দ্রিক গ্রামসংস্কৃতির অঙ্গও বিনোদন। কর্মের অবসরে একসময় গ্রামজীবনে মানুষ সময় কাটাতো যাত্রা করে, তাস-পাশা খেলে। কিন্তু প্রযুক্তির নবতম আবিষ্কার টি.ভি. আজ তাদের অন্দরমহলে। ফলে দিন বদলের হাওয়া গ্রাম্য মানুষের শরীরে যে শিহরণ জাগায় তার পূর্ণ উপলব্ধি পেতে চাইছে তারা। রঙিন দুনিয়ার হাতছানিতে মরীচিকার উদ্দেশে ছুটে যাওয়া অপরদিকে না পাওয়ার যন্ত্রণা – এ দু'য়ের মধ্যে তারা অবস্থান করে ত্রিশঙ্কুর মত। টেলিভিশন সময়ে সময়ে সম্প্রচার করে গান, সিনেমা ইত্যাদি। অথচ কর্মের অবসর আর চ্যানেলের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় নাও মিলতে পারে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বলে হাতে এসে গেছে সুখের স্বর্গ সি.ডি. কিংবা ডি.ভি.ডি.। দেখতে দেখতে দেখার অভ্যাস হয়ে যায় মজ্জাগত। কেননা নতুন জিনিস, তাই নতুন মজা। রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনার যুগ আর নেই। ঠাকুরমার ঝুলি, টুনটুনির বই থেকে গল্প শোনানোর লোক পাওয়া ভার। প্রজন্ম ব্যবধান পঠনসংস্কৃতিরও বদল ঘটিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দিক হল পঠনপাঠন। পাঠের প্রতি আগ্রহ কমতে থাকলে শিক্ষা বিপন্ন হতে বাধ্য। শিক্ষা-সংস্কৃতি যদি রাজনৈতিক অঙ্গুলি হেলনে নির্দেশিত হয় তবে তার থেকে লজ্জার আর কিছু হয় না। যতটা কম পড়ে পাশ করা যায় – এই ভাবনা শিক্ষার দৈন্যকে সূচিত করে। পাঠাগারে গিয়ে পড়াশুনার সংস্কৃতি আজ প্রায় উঠে যেতে বসেছে। অন্তত গ্রামীণ পাঠাগারগুলোর দিকে তাকালে একথা বলা যায়। আড্ডাকে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ বলা যেতে পারে। আড্ডা ছাড়া বাঙালি হয় না। একসময় আড্ডা ছিল গঠনমূলক আলোচনার ক্ষেত্র। তা থেকে জন্ম নিয়েছে কত আড্ডা সাহিত্য। সেখানে আলোচনার বিষয়, তার প্রকাশ কৌশলে শালীনতা ও রুচিবোধ বজায় ছিল। আড্ডা জ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করে। অথচ আজকের প্রজন্মের কাছে

আড্ডার কেন্দ্রে ঢুকে গেছে অশালীন আলোচনা। সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে গঠনমূলক আলোচনা। কর্মসংস্কৃতির পরিবর্তন ও প্রজন্ম ব্যবধানের ফসল। পশ্চিমী হাওয়ায় আন্দোলিত বাঙালি জীবনে অনেকক্ষেত্রে নিজস্বতা বিপন্ন হতে চলেছে। প্রতিটি জাতির নিজস্ব পোশাক-আশাকেও পরিবর্তন ঘটেছে। চটকদারি সেখানে প্রবলরূপে ধরা পড়ে।

প্রজন্ম ব্যবধান সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে পারিবারিক কাঠামো ও পারিবারিক জীবনের ওপর। আজ যৌথ পরিবার তাই খান খান হয়ে গেছে। যতটা সম্ভব ছোট পরিবারে থেকে মানুষ আজ বেশি তৃপ্তি বোধ করে। দাদু, ঠাকুমা, বাবা, মা, কাকা, জ্যাঠাদের নিয়ে যৌথ সংসারের বন্ধন আজ আলগা। রক্তের সম্পর্কের যোগটুকু ছাড়া আত্মার যোগ তাই অনেকাংশে ফিকে হয়ে আসে। পারিবারিক ভাঙন মূল্যবোধের বিপন্নতার জন্ম দেয়। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, জীবনাচরণে সততা-নম্রতার শিক্ষা মানুষ লাভ করে পারিবারিক ক্ষেত্র থেকে। ছিন্ন-ভিন্ন পরিবার থেকে সে শিক্ষা কতটা লাভ করা যায়, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। ব্যক্তিমানুষ স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ হয়ে এগিয়ে যায় আগামীর পথে। প্রবীণ প্রজন্মের জন্য থাকে বৃদ্ধাশ্রম। কে বলতে পারে, আজকের স্বার্থপর ব্যক্তিমানুষের শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম হবে না? তিনি হয়ে উঠবেন না তাঁর পূর্বসূরির সহ-বাসিন্দা। শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীর গানের কটা কথা প্রসঙ্গে মনে আসে :

> "আশ্রমের এই ঘরটা ছোট জায়গা বড়ই কম
> মুখোমুখি আমি খোকা আর বৃদ্ধাশ্রম।"

সাহিত্যে, শিল্পে জীবনের কথা প্রতিভাত হয়। বাংলা সাহিত্যেও দুইকালের ব্যবধানের কথা ভাষা পেয়েছে। রাঢ়ের জীবনভাষ্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে দুইকালের দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। রাঢ়ের জীবনসংস্কৃতির পরিবর্তনের চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর গল্প উপন্যাসে। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে করালী ও বনোওয়ারীর ভাবনাগত ব্যবধানের কথা আমাদের সকলের জানা। আবার গ্রামীণ সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাও তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। 'গণদেবতা' উপন্যাস তার প্রমাণ। প্রজন্ম ব্যবধানের নিরিখে মূল্যবোধের অবনমন, আদর্শগত বিচ্যুতির যন্ত্রণা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রাণ পেয়েছে। 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পের উস্তাদ মেহেরা খাঁ পুরুষানুক্রমে সঙ্গীত জগতে আত্মলীন হওয়া একজন মানুষ। তাঁর শিষ্য জগন্নাথ চৌধুরীর পুত্র শংকর চৌধুরী পুরনো ঐতিহ্যের মত মেহেরা খাঁকে উপেক্ষা করতে পারে না। তবে তার মূল্যবোধের অবনমন ধরা পড়ে তার বক্তব্যেই :

> "বাপের গুরুদেবকে চটানো চলবে না, অন্তত যতটা
> সম্ভব লোক দেখানো শ্রদ্ধাটাও করতে হয় তাকে।"

'ভাঙা চশমা' গল্পে দেখা যায় চরম বিপর্যয়ের শিকার হয়েও একজন শিক্ষকের

মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস আর অন্যদিকে তাঁর ছাত্রের শিক্ষক বৃত্তি ছেড়ে সাব ডেপুটির চাকরিগ্রহণ দুজনের আদর্শগত ব্যবধানের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে। বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকে বুড়ো সর্দারের ছেলে মংলা জাতবৃত্তি কৃষিকাজকে মেনে নিতে পারে না। তাই নগদ পয়সার আশায় কৃষকবৃত্তি ছেড়ে শ্রমিকের কাজ করতে যায় সে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, এক প্রজন্মের ভাবনা, মূল্যবোধ, আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মে যুগের হাওয়ায় পালটে যায়। সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরাট সাহিত্য ভুবনে প্রজন্ম ব্যবধানের প্রকাশ খুব বেশি চোখে পড়ে। না। তবে তা দুর্লভ নয়। এপ্রসঙ্গে তাঁর দুটি লেখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল ' 'কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল' উপন্যাস ও 'সাক্ষী ডুমুর গাছে' ছোটগল্প।

'কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল' উপন্যাসে পিতা-পুত্রের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ব্যবধান ভাষা পেয়েছে। কুন্দনলাল একজন পাঁড় রাজনীতিক, প্রাক্তন সাংসদ। তার দলের নাম অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক পিজান্ট পার্টি। পার্টির টিকিটে এবারেও সে এম.পি. প্রার্থী। কাপতেনগঞ্জে নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পোস্টারে প্রচার তুঙ্গে। কাপতেনগঞ্জে পোস্টারে জ্বলজ্বল করে :

"যে মাথার দাম ব্রিটিশ সিংহ
ডেকেছিল ৫০০০ টাকা
ঘরের ছেলে সেই
কুন্দনলাল
আজ আপনার ভোটপ্রার্থী।"

কুন্দন চায় তার ভোটপ্রচারে সামিল হোক তার ছেলেরা। দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এখানে। ছোট ছেলে প্রবীর নিজেকে রাজনীতির প্রচার আলো থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। এসব তার না-পসন্দ। অথচ রাজনীতি পাগল কুন্দনলাল লোকসভা ভোটে প্রায় দশলক্ষ মানুষের সমর্থন চায়। পার্টির কাজে তাকে মাঝে মাঝে দিল্লি, এলাহাবাদ যেতে হয়। তাই তার ইচ্ছা ছেলেরা তার ভাবমূর্তিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুক। অন্তত প্রতিবার ভোটের সময় সে এটা করেই থাকে। অথচ পুত্র প্রবীর বলে — 'আমি কি আপনার ইলেকশন এজেন্ট?' কুন্দনলালের স্ত্রী বিমলাও এ ব্যাপারে ছেলেদের পক্ষ অবলম্বন করে।

রাজনীতির আঙিনায় কুন্দন ও তার বড় ছেলে সুবীর ভিন্ন মতাদর্শ পোষণ করে। সুবীর ছাত্র বয়স থেকে পরিষদ করে। দলের টিকিট পায়নি সে। কিন্তু এ নিয়ে তার কোন বিদ্রোহ নেই। পিতার রাজনৈতিক অবস্থান ছেলের মতাদর্শে মেলে না বলে কুন্দনের প্রচার পোস্টার দেখে সুবীরের হাসি পায়। রাজনীতি যে দুটি প্রজন্মকে বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে দেয়, পিতা-পুত্রের মধ্যেও তুলতে থাকে মতাদর্শগত ব্যবধানের প্রাচীর তা কুন্দন ও সুবীরকে না দেখলে বোঝা যায় না। পিতা কুন্দনলাল ভোটে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গে পুত্র সুবীরকে অনায়াসে বলতে পারে :

"সাধে দাঁড়াই নি বড় খোকা। এবার সেন্টারে তোদের পার্টিকে আমাদের নিয়েই কোয়ালিশন সরকার করতে হবে দেখে নিস।"

তরুণ প্রজন্ম যেভাবে জীবনকে দেখে প্রবীণরা সেভাবে ভাবেন না। কুন্দনপুত্র প্রবীর AIDP–এর প্রেসিডেন্ট যোশিজির কাছে নিজের লেখক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পিতৃতুল্য যোশিজির কাছে সে ইচ্ছা গুরুত্ব পায় না। যেন রাজনীতিকের ছেলে আরও বড় এক রাজনীতিক হবে – ভাবটা এমন। তাই যোশিজি প্রবীরের ইচ্ছাকে বিচার করে রাজনৈতিক মানদণ্ডে। তিনি বলেনঃ

"কুন্দলালজী স্টেট মিনিস্টার তো বনবেই। আউর উসকা বেটা হোগা এক না-লায়েক শায়ের।"

মূল্যবোধ মানুষকে প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে। মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ না ঘটলে বৃহত্তর মানবজীবনের ওপর তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে বাঙালি মূল্যবোধ পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। পারিবারিক বন্ধন, যৌথ সংসারের আনন্দ থেকে মানুষের বিচ্যুতি শ্যামলকে ব্যথা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অমোঘ অভিঘাতে শৈশবে শ্যামল যৌথ পরিবারের ভাঙন চোখে দেখেছিলেন। এই ভাঙন মানুষকে উপহার দিয়েছিল সংকীর্ণ মূল্যবোধ। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক কত মধুরতায় ভরে থাকে কিন্তু মূল্যবোধের অবনমন সেই সম্পর্কে স্বার্থপরতার বিষ নিয়ে আসে। প্রাপ্তির ঝুলিকে পূর্ণ করার প্রয়াস মুখ্য হয়ে ওঠে। সে ঝুলি পূর্ণ হলে চূর্ণ হয়ে যায় সম্পর্কের বাঁধন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাক্ষী ডুমুরগাছ' গল্পটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষপর্বে এসে মানুষ বড় অসহায় হয়ে ওঠে। স্ত্রী বিগত হলে আর পুত্র কন্যারা না দেখলে বৃদ্ধ জীবনের একাকীত্ব মর্মস্পর্শী হয়। লেখকের হাড়গিলে পাখি হয়ে যাওয়া অসহায় মেসোর জীবনে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। দুই সন্তান মেম বিয়ে করে বিদেশে বসবাস করে। অর্থ পাঠায় বটে কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার করে না তারা। বিলেতে নিয়ে গিয়ে পিতার দেখাশোনা করতেও চায় না। স্ত্রী বিগত হয়েছেন দুবছর। মেয়ে লতিকা শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে মাঝে মাঝে খোঁজ নিলেও তার মধ্যে লুকিয়েছিল স্বার্থান্ধ মানসিকতা। তাই বাবার সঙ্গে মর্মান্তিক আচরণ করতে তার একটুও কষ্ট হয় না। সাতাশি বছরের বাবা অসহায়, সব কথা মনেও থাকে না তার , চিনতে পারেন না অনেককেই। ঘরের দরজা বন্ধ না করেই ঘুমিয়ে পড়েন। ব্যাংকের একজন কাগজে সই করিয়ে মাসের প্রথমে টাকা দিয়ে যায়। যে পিতা স্নেহ মমতা ভালবাসা দিয়ে তিলতিল করে তাদের গড়ে তুলেছেন, কেবল সম্পদের লোভে বাবার প্রতি সহজাত ভালবাসা হারিয়ে ফেলে লতিকা। লেখকের মেসো চরম যন্ত্রণা থেকে বলেনঃ

"মানুষের শৈশব সবচেয়ে দীর্ঘ। গোরুর বাচ্চা দেখবি জন্মেই ছুটতে থাকে। আমাদের পা ফেলা ঠিক হতে পাঁচ বছর লাগে। মা-বাবার ওপর নির্ভর করতে করতে চিরকালের জন্য হীনমন্যতা জন্মায়। তার প্রতিশোধেই সন্তান

বাবা মা কে পরে কষ্ট দেয়।”

সম্পর্ক যেখানে অন্তরের নয় বৃদ্ধ বয়সে সেখানে শুধু টাকাই সব পারেনা। সহায়হীনতা হয়ে ওঠে শেষ সম্বল। লতিকা বৃদ্ধ পিতাকে কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য পিতার সেবা নয়, পিতার সম্পদ একা আত্মসাৎ করার জন্য ইচ্ছাপত্রে সই করিয়ে নেওয়া। এই উদ্দেশ্য সফল হলে বাবাকে কাছে রাখার কোন মানেই হয় না। তাই বাবার সঙ্গে প্রতারণা করে মেয়ে লতিকা তাকে এক অজানা ট্রেনে তুলে দেয়। বাবা হারিয়ে যায় অজানা ঠিকানায়। দুই প্রজন্মের মধ্যে এমনভাবে রচিত হয় ব্যবধানের দূরত্ব। লেখককে সঠিকই বলেছিলেন তাঁর মেসোঃ

“- আমরা কেউ কারও নই”।

ব্যবধান কেবল ব্যবধানই বাড়িয়ে তোলে। তবে এও ঠিক প্রজন্ম ব্যবধান কখনও ঘোচবার নয়। অনেকটা ঠিক সমান্তরাল সরলরেখার মত। সময় বদলালে সমাজের বুকে উলটপুরাণ রচিত হয়ই। ফলে প্রজন্মান্তরে প্রাক্ আর বর্তমানের মধ্যে ফারাক হতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের মানসিকতার বদল ঘটলে এই ব্যবধান কমতে থাকবে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে। এক প্রজন্মকে তখন অন্য প্রজন্মের অচেনা মনে হবে না।

....

প্রজন্ম ব্যবধানে নারী চরিত্রের বিবর্তন : পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক

দেবশ্রী মজুমদার

"He is the bourgeoisie and
The wife represents the proletariate."

১৮৮৪ সালে ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস তাঁর 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থে উপরে উল্লিখিত কথাটি বলেছিলেন যা আজকের সমাজেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। লিঙ্গবৈষম্য এ সমাজের অভিজ্ঞানস্বরূপ। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতো সাহিত্যও লিঙ্গনিরপেক্ষ নয়। পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনায় নারীর অবদমন অধিকমাত্রায় পরিবেশিত হয়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ব্যবধানে এই ধারণার রূপান্তর ঘটলেও প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব বর্তমান।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ-এ ভুসুকুপাদের 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী' পদটির অন্তরালে হরিণ-হরিণীর রূপকার্থে কোথায় যেন নিজের শরীরের জন্য নারী নিজেই নিজের শত্রু হয়ে ওঠে – নারীর অবদমনের সামাজিক চিত্র ধরা পড়ে। পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ শতকে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও এই প্রবাদটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য – যেমন 'আপনার মাংসে হরিণী জগতের বৈরী'।

এ থেকে একটা জিনিসের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় যে অষ্টম বা নবম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের প্রজন্মের ব্যবধানেও নারীর সামাজিক অবস্থানের হেরফের বিশেষ হয়নি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্রের গতানুগতিক অবস্থান লক্ষ করার মত। দেবীরূপে কখনও তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ ('মনসামঙ্গল' কাব্যের মনসা)। আবার কখনওবা নিজ উদ্দেশ্যসাধনে ভিন্নমাত্রিক কৌশল অবলম্বন করেন ('চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের চণ্ডী)। প্রাক্ মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা চরিত্র এর মধ্যে ব্যতিক্রম। পূর্ণাঙ্গ নারী চরিত্র হিসেবে রাধা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

মধ্যযুগের মূলস্রোতের কাব্যধারা যখন ধর্মকেন্দ্রিক ভাবচেতনায় নিবিষ্ট, তখন আরেকটি সমান্তরাল কাব্যধারায় (রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান) নারীচরিত্রের ভিন্ন

সামাজিক ব্যক্তিত্ব পরিদৃশ্যমান। এই কাব্যধারা মুসলিম কবিদের দ্বারা পরিপুষ্ট। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবিরা (দৌলত কাজি ও সৈয়দ আলাওল ব্যতীত) হিন্দু কবিদের মত সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হননি। এর কারণ অনুসন্ধান করা এই প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক নয়। শুধু এটুকু বলে রাখা আবশ্যক যে এঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান আমাদের সাহিত্যে অনস্বীকার্য।

প্রজন্ম ব্যবধানে এই মুসলিম কবিদের কাব্যের নিরিখে নারীচরিত্রগুলি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার আলেখ্য নির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকবে এই প্রবন্ধের পরিধি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের কাব্যগুলির নারীচরিত্রের ক্রমবিকাশের বয়ান বিন্যাসের প্রচেষ্টা করা হবে।

বলা বাহুল্য সেযুগের কাব্যের এক ধারা ধর্মের এবং অন্যধারা জীবনরসের দিকে ধাবমান। লৌকিক জীবনের সান্নিধ্য থাকলেও হিন্দু কবিদের কাব্যে মূলত দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদসাহিত্য প্রভৃতি কাব্যসমূহের মূল অভিপ্রেত পূজাপ্রচার বৃদ্ধি। অন্যদিকে মুসলিম কবিদের কাব্যে ধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও কোথাও দেবত্ব আরোপিত হয়নি। রোমান্টিক প্রণয়-উপাখ্যানগুলিতে আপাত ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনি মানব-মানবীর প্রেমধর্মের বয়ান নির্মাণে প্রচেষ্ট হয়েছে। বিরহ-মিলনপূর্ণ প্রেমকাহিনিগুলির অন্তর্কাঠামোয় নারী-পুরুষের ভিন্নতর ভূমিকা উদ্‌ঘাটন তাই অনেকক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কালানুক্রমিকভাবে একইসময়ে রচিত মুসলিম কবির কাব্যগুলি কেন ভিন্নস্বাদের হয়ে উঠেছে, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠে আসে। আর এর উত্তর অন্বেষণের জন্য সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝে নেওয়া প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় তুর্কী আক্রমণের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুমাত্রায় পরিবর্তন সাধিত হয়। শাসনকাঠামোয় সামন্ততান্ত্রিকতার ও সামন্তপতির বিধিই সাধারণ মানুষের প্রতি কার্যকরী হয়। শাসকশ্রেণির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ নিয়োজিত হয়। এধরনের রাজার কাছে নারীও গণ্য হয় পণ্যস্বরূপ। আমাদের আলোচিত মুসলিম কবিরা এই শ্রেণির সামন্তপ্রভুর রাজসভায় পৃষ্ঠপোষকরূপে অনেকসময় অবস্থান করেন। রাজার মনোরঞ্জনের জন্য রচনা করেন রোমান্টিক উপাখ্যান। কোনো কোনো কাব্যে ধর্মতত্ত্বকথা থাকলেও তা আছে রূপকের আশ্রয়ে, কাব্যের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে নরনারীর প্রেম আখ্যান।

তুর্কী বিজয়ের ফলস্বরূপ এদেশে ইসলাম ধর্মের আধিপত্য বিস্তারিত হয়। ইসলামের মরমীয়াবাদী সূফিরা আবার আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের প্রেমের সম্পর্ক আশেক-মাশুক তত্ত্বের দ্বারা প্রকাশ করেন। আধ্যাত্মিক মার্গের এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রোমান্সধর্মী কাব্য রচনা করেন ইরান ও ভারতের সূফিকবিরা। তাঁদের অনুসরণেই বাংলার মুসলমান কবিগণ প্রণয়-উপাখ্যান রচনায় ব্রতী হন। অর্থাৎ

বোঝাই যাচ্ছে সমকালে রচিত হলেও হিন্দু কবিগণের দ্বারা রচিত কাব্যের থেকে মুসলিম কবিদের কাব্যের ধারা পৃথক হবার পেছনে কীভাবে কাজ করেছে ভিন্নমাত্রিক সামাজিক পশ্চাদ্‌পট।

এই রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান কাব্যধারার প্রবর্তক হলেন পঞ্চদশ শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর। তাঁর রচত 'ইউসুফ জোলেখা' এই ধারার প্রথম কাব্য। যদিও আদি ও মধ্যযুগের অন্যান্য অনেক কবির মতো সগীরের কাল নিয়েও অনেক বিতর্ক বিদ্যমান। কাব্যমধ্যে নিজের কাল ও পরিচয় নিয়ে হেঁয়ালির সূত্র ধরেই এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যরচনার প্রেরণা শাহ মুহম্মদ সগীর মূলত পান আরবদেশের কাহিনি থেকে। ফেরদৌসী তূসী হলেন ফারসি সাহিত্যে এই কাব্যধারার আদি কবি। কাব্যমধ্যে প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে কেবলমাত্র ফারসি কাব্যের অনুপ্রেরণাই নয়, কোরানের ভাষ্য থেকেও সগীর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

এবার মূল কাব্যে অনুপ্রবেশ করে আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে পঞ্চদশ শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর কীভাবে তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে নারীচরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছেন। তার আগে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে দেখে নেব পঞ্চদশ শতকের পূর্বপ্রজন্মে বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান ঠিক কীরকম ছিল। বাংলার আদি নিদর্শন চর্যাপদগুলিতেও নারী-প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। ২৮ সংখ্যক চর্যাপদে দেখা ছিল শবরী সুসজ্জিত হয়ে একা বনবিহারে যায়। ('একেলী সবরী এ বর্ন হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল ব্রজধারী') অর্থাৎ শবর রমণীদের বাড়ীর বাইরে বেরোনোর স্বাধীনতা ছিল। এমনকি স্বনির্ভর ডোমনারীর পরিচয় পাওয়া যায় যারা বংশতন্ত্রী নির্মিত চাঙ্গারি বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করত। ১০নং গানে ডোমনীর নৃত্যপরায়ণা রূপের চিত্রও অপিরিচিত নয়। " এক সো পদুমা চৌষঠী পাখুড়ী। তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।" সামাজিক শৃঙ্খলার শিথিলতাও কোথাও কোথাও ধরা পড়ে যখন দেখা যায় ডোমনারী কুলীনের সেবা করতেন এবং কাপালিককেও প্রত্যাখ্যান করতেন না। ডোম্বীর সঙ্গসুখ লাভের জন্য কাপালী যোগীরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করত। ৪নং গানে শাশুড়িকে ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে নরনারীর মিলন ঘটতে দেখা যায়। এরকম অনেকক্ষেত্রেই নারীচরিত্রের স্খলন লক্ষ করা যায়। দিনের বেলায় যে নারী আপন ছায়া দেখে ভয় পেত, সেই নারীই রাতে শ্বশুর নিদ্রাভিভূত হলে স্বচ্ছন্দে বিহার করত। (দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ। রাতি ভইলে কামরু জাঅ।) (জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী – চর্যাগীতির ভূমিকা)

অষ্টম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কোনো একসময় যদি চর্যার রচনাকাল হয়, তবে সেই সময়ের খণ্ডচিত্র পরবর্তীকালের সাহিত্যসৃষ্টিকে কতটা প্রভাবিত করেছে কিম্বা করেনি তা লক্ষ করার বিষয়। এক প্রজন্ম থেকে অন্য

প্রজন্মের ব্যবধানে নারীচরিত্রগুলির বিবর্তনের প্রকৃতিকে বুঝতে হলেও পূর্ব ঐতিহ্যকে স্মরণ করতেই হয়।

এ প্রসঙ্গে ত্রয়োদশ শতকের বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা চরিত্রের ক্রমবিবর্তনকেও উল্লেখ না করে পারা যায় না। কৃষ্ণ প্রেরিত ফুল-তাম্বুল প্রত্যাখ্যান করে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ না করেই।

"ঘরের স্বামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা।
নন্দের ঘরের গরু রাখোয়াল তা সমে কি মোর নেহা।।"

(পৃষ্ঠা -১৯৫, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র)

মধ্যযুগের নারীর যে সামাজিক অবস্থান, সেই অবস্থান থেকেই যেন তাদের প্রতিনিধি হিসেবে রাধার কণ্ঠস্বর কাব্যে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। দানখণ্ডে কৃষ্ণের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত মিলনে রাধা বিপর্যস্ত এবং ভীত হয়েছেন। 'বুধি বোল এঁবে ঘর জায়িব কোন ছলে।' (পৃষ্ঠা – ২৬১, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) এখানে যেন রাধার আর্তি কাব্যমধ্যে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মিলনের সময় রাধাকে অনেক সাবলীল দেখতে পাওয়া যায়। - 'রাধার মনত তবে জাগিল মদন।' এভাবে কবি কৃষ্ণের তুলনায় রাধা চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে অনেক বেশি বাস্তবতার সঙ্গে নির্ভরযোগ্য করে তুলেছেন।

পঞ্চদশ শতকের শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে নারীচরিত্রের বিকাশ কতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তা অনুসন্ধানযোগ্য। কাব্যের প্রারম্ভে আল্লাহ্ ও রসূল বন্দনা, মাতাপিতা ও গুরুজন বন্দনা, রাজপ্রশস্তি, পুস্তকরচনার কথা ইত্যাদির পরেই এসে পড়ে জোলেখার রূপ বর্ণনা। কাব্যে নায়িকার গুণের থেকে রূপের কদর বেশি করা হয়, বাজার অর্থনীতির যুগের অনেক আগেও এই চিরাচরিত প্রথা প্রবর্তিত ছিল। একযুগ থেকে অন্যযুগের ব্যবধানে এই ধারণার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এই প্রথাকেই অকপটে গ্রহণ করেছেন সগীর। জোলেখার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথকভাবে অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করা হল।

'কুচযুগ মধুপূর্ণ কাঞ্চন কটোরা।
সুবলিত সুধাতনু মণি ফল জোড়া।।
সুবর্ণ ডালেত দুই দাড়িম্ব রতন।
নীলমণি উদিত অন্তরগত ধন।।'

(পৃষ্ঠা-১১৯, শাহ মুহম্মদ সগীর – ইউসুফ জোলেখা)

এর পাশাপাশি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কৃষ্ণের কাছে বড়াই রাধার যে রূপবর্ণনা করেছে তাম্বুলখণ্ডে তা হল –

'কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে।
আভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে।।

মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে
মত্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে।।

(পৃষ্ঠা – ১৯১, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

এই দুই রূপবর্ণনার মধ্যে যেন কোনো অন্তর্মিল ধরা পড়ে। মধ্যযুগের প্রায় সব কাব্যেই নায়িকার রূপ বিষয়ক সুদীর্ঘ বর্ণনার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অনুশাসনে নারীকে লজ্জায় অবগুণ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু শাহ মুহম্মদ সগীরের রচনায় এক স্ব-উন্মোচিত নায়িকার স্বর শুনতে পাওয়া যায়। 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে জোলেখার প্রথম স্বপ্ন থেকে জোলেখার প্রথম প্রেমানুরাগ এবং জোলেখার দ্বিতীয় স্বপ্ন থেকে জোলেখার প্রেমাভিব্যক্তি - প্রেমের পথে তার এই ক্রমিক উত্তরোত্তর উত্তম পর্যায়ে বিবর্তন মধ্যযুগের সময়ানুপাতে এক বিরল দৃষ্টান্তের পরিচয় দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে সে শুধুমাত্র প্রেম নিবেদনেই সপ্রতিভ নয়, তার কামাতুর অবস্থাকেও অনায়াসে প্রকাশ করে।

'মুঞি নারী কাম-হতা বিধি মোরে দিল ব্যথা
কোন মতে নাহি প্রতিকার।"

(পৃষ্ঠা – ১২৯, শাহ মুহম্মদ সগীর – ইউসুফ জোলেখা)

কামহীন প্রেম-অনুভূতিতে আবদ্ধ করে রাখেননি কবি জোলেখাকে। বাস্তব শরীরী আবেদনকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেছেন সমকালের দাবি না মেনেই। কামরসে জারিত হয়ে বুদ্ধিলোপের কথাও উঠে এসেছে অসম্ভব আধুনিক মেজাজে।

"কামরস মতি সতী হৈল শতগুণ।
বুদ্ধি শুদ্ধি হারাইল আর পাপপুণ্য।।" (পৃষ্ঠা -১৩০,ঐ)

আবার অন্যদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের আদর্শ অনুসারে 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে পরকীয়া প্রেমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাধা ও জোলেখা দুজনেই বিবাহিতা নারী। কাব্যমধ্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিবরণ পাওয়া যায়। আবার এই দুজনের স্বামীই নপুংসক। বলা ভালো, তাদের স্বামীদের নপুংসক করা ছাড়া সেই যুগের প্রেক্ষিতে কবিদের তাঁদের কাব্যের নায়িকাদের পরকীয়া প্রেমের সমর্থনে অন্য কোনো জোরালো যুক্তি ছিল না। জীবনসত্যের দাবিতে তাই কাব্যগুলি হয়ে উঠেছে মানবিক গুণ সমৃদ্ধের অধিকারী। অথচ লক্ষ করার মতো রাধা এবং জোলেখা - এই দুজনের স্বামীই কর্মবীর ও সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রতিনিধি নারীচরিত্ররা বৈবাহিক সূত্রে সমাজে প্রতিপত্তি পেলেও যৌবনরসে বঞ্চিত হয়ে অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে। রাধার ক্ষেত্রে কৃষ্ণের অপ্রতিরোধ্য প্রচেষ্টা তাদের মিলনে অনুঘটক হলেও জোলেখার ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র কাব্যে ইউসুফকে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে সে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে। আর এখানেই সে হয়ে ওঠে মধ্যযুগের কাব্যধারায় বিরল দৃষ্টান্ত।

নব্বই এর দশক থেকে ফরাসি নারীবাদী দার্শনিকদের মধ্যে সাহিত্য সমালোচনা নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জুলিয়া ক্রিস্তেভা, লুস ইরিগারে এঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের মতে, পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনায় মেয়েদের নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার অভাব থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁরা প্রাচীন পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। প্লেটো থেকে শুরু করে ফ্রয়েড পর্যন্ত সকল দার্শনিকদের সূত্রও পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় নির্মিত।

এই বক্তব্যের মূল নির্যাসটুকু মাথায় রেখে আমরা যদি পঞ্চদশ শতকে রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যকে পর্যালোচনা করি তাহলে প্রশ্ন ওঠে নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কি এখানে সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়েছে? পুরুষতান্ত্রিক মন ও মেজাজ কাব্যে কতটা সক্রিয় হয়ে উঠেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের খাতিরে কাব্যের ভেতরে পুনরায় প্রবেশ করা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কাব্যের প্রধান নারীচরিত্র জোলেখার কণ্ঠস্বরের বয়ান নির্মাণ।

'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের 'জোলেখার প্রথম স্বপ্ন' থেকে শুরু করে 'স্বপ্নে আলাপ'- এই সাতটি অধ্যায় জুড়ে জোলেখার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনায় মেয়েদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর অশ্রুত থাকে বলে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে কোনো মহিলা সাহিত্যিকের রচনায় জোলেখার আত্ম-অনুভূতি আরো বেশি বাস্তবসম্মত হতে পারত। এই যুক্তি খণ্ডনের জন্য নিচে জোলেখা কর্তৃক প্রদত্ত কাব্যের কিয়দংশের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

" নাভি সরোবর যেন অমৃতের কুম্ভ।
মহাপুণ্য স্থলী তথি ত্রিজগতে মুণ্ড।।
কটিদেশ সিংহ জিনি অতুল সরুয়া।
গজকুম্ভ থল জিনি নিতম্ব গুরুয়া।।
মনুষ্যের প্রধান পুরুষ অবতার।
রূপে গুণে অসীম মহিমা তনুসার"।। (পৃষ্ঠা-১২২, ঐ)

নারী কর্তৃক পুরুষের এহেন রূপবর্ণনা মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহেই বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। কিম্বা,

"কামরস মতি সতী হৈল শতগুণ।
বুদ্ধি শুদ্ধি হারাইল আর পাপপুণ্য।।"

এখানেও জোলেখার অকপট স্বীকারোক্তি পঞ্চদশ শতকের নিরিখে অত্যন্ত আধুনিক।

এরপরেও দেখা যায় ভাগ্যক্রমে জোলেখা পূর্বপরিচিত ইউসুফের পরিবর্তে আজিজকে বিবাহ করে এবং বিপর্যস্ত হয়। 'আত্মবিলাপ' অংশে শুনতে পাওয়া যায়,

"হা হা মোর কর্ম কি লেখিলা ধর্ম

দৈবদশা মোর মন্দ
দেখাই একরূপ হইলেক আলোপ
হোরে দিয়া গেল ধন্ধ।। (পৃষ্ঠা – ১৫০, ঐ)

স্বপ্নে দেখা পুরুষের রূপের সঙ্গে বাস্তবে যাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে তার রূপের কোনো সামঞ্জস্য না থাকায় জোলেখার এই আত্মবিলাপ। নারীর ভাষ্যে এই সৎ স্বীকারোক্তি আমাদের তথাকথিত সমাজ পরিকাঠামোয় সত্যিই দুর্লভ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর কণ্ঠস্বরকে অশ্রুত রাখার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালায়। এমনকি নারীর ব্যক্তিত্ব, কর্মস্বীকৃতি, উপস্থিতি সবকিছুকেই অদৃশ্য করে দেবার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সবযুগেই কার্যকরী থাকে। প্রাচীন থেকে আধুনিক কোনো যুগই এর ব্যতিক্রম নয়। এইরকম সমাজচেতনায় পঞ্চদশ শতকের এক নারী চরিত্রের কুণ্ঠাহীন কণ্ঠস্বর কালাতীতভাবে সংরক্ষণ করে রাখার মতো।

কাব্যের প্রথম অংশ থেকেই জোলেখার সক্রিয় ভূমিকা নারী হিসাবে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে তোলেনি। নায়িকার রূপবর্ণনার বিশদ বিবরণের পাশাপাশি নায়কের রূপবর্ণনাও বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জোলেখা চরিত্রটির প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে থাকে তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে, প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতায়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণে পঞ্চদশ শতকের শাহ মুহম্মদ সগীরের সৃষ্ট জোলেখা তাই হয়ে ওঠে যুগোত্তীর্ণ চরিত্র।

ষোড়শ শতকের বিশিষ্ট কবি দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত ‘লায়লী মজনু’ কাব্যকে কেন্দ্র করে ঐ শতকে নারীর অবস্থানের স্বরূপ কি প্রকার ছিল তা পর্যালোচিত হবে। এজন্য কাব্যের নিবিড় পাঠ নির্মাণে টুকরো টুকরো ঘটনা-সূত্রের উপর আলোকপাত অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যে নায়কের জন্য বিরহতাপিত নায়িকাদের বারমাস্যা পরিলক্ষিত হয়। চৌতিশা ও বারমাসীতে নারীর বিরহ বিলাপ মধ্যযুগের কাব্য-কাঠামোর একটি বহুদর্শিত দৃষ্টান্ত। দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত ‘লায়লী মজনু’ কাব্যে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। পুরুষের তথা নায়কের বারমাসী ‘লায়লী মজনু’ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশীয় সাহিত্যে তিনজন নায়কের মধ্যে বিরহে কাতরভাব লক্ষ করার মতো। ঋগ্বেদে উষার জন্য পুরুরবার বিরহ, ‘মেঘদূত’ কাব্যে যক্ষের বিরহ এবং ‘লায়লী মজনু’ কাব্যের মজনুর বিরহ। আহমদ শরীফ কাব্যটির সম্পাদনায় ভূমিকা অংশে তাই বলেছেন, “একে ‘বিরহকাব্য’ না বলে ‘বিলাপকাব্য’ বলাই হয়তো সঙ্গত।” (আহমদ শরীফ সম্পাদিত লায়লী মজনু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা – ৪৭)।

এই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলে কবি সম্পর্কে একটি বিষয় অনুমেয় হয়ে ওঠে যে আনুমানিক ষোড়শ শতকে কলম ধরলেও যুগ-অনুপাতে তিনি আধুনিক ছিলেন। কারণ সামাজিক লিঙ্গের (gender) নিরিখে binary opposition বা

dichotomy কিছু আচরণ বা বিশেষণ পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, আবার কিছু নারীদের জন্য। যেমন লাজুক, আবেগপ্রবণ, কোমল-স্বভাবের প্রভৃতি শব্দগুলি নারীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই এবং কঠিন, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, রাগী প্রভৃতি শব্দগুলি পুরুষসুলভ আচরণের সঙ্গে জড়িত বলে সমাজ স্বীকৃত। এমতাবস্থায়, স্রোতের বিপরীত অভিমুখে চলে কাব্যের নায়কের বিরহ-সন্তপ্ত মূর্তি স্থাপন করা অনেকটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপের পরিচয়ই বহন করে।

কাব্যে দেখা যায় মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমেই বাড়ির চার দেওয়ালের চৌহদ্দির বাইরে যেতে সক্ষম হয়। তাই তার গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সবক্ষেত্রেই শিক্ষালাভে বাধা সৃষ্টি করা হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পায়ে শিকল বা বেড়ির অলংকৃত সংস্করণ নূপুর লায়লীর পায়ে পরানো হয়েছে, শুধুমাত্র তার গতিবিধি নির্ধারণের উদ্দেশ্যেই।

আহমদ শরীফ 'লায়লী মজনু' কাব্যটির 'কাব্যরস অশ্লীলতামুক্ত' বলে অভিহিত করেছেন। কাব্যটি সম্পর্কে তাঁর এই মত কতটা যুক্তিসঙ্গত তা একটু অনুধাবন করা যেতে পারে। লায়লীর রূপবর্ণনা অংশে আমরা দেখতে পাই –

"কুচযুগ মনোরম নবীন শ্রীফল সম
কিবা নব নারাঙ্গ যুগল।।
মধ্যদেশে ক্ষীণ অতি জিনিয়া মৃগের পতি
কনক কিঙ্গিনী শোভাকর।" (পৃষ্ঠা – ৯৫, ঐ)

এখন প্রশ্ন হল অশ্লীলতা ও আদিরসাত্মক বর্ণনা – এই দুটি কি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ? কাব্যের প্রয়োজনে নায়িকার রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে প্রায় কমবেশি সকল কবিই আদিরসাত্মক উপমা ব্যবহার করেছেন।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধের কবি শেখ চান্দের কাব্য থেকে আমিনার রূপ বর্ণনার প্রাসঙ্গিক উদাহরণটি তুলে ধরা হল –

"বক্ষমূলে নবরঙ্গ দেখিতে শোভিত।
যার গন্ধে দশ দিক করে আমোদিত।।
মৃগরাজ – মধ্য জিনি কটি অতি ক্ষীণি।
উরুযুগ সুললিত রাম রম্ভা জিনি।।"

(আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, পৃষ্ঠা – ৭৫)

ষোড়শ শতকেরই অন্যতম কবি শেখ কবীরের পদে নারী রূপ কীভাবে বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাধার রূপ বর্ণনায় কবিকে বলতে শোনা যায়,

"অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি
চলিতে পেখল গজ-রাজ-গমনি ধনি ধনি।

... ...

গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাঝাখানি

কুচ গিরি ফলের ভারে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি।”

(আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, পৃষ্ঠা – ৩৩)

ষোড়শ শতকে রচিত একের পর এক কাব্যমধ্যে নারীর রূপ বর্ণনায় প্রায় একই ধরনের উপমা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। উল্লিখিত সব কয়টি কাব্যই রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান। প্রত্যেকটি কাব্যই কাহিনি-বিন্যাসে পৃথক হলেও এই একস্থানে এসে কোথাও যেন একই পথ অনুসরণ করছে। আদিরসাত্মক উপমার অকপট ব্যবহার কাব্যের ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে হয়ে উঠেছে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কখনোই তা হয়ে ওঠেনি অশ্লীল বা অপ্রাসঙ্গিক। সাহিত্যে কোন্‌টা শ্লীল, কোন্‌টা অশ্লীল – এই বিষয়টি অত্যন্ত আপেক্ষিক এবং তা সম্পূর্ণরূপে যুগ, কাল অনুযায়ী পরিবর্তনশীল ও প্রশ্নসাপেক্ষ।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘কাব্যে অশ্লীলতা – আলংকারিক মত’ প্রবন্ধে কাব্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত আলংকারিক বামনের মতে, যে কথা শুনতে মনে লজ্জা, ঘৃণা বা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। ‘ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী’ বাক্যই তাঁর মতে অশ্লীল। এই যুক্তি অনুসারেও আমাদের আলোচ্য কাব্যগুলি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়।

ষোড়শ শতকের মুসলিম কবিদের কাব্যের নারী চরিত্ররা কখনও কবির বয়ানে আবার কখনও-বা নায়কের বা পুরুষ চরিত্রের বয়ানে রক্তমাংসের জীব হিসাবে পরিবেশিত হয়েছে। এই শতকে নারী চরিত্রগুলির কণ্ঠস্বর কতটা শ্রুত হয়েছে তাও ভেবে দেখবার বিষয়। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মেয়েদের নিজস্ব বক্তব্য পেশ করার পরিবর্তে তাদের নীরবতাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। মেয়েদের নীরবতার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যথার্থ সমাধানসূত্র হয়তো কোনদিনই পাওয়া যাবে না। সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখা ‘নারী ও নীরবতা’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানতে পারা যায়, ঋগ্বেদে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ (অর্থাৎ বাণী) বেদান্ত দর্শনের যে মূল ভিত্তিভূমি ‘সোহম’ অর্থাৎ ‘আমিই সেই’ – উচ্চারণ করেছিলেন। (ঋগ্বেদ – ১০/১২৫)

তাহলে দেখতে পাওয়া যায় ঋগ্বেদের সময় মেয়েরা সরব ছিলেন। এমনকি সেসময়ের বেশ কয়েকজন মহিলা কবির নামও জানতে পারা যায়। যেমন লোপামুদ্রা, অপালা, শাশ্বতী, ঘোষা, প্রমুখ। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতক) এসে কোন বিখ্যাত নারী কবির নাম শুনতে পাওয়া যায় না। উপনিষদেও মৈত্রেয়ীকে অধিকাংশ সময়ে স্বামীর অধ্যাত্ম উপদেশ নীরবে শুনতে দেখা যায়। নাট্যসাহিত্যের নারী চরিত্রদেরও এমনকি কম কথা বলতে শোনা যায়। উক্ত প্রবন্ধে লেখিকাকে বলতে শোনা যায়, “কেন আমরা কোন আরিস্তোফানেসকে পেলাম না, যিনি মেয়েদের অসহযোগের ছবি আঁকতে পারেন, তা

সে ঠাট্টা মস্করার ছলে হলেও?" (পৃষ্ঠা – ১৩৩, সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, এন বি এ, নভেম্বর, ২০০৬)।

নারীর বিবর্তনের ইতিহাস লিখতে গেলে তাই তার নীরবতার যুগানুক্রমিক ইতিহাসকে অস্বীকার করা চলে না। অধুনা প্রয়াত সাহিত্যিক মায়া অ্যাঞ্জেলো তাঁর প্রথম আত্মজীবনী 'I know Why the Caged Bird Sings' বইটিতেও বারবার মেয়েদের প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাওয়া অশ্রুত কণ্ঠস্বরের কথা বলেন। যা যথাযথভাবে শুনতে পেলে এবং সেই শুনতে পাওয়া স্বরকে লিপিবদ্ধ করা গেলে আমরা আজ হয়তো অন্য কোনো ইতিহাসের সন্ধান পেতাম। (Maya Angelon – 'I know Why the Caged Bird Sings, Viva Book Pvt Ltd, 2007)।

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ সব প্রজন্মের নারীদেরই জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাছে নতিস্বীকার করতে হয়। পাশ্চাত্য দেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যুগ-কাল-স্থান নির্বিশেষে মেয়েদের অবস্থা ছিল চিরকালই ভয়াবহ। পরিবারের গৃহস্থালির কাজের মধ্যেই তাদের গতিবিধিকে নির্দিষ্ট করে রাখার প্রয়াস সবসময়ই চালিয়ে যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ব্যবধানে নারীর অবদমনের রূপটা শুধু পাল্টে পাল্টে যেতে থাকে।

গ্রন্থতালিকা :

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত – বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৬।
২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ', সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২।
৩. আহমদ শরীফ সম্পাদিত দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ বিরচিত 'লায়লী মজনু', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৬।
৪. আজহার ইসলাম – 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯২।
৫. শাহ মুহম্মদ সগীর – ইউসুফ জোলেখা, ডক্টর এনামুল হক সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৪।
৬. সুকুমারী ভট্টাচার্য – 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ', এন বি এ, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৬।
৭. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী – 'চর্যাগীতির ভূমিকা', ডি. এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৮২।
৮. Maya Angelon's 'I Know Why the Caged Bird Sings', Viva Book Pvt Ltd, Indian Edition, 2007.

৯. 'Feminist Readings / Feminists Reading' – Sara Mills and Lynne Pearce, Prentice Hall, Europe, 1996.

১০. Friedrich Engels – 'The Origin of the Family, Private Property, and the State', Penguin Classics, 1884.

....

হিমালয় ভ্রমণে দুই প্রজন্মের অভিজ্ঞান : দেবেন্দ্রনাথ ও সুষমা দেবী

চন্দনা চক্রবর্তী

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি জীবনের অন্ধকারের ঘনঘটা ছিন্ন করে যখন আলোর উদ্ভাষণ দেখা দেয় তখন যে গুটিকয়েক বাঙালি পরিবার জ্ঞান-মুক্তচিন্তা-স্বাধীনতার ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ ধরে এগিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার। পাশ্চাত্য থেকে বয়ে আসা নবজাগরণের সবগুণগুলি পেয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সব সদস্য হয়ে উঠেছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। এই সময় 'জোড়াসাঁকো' নামটিও হয়ে উঠেছিল সাংকেতিক। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্প-সংস্কৃতির অবাধ গতায়াত চলছিল যেন এই সাঁকোর মধ্য দিয়ে। অস্তগামী মধ্যযুগ ও উদীয়মান নবযুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ধর্ম-দর্শন-শিল্প-সংস্কৃতি-স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃত ক্ষেত্রে নিজস্ব সংস্কার গড়ে তুলেছিল। শুধু তাই নয় ঠাকুরবাড়ির জীবনচর্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তৎকালীন বাঙালি সমাজ। বাঙালিও যে বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে পসার জমাতে পারে, ঐশ্বর্য বৈভবে ধনী ইংরেজদের টেক্কা দিতে পারে তা দেখিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। বিলাতে বাসকালীন বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবার এমনকি রাজপরিবারের সদস্যরাও তার বাসভবনে আতিথ্য রক্ষা করতে আসত। দ্বারকানাথের আতিথেয়তার বহর ছিল সেখানকার সংবাদপত্রগুলির আলোচনার বিষয়। যদিও সেই বৈভব দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে দেশ বিদেশ ভ্রমণের নিমিত্ত সিংহদুয়ারের যে বদ্ধ অর্গল খুলে দিয়েছিলেন দ্বারকানাথ, পরবর্তীকালে তা আর রুদ্ধ হয়নি। দ্বারকানাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম সদস্য যিনি ভারতের বাইরে যাত্রা করেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, জ্ঞানদানন্দিনী, সরলাদেবী, সুষমাদেবীরা বিদেশে গমন করেন ভ্রমণ করতে কিংবা কর্মসূত্রে বা পুরস্কার সম্মান গ্রহণের জন্য। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতির কথা বলাই বাহুল্য কিন্তু তার পাশাপাশি তাঁরই পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা যেমন – ইন্দিরাদেবী, সরলাদেবী, সুষমাদেবী বা সৌমেন্দ্রনাথেরা আপন কর্মগুণে এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে দেশের বাইরেও সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা যখন যেখানে ভ্রমণ করেছেন, সেখানকার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। পরবর্তীকালে তা গ্রন্থাকারে বা সাময়িকপত্রের পাতায় প্রকাশিত হত। এর মধ্যে বেশকিছু ভ্রমণ কাহিনি ভ্রমণ সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ। সুতরাং বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতো বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের অবদান রয়েছে। ঠাকুরবাড়ির পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের ভ্রমণসাহিত্যের বিপুল সম্ভার রয়েছে। তার মধ্যে বর্তমানে বেশ কিছু ভ্রমণকথা পুনর্মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছে আবার কিছু এখনও একশো দুশো বছরের পুরানো সাময়িকপত্রের জীর্ণ পাতায় অচর্চিত রয়ে গিয়েছে। দেখা গেছে ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা একই স্থানে বারবার গিয়েছেন, কখনো একাধিক সদস্য একসঙ্গে মিলে গেছেন, কখনো কোনো সদস্য একাকী ভ্রমণ করেছেন। আবার এও হয়েছে কোনও এক স্থানে ঠাকুরবাড়ির এক সদস্য গেছেন ও ভ্রমণকথা লিখেছেন ; আবার সেই স্থানেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে পরবর্তী প্রজন্মের সদস্য-সদস্যারা ভ্রমণ করেছেন ও সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রণিধানযোগ্য এটাই যে, দেখা গেছে একই পরিবারের সদস্য-সদস্যা একই স্থান ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু সময়কালের ব্যবধান, দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান, পরিবেশ-পরিস্থিতিগত ব্যবধান তাদের লেখার মধ্যে একটা প্রজন্মগত ফারাক এনে দিয়েছে। যা নিয়ে একটা তুলনামূলক ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে ভ্রমণসাহিত্য আধ্যাত্মিক মাধুর্য ও গাম্ভীর্য লাভ করেছিল। বাংলা গদ্যের সূচনার অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের সাবলীল, নির্মেদ রচনা পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। এক্ষেত্রে সময়কালটি স্মরণে রাখা জরুরি। উনবিংশ শতকের একেবারে প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফরমায়েশি গদ্য আত্মমুক্তি লাভ করেছিল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথের হাতে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যাসাগর স্কুল পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদকর্ম করে বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ ভ্রমণ করছেন। তাঁর উত্তরভারত গমনের সময়কাল ১৮৫৬-১৮৫৭, সিমলায় যান ১৮৫৮ সালে। মরি, চম্বা যান ১৮৯৫ সাল নাগাদ। মরি, চম্বা ভ্রমণ বাদ দিলে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণের যাবতীয় অভিজ্ঞতা তাঁর 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮) তে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত সময়কাল অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ সূচনাভাগের তথ্যসমৃদ্ধ দলিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছিল এক পরিব্রাজক মন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণকার্যে ব্যয় করেছেন। বিপুল বৈভবের মধ্যে থেকেও তিনি মহর্ষি। মনে প্রাণে তিনি ব্রাহ্ম। নিরাকার একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু প্রথমদিকে ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা হত। পরিবারের অন্য সদস্যদের

মনে আঘাত দেবেন না বলেই পূজা তিনি বন্ধ করেন নি; কিন্তু পূজার সময় দেবেন্দ্রনাথ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় স্থান হিমালয়। আলমোড়া, বক্রোটায় নির্মাণ করান তাঁর বাসগৃহ 'The Snow Decon'। তাঁর হিমালয়, সিমলা, কাশ্মীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমরা 'আত্মজীবনী' ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় পেয়েছি। তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম যেমন রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী বা তারও পরবর্তীকালে সুষমাদেবীর হিমালয়ের বুকে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিভিন্ন সদস্যের ভ্রমণ কাহিনির মধ্যে উঠে আসা প্রজন্মগত ব্যবধান নিয়ে আলোচনা বিস্তৃত ক্ষেত্র দাবি করে। বর্তমান প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমাচল ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী সুষমাদেবীর হিমাচল ভ্রমণের কাহিনির আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখব জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুই প্রজন্মের সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে ফারাক কীভাবে ফুটে উঠেছে।

১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ যখন উত্তরভারত যাত্রা করেন তখন আশ্বিন মাস। একেবারে ট্রেনে নয়, প্রথমে কাশী পর্যন্ত বোটে তারপর এলাহাবাদ হয়ে দিল্লি যাত্রা করেন। মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করে দিল্লিতে আসেন। দিল্লিতে কিছুদিন কাটিয়ে মেলট্রেনে পশ্চিমে আম্বালায় পৌঁছান। আম্বালা থেকে লাহোর, লাহোর থেকে অমৃতসর আসেন। দেবেন্দ্রনাথ উত্তরভারত যাত্রাকালে যেসকল স্থান ঘুরে ঘুরে গেছেন তার সূচিটা লক্ষ করলে বুঝতে ভুল হয় না যে ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন তীর্থস্থানগুলিতে ঘোরা তাঁর লক্ষ ছিল। প্রথমে কাশী তারপর ত্রিবেণী সঙ্গম এলাহাবাদ, তারপর মথুরা-বৃন্দাবন- আগ্রা হয়ে দিল্লি। হিন্দু তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করে দেবেন্দ্রনাথ মোহিত হলেন ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিগুলি অবলোকন করে। কুতুবমিনার দেখে তাঁর মন্তব্য – "কুতুবমিনার প্রায় ১৬১ হাত উচ্চ, আমি সেই মিনারের সর্ব্বোচ্চ চূড়াতে উঠিয়া অর্দ্ধ—নভোমণ্ডলের নিম্নে মহাদায়তন ভূমির বিচিত্রতা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এ সেই মহতো মহিয়ানের মহিমা।"

অমৃতসর এসে শিখদের অলখ নিরঞ্জন উপাসনার সঙ্গে তাঁর ব্রাহ্ম উপাসনার সামঞ্জস্য অনুভব করেন। তাই অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের উপাসনা তাঁর মনকে আকৃষ্ট করে। ব্রাহ্মসমাজ ও শিখ সম্প্রদায়ের উপাসনার তুলনামূলক বিচার করে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন –

"মন্দিরের মধ্যে এইপ্রকার দিনরাত্রি সপ্তপ্রহর ঈশ্বরের উপাসনা হয়, মন্দির পরিষ্কার করার জন্য রাত্রি শেষপ্রহরে উপাসনা বন্ধ থাকে। ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে দুঘন্টা মাত্র উপাসনা হয়, আর শিখদের হরিমন্দিরে দিনরাত উপাসনা। কাহারও মন ব্যাকুল হইলে নিশীথ সময়েও সেখানে গিয়া উপাসনা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। এই সদ্দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মদিগের অনুকরণীয়।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেবেন্দ্রনাথ গৃহী হয়েও আধ্যাত্মিক ভাবরসে জারিত শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে যেখানে যে রীতি গ্রাহ্য মনে হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ও

আত্তীকরণে সচেষ্ট হয়েছেন। নতুবা নিছক পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত তীর্থভ্রমণ করা দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের একাকী ভ্রমণের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাব, বিভিন্নধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি, হিমালয়ের শান্ত, সুবিস্তৃত পরিসরে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া – এসব কিছুর মধ্যে মিশে থাকত অধ্যাত্মরস। এদিক থেকে স্বাভাবিকভাবে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের সদস্য-সদস্যাদের ভ্রমণসাহিত্যের আধ্যাত্মিক উদারতা পাওয়া যায় না।

দেবেন্দ্রনাথের সেজপুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্তমকন্যা সুষমাদেবী নারী প্রগতিকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঘোড়ায় চড়া থেকে কেমব্রিজের ট্রিমিটি কলেজ থেকে দূরশিক্ষার মাধ্যমে পিয়ানো শেখা সবেতেই প্রথম ছিলেন সুষমা। বিবাহ হয় গণিতজ্ঞ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সাত সন্তানের জননী বিবাহিত জীবনের প্রথমদিকে সন্তানপালনে ব্যস্ত থাকলেও পরবর্তীকালে সম্পূর্ণভাবে নারীপ্রগতিকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। 'Uncle Tom's Cabin' গ্রন্থের প্রণেত্রী হ্যারিয়েট বিচার স্টো দ্বারা প্রভাবিত হন সুষমা। ১৯২৯ সালে আমেরিকা যান 'উইমেনস্ এডুকেশনাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া' র হয়ে বক্তৃতা করতে। নারীশিক্ষা, ভারতের নারী, ভারতের দর্শন ও আদর্শ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই প্রগতিশীল নারীর ভ্রমণকথায় দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, স্বাধীনতা ও ঔদার্য থাকবে। হিমালয়ের বুকে ভ্রমণরত দেবেন্দ্রনাথের যে আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ দেখি তা স্বাভাবিকভাবেই সুষমাদেবীর ভ্রমণকথায় পাওয়া যায় না। আমেরিকার শিক্ষাসংক্রান্ত বিশ্বসম্মেলনে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাওয়ার আগেই বোন সুদক্ষিণাদেবী, আপন পুত্র, বোনপোকে নিয়ে যান কাশ্মীরে। সেই কাশ্মীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'রাউলপিন্ডির পথে', 'শ্রীনগরের পথে', 'রামপুরের পথে', 'শ্রীনগর' ইত্যাদি শিরোনামে।

এই প্রবন্ধের বিষয় যেহেতু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের ভ্রমণকথায় দর্শিত প্রজন্মগত ব্যবধান, সেক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। সুষমাদেবী ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজি সম্পর্কে প্রচারিত নিন্দামূলক কথার তথ্যানুসন্ধান করেছিলেন এবং দেখেছিলেন স্বামীজির মহত্ত্ব। দেশে ফিরে তা নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশও করেছিলেন। অন্যদিকে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল', 'প্রবাসী' এমনকি ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা 'ভারতী'তেও বিবেকানন্দের বিষোদ্গার করেছিল। সুষমাদেবী এক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীজিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন।

সুষমাদেবী কাশ্মীর যাত্রা করেন ১৯১৬ খ্রিঃ এর ১৫ এপ্রিল। সুষমাদেবী তাঁর ভ্রমণকথায় সাবলীল ও অন্তরঙ্গভাব বজায় রেখেছেন। বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সঙ্গে

পরিচিত হওয়া, উত্তরাঞ্চলের নারী-পুরুষের পোশাক পরিচ্ছদ, সেখানকার পরিবেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখিকার। 'রাউলপিণ্ডির পথে'- লেখিকার এই প্রবন্ধে প্রথমেই পাই ট্রেনে এক ইংরাজ বৃদ্ধার কথা। প্রথমে বৃদ্ধা নেটিভ মহিলাদের দেখে নাসিকা কুঞ্চন করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি এদের দলে ভারি দেখে মিষ্টভাষী হয়ে আলাপ করেন।

সুষমাদেবীরা কাশ্মীর যান যখন, তখন সরাসরি রাউলপিণ্ডি পৌঁছানোর গাড়ি ছিল না। সাহারণপুরে গাড়ি বদল করে রাউলপিণ্ডি পৌঁছাতে হয়। রাউলপিণ্ডিগামী ট্রেন লুধিয়ানা ছাড়িয়ে জলন্ধর পৌঁছায়। সুষমাদেবীর ভ্রমণকথার মধ্যে তাঁর নিসর্গপ্রীতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ঠাকুরদা দেবেন্দ্রনাথের মত প্রকৃতিকে প্রাণ খুলে সাদরে গ্রহণ করার মানসিকতা সুষমাদেবীরও ছিল –

> "১৭ই প্রত্যূষে গুজার খাঁ স্টেশনে গাড়ি থামিল। এখান হইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে আমরা উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বঙ্গদেশের নদনদী, খাল-বিল পূর্ণ, আম্র-কাঁঠাল-কদলী প্রভৃতি সহস্র প্রকারের বৃক্ষাদি সুশোভিত হরিদ্বর্ণের সহিত এখানকার শুষ্ক গেরী মাটি রঙের ভূমির কী প্রভেদ!"

সুষমাদেবী সুদূর উত্তর-পশ্চিমে এসে রুক্ষ, শুষ্ক পরিবেশের সঙ্গে শস্য-শ্যামল নরম পলিমাটির দেশ বাংলাদেশের কথা স্মরণ করেছেন।

১৮৫৭ সালে দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণ হোক কিংবা উনপঞ্চাশ বছর পরে ১৯১৬ সালে সুষমাদেবীর ভ্রমণ হোক, একটা জিনিস লক্ষ করা গেছে তাদের ভ্রমণকথায়। দেবেন্দ্রনাথ বা সুষমাদেবী উভয়েই ভ্রমণ করতে গিয়ে কষ্টবরণ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঝাঁপানে চড়ে কষ্টবরণ করেছেন পর্বতে ওঠার সময়, আবার রাত্রিবাসকালে সবসময় উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকত এমন নয়। ফলে যাত্রাকালে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কতবার। সিমলা যাওয়ার পথে একটি জলপ্রপাত দেখতে পান। পথে তাঁর মনে হল –

> "জলপ্রপাতের অতিশীতল কণাসকল, খাদে নামিবার পরিশ্রমে আমার ঘর্মাক্ত শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল, অমনি আমার চক্ষে অন্ধকার ঠেকিল।"

পরে আবার সুস্থ হয়ে সেই জলপ্রপাতের জলেই অবগাহন করেন। জমিদারি, আভিজাত্য, ছুঁৎমার্গ দূরে সরিয়েই দেবেন্দ্রনাথ বেরিয়েছিলেন। আবার সুষমাদেবীকেও শ্রীনগরে পৌঁছাবার পথে বিপদে পড়তে হয়। যাত্রাপথে বৃষ্টিতে ভিজে যায় বিছানা তোষক সব। শীতরাতে বিছানা বালিশ ছাড়াই এক পোশাকে রাত কাটাতে হয়। চাকরের গাড়ি সময় মতো বাংলোয় না পৌঁছানোর ফলে দু-একদিন কাশ্মীরের আঞ্চলিক খাবার – পুরি-কমলগাট্টার তরকারি, পেঁড়া খেয়ে দিন গুজরান করতে হয়।

দেবেন্দ্রনাথের আরো একটি উত্তরভারত ভ্রমণকাহিনি প্রকাশিত হয়

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পাতায়। ১৮১৭ ও ১৮১৮ শক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পাতায় 'মরিভ্রমণ' ও 'চম্বাভ্রমণ' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। সেবারও দেবেন্দ্রনাথ দিল্লি হয়ে পাঞ্জাব যান, সেখান থেকে শতদ্রুর নিকট উপস্থিত হন। পাহাড়ি পথে যেতে যেতে গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। এমনকি রক্তপাতও হয়েছিল। দুর্ঘটনার পর ফের যাত্রাকালে খরস্রোতা শতদ্রু দেখে আনন্দ পেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। অমৃতসরে পৌঁছে চাপাটি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপর রাউলপিণ্ডির উপত্যকা মরিতে এসে সুস্থ হন। দেবেন্দ্রনাথ সংকটময় পথের বর্ণনা দিয়েছেন যেমন, তেমনই আবার সুষমাদেবীরও মরির পথে যাত্রাকালে একইভাবে বিপদসংকুল পথের বর্ণনা পাওয়া যায়।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ভ্রমণসাহিত্যের মধ্যে কিভাবে প্রজন্মগত ব্যবধান গড়ে উঠেছে তা দেখাতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে আলোচনায় আনা হয়েছে সুষমাদেবীর কাশ্মীর ভ্রমণবৃত্তান্তকে। দৃষ্টিভঙ্গির দিকে একটা ফারাক লক্ষ করলাম বটে, আবার জীবনদর্শনজনিত প্রভেদও লক্ষ করার মতো। সুষমাদেবী কাশ্মীরের উপজাতিদের জীবনচর্যা পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন; তাদের খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রচলিত প্রথা পর্যন্ত সুষমাদেবীর রচনায় আমরা পাই; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণকথায় তা আমরা পাই না। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্যের মধ্যে তন্ময় প্রাবন্ধিকের গুণাবলী বর্তমান তা সুষমাদেবীর ভ্রমণকথায় পাই না। দুই প্রজন্মের লেখাতেই সাধুভাষা ব্যবহৃত। দুটি ভ্রমণকথা পাশাপাশি রেখে গবেষকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের পরে এই সিদ্ধান্ত নিতেই পারি যে, সময়কাল, জীবনদর্শন যতই ব্যবধান এনে দিক, মুক্ত প্রকৃতির কোলে স্বাধীনভাবে বিচরণের ও সেই অভিজ্ঞতা লেখনের মানসিকতা ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের মধ্যে বরাবর নিহিত ছিল।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ-

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকথা – প্রত্যূষ কুমার রীত (সম্পা)
২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী – জ্যোতির্ময় সেন (সম্পা)
৩। মরি ভ্রমণ – তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৭ শক (পৃষ্ঠা ১৮৫ – ১৯১)
৪। চম্বা ভ্রমণ – তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৮ শক (পৃষ্ঠা ১৯২ – ১৯৩)
৫। শ্রীনগরের পথে সুষমা দেবী – প্রত্যূষকুমার রীত (সম্পাদিত)।

....

আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতির সেকাল-একাল ও ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি

হরিপদ হেমব্রম

আদিবাসী বলতে আমরা সেই জনসমষ্টিকে বুঝি যারা নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বা অঞ্চলে অন্য জনসমষ্টি আসার বহু আগে থেকে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত ভূখণ্ডে বিভিন্ন বহিরাগত জাতিসত্তার আগমনের ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত বা বিপন্ন হয়েছে। যারা পূর্ব-ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, যাদের স্বতন্ত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে। চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে যাদের নিবিড় সম্পর্ক। স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা জাতি হিসাবে যারা পূর্বপ্রজন্মের পরিবেশ ও ব্যবস্থাগুলোকে মূলত পুনঃউৎপাদন করে মূলত তারাই আদিবাসী বলে পরিচিত।

ভারতের ছটি বড় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্যতম হল সাঁওতাল জাতি। সারা ভারতে প্রায় দশকোটি আদিবাসী মানুষের মধ্যে সাঁওতাল আদিবাসীর বর্তমান সংখ্যা প্রায় এক কোটিরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গে তিরিশ লক্ষ সাঁওতাল ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে। সাঁওতাল সংস্কৃতি মূলত প্রাচীন তথা আদিবাসী সংস্কৃতি। আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগবন্ধন থাকা সত্ত্বেও স্বঁতন্ত্র প্রাণরসের সফল অভিব্যক্তিতে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত; আপনাতে আপনি বিকশিত। নিজস্ব ভাষা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব, নাচ-গান, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতিনীতি, বিচারব্যবস্থা, জীবনাচরণ – ঐক্য ভাবনা সম্বলিত বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

সাঁওতাল সংস্কৃতির অম্লান স্বাক্ষর রয়েছে তার প্রাচীন সঙ্গীতে –

"নোওয়া আব আঃ জানাম দিশম-নোওআ আবোআঃ
মেনাঃ তাবন – সেদায় হিলোঃ খনাঃ।
লেগেম লেগেম বরু হারা
তালা তালা গাডা নালা
আবদ বন অড়াঃ আকাৎ বুরু হারাগটা
আবোরেয়াঃ তেয়ার গেয়া নোওয়া দিশম গটা।
বৌদ বৌইহৌড় তেয়ার আকান – মাঃ কাতে বির লাটা।।"

এই সাঁওতালী গানের বাংলা করলে এই রকম অর্থ দাঁড়ায় –

এই আমাদের জন্মভূমি প্রাচীনকাল থেকেই আছে
শান্ত, স্নিগ্ধ, পাহাড়-পর্বত, তারই মাঝে নদী নালা।
পাহাড়-পর্বত, জুড়েই আমরা ঘর করেছি।
আমাদের তৈরি এই সমস্ত জমি জায়গা
পাহাড়-জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করেছি।।

প্রাচীন জংলা ভারতবর্ষকে আদিবাসীরাই বাসযোগ্য করেছিল। তারা স্বাধীনভাবে বাস করতো। মুঘল, পাঠান, তুর্কী, ইংরেজ আমলেও স্বাধীনচেতা আদিবাসী বশ্যতা স্বীকার করেনি। আদিবাসী সাঁওতালরা তাদের জাতীয় অস্ত্র তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম, তলোয়ার দিয়ে আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ইংরেজদের বন্দুক, কামান, গোলাবারুদের কাছে পরাজিত হয়েছে। পরাজিত আদিবাসী তাই বনেজঙ্গলে পালিয়ে বেঁচেছে। আর অন্যজাতি গোষ্ঠীর কাছে বন্য, জংলী, অসভ্য জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। সাঁওতালরা কোনোকালেই বশ্যতা-দাসত্ব স্বীকার করেনি। তাই নিজ সভ্যতা চাই চম্পা দুর্গের মতো 'বাদোলীগাড়', 'হিহিড়ি-পিপড়ি' – 'সিমগড়', মানগড় (সিন্ধুসভ্যতা) ছেড়ে গভীর গহন জঙ্গলে পালিয়ে বেঁচেছে।

আজকের ভারতবর্ষের হড়পপন (ভূমিপুত্র) আদিবাসীদের যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দারিদ্র্য তা কিন্তু পূর্বে ছিল না। প্রাচীনকালে সাঁওতাল আদিবাসীরা স্বচ্ছল জীবন-যাপন করতো। তাদের গানেই তার প্রমাণ রয়েছে।

"সেদায় সারি সান্তাড় বয়হা
রাপাজবন তাঁহে কান।
... ...।"

প্রাচীনকালে সাঁওতালরা রাজা ছিল।

"চৌইগাড় চাম্পাগাড় সুখদলে দিশীই
তওয়া দাহে চেতান রেলে হারাবুরুলেন"

বাংলায় অনুবাদ করলে এর মানে হয় – "চৌইগাড় – চম্পাগাড়-এর সুখ আমাদের মনে পড়ে, দুগ্ধদধির মধ্যে আমরা বড় হয়েছি। সৎ-সরল, নিরীহ প্রকৃতির মেহনতী মানুষ সাঁওতাল, অতিথি সেবাব্রত, অল্পে সন্তুষ্ট জাতি। সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে কূটকৌশল বা ছলচাতুরীর মতো অন্যায়, অবিচার যে লুকিয়ে থাকে তা বিশ্বাস করতো না।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হল স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা। প্রকৃতি থেকে আমরা যে সম্পদ পাই তা সমানভাবে ভোগ করার প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার, এই অধিকার থেকে কেউ কৃত্রিম উপায়ে বঞ্চিত হলে বা অপরের দ্বারা ছল চাতুরীর দ্বারা শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়িত হলে স্বাভাবিকভাবেই মনে অসন্তোষ দানা বাঁধে। "বদ্ধঘরে বিড়াল যখন দেখে যে কোন দিক দিয়েই তার বাঁচার উপায় নেই, তখন অত্যাচারীর

অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মারমুখী মানুষের টুটি কামড়ে ছিঁড়তে চায়।" ভারতবর্ষের ভূমিপুত্রের জীবনেও এরূপ সংকট দেখা দিয়েছিল। এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি বা রেহাই পাওয়ার জন্যই তাদের গণঅভ্যুত্থান, 'হুল' বা 'বিদ্রোহ'। আসলে ঐতিহাসিকগণ আদিবাসীদের স্বাধিকার, জাতীয়তাবোধ, মহান আন্দোলন সংগ্রামকে ছোট করে দেখাতে চেয়েছেন যাতে নিজেদের জাতি ধর্মের নামে ইতিহাসে স্থান পেতে কোন বিতর্কিত বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়।

প্রাচীনকালে সাঁওতালরা পাহাড়-পর্বতের পাদদেশে নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে, অরণ্যপ্রকৃতির মাঝে জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতো। কালের প্রবাহে, বিবর্তনের ধারায় তারা পরিবারভুক্ত জীবন যাপন করে, নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি নিয়ে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে সংগ্রাম করে এসেছে। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম যেমন প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে করেছে তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিদেশি বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষপর্যন্ত আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের অন্দরমহল অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। ভাশুর-বউয়ের সম্পর্কের মধ্যে ছিল প্রাচীর। তারা ধর্মীয় জীবন যাপন করতো। উপাস্য দেব-দেবী হলো – "মারাংবুরু", 'জাহের এরা', 'মড়েক তুরুইকো', 'অড়াংবঙ্গা', 'আবগে বঙ্গা'। গ্রামের শাসনব্যবস্থা ছিল কঠোর। আজকের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দান আদিবাসী সাঁওতালদের। গ্রামের একজন মোড়ল (মাঝি), জগমাঝি, নায়কে, পারানিক, গডেৎ - এই পঞ্চব্যক্তিই হলেন গ্রামের প্রধান। বিচার ব্যবস্থায় নিয়মশৃঙ্খলা ছিল। গাই-গরু, ভেঁড়া-ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পাখি পোষ-মানাত। সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, নানা অনুষ্ঠান নিজস্ব জাতিসত্তার প্রথা মেনে সামর্থ্য অনুযায়ী আয়োজন করে আড়ম্বর সহকারে পালিত হতো বা এখনও হয়।

সাঁওতালী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন তাদের 'বাহা' এবং 'সহরায় পরব'। আদিবাসী সাঁওতালদের 'বাহা' উৎসব প্রকৃত অর্থে তাদের জীবনের এক নতুন পথের দিশারী। এই উৎসবের ধার্মিক মহত্ত্ব হল – মানুষের মনকে পবিত্র করা। 'বাহা' উৎসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিছক অনাবিল আনন্দ উৎসব নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞান চেতনা। আছে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, গণতন্ত্র, সাম্যবাদের আদর্শ। 'উম' বা উৎসবের প্রথমদিন জাহের সাড়িম নির্মিত হয় তা বলে দেয় সারাবিশ্বের মানুষ এক ছাতার তলায় আমরা সবাই; সবার সমান অধিকার। তাই বিশ্বজনীনতার অপর নাম 'বাহা'।

'বাহা' উৎসবের দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় 'সার্দি'। এই দিন 'জাহের থানে' সাড়িম এর নীচে চালের গুড়ি দিয়ে ডান দিক থেকে বাম দিক গোলাকৃতি 'খঁড়' তৈরি করা হয় যা পৃথিবীর আবর্তনের কথা বলে। পূজা সমাপনান্তে গ্রামের সবাই নতুন বস্ত্র পরিধান করে দলে দলে 'জাহের থান'-এ আসেন। পূজা শেষে নতুন

কুলোতে শালফুল নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন নায়কে হাড়াম (পুরোহিত মশাই)। গ্রামবাসীরা থানের বাইরে চটি জুতা খুলে পূজাস্থলে গিয়ে 'মারাংবুরুকে', জাহের এরাকে প্রণাম করার পর নায়কে কে প্রণাম করে। নায়কের দেওয়া ফুল মেয়েরা খোঁপায় ছেলেরা কানে গুঁজে 'সড়ে' বা খিচুড়ি খাওয়ার জায়গায় যায়।

'বাহা' উৎসবের তৃতীয় দিন অর্থাৎ 'সেঁদরা' বা শিকারের দিন। শিকারের দিন যদি এক ক্ষুদ্র শশক বা ছোট পাখিও শিকার করে তাহলে তারই মাংস সমানভাবে বণ্টিত হয় সমস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে। বাহা সেঁদরার দিন পলাশফুলে রাঙানো রঙিন জলে নিজের প্রয়োজনকে বাড়িয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশের সাথে সাথে অপরের মঙ্গল কামনায় এগিয়ে আসেন সবাই। কাজ উপলক্ষে কিংবা নাচ-গানের সময় হয়তো বা অজান্তে কোন সময় মান্য-গণ্য কারো সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে থাকতে পারে এই পবিত্র জল সেই কালিমাকে মুছে দেয় এটাই সাধারণ বিশ্বাস। এই অনুশাসনের মাধ্যমে, প্রতীকীভাবে সমাজ শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের এক নতুন জীবনে প্রবেশ করে। এই 'বাহা' উৎসব অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতাল রমণী মাথায় ফুল নিতে পারে না। এ যেন কঠিন অনুশাসনের বিশ্বাস প্রকৃতির দান ফুলকে 'সৃষ্টিকর্তা' বা ভগবানকে আগে উৎসর্গ করে তারপর নিজেরা ব্যবহার করে।

'বাহা' ছাড়াও যে উৎসব অনুষ্ঠান বা পূজা-পার্বণ সাঁওতাল জনজাতি পালন করে – 'সহরায় পরব' – কৃষিভিত্তিক জীবনযাপন করায় গবাদি পশুর বন্দনা। গবাদি পশু দ্বারা সমৃদ্ধি হওয়ায় গবাদি পশুদেরই বন্দনা করা হয়।

'করমপুজা' – কর্মে উদ্যোগী হওয়ার জন্য এই পূজা। 'আবগে বঙ্গা' – সাঁওতালদের প্রিয়দেবতা। বাধাবিঘ্ন থেকে রক্ষাকারী দেবতাকে প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসে ও আষাঢ় মাসে পূজা করা হয়। 'সাকরাত' – অর্থে সংক্রান্তিতে বছর শেষ। এই উৎসবে তীরবিদ্ধ করা হয়। শিকার প্রিয় সাঁওতালদের এ যেন শিকারিকে লক্ষ্যভেদ করার এক কঠিন পূর্ব অনুশীলন। "এরঃ সিম বঙ্গা" – এই পুজোর উদ্দেশ্য প্রকৃতির শক্তিতে বিশ্বাসী সাঁওতালরা শস্যবোনার প্রাক্কালে ধরিত্রীমাতাকে তুষ্ট করার জন্য, যাতে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের অর্জিত ফসল নষ্ট না হয়। এছাড়াও 'জম সিম বঙ্গা', 'সীমাসিম বঙ্গা' প্রভৃতি সাঁওতাল জনজাতির বৈচিত্র্যময় উৎসব-অনুষ্ঠান, বিভিন্ন তত্ত্ব ও মহত্ত্বের সর্ব সংযোগে সমন্বয় সাধিত। সাঁওতাল জনজাতির উৎসব এক পবিত্র সুন্দর, সর্বজন-স্বীকৃত প্রকৃতির সৃষ্টিকে মানব-জীবনের মধ্যে মেলে ধরে জীবনের সার্থকতার শিখরে অগ্রসর হওয়ার এক সুগম পথ সৃষ্টি করে দেয়। সাঁওতাল জনজাতির এক পুরাণগানে –

"দেশচং আচুরেন
যা গোঁসাই তুদে দয় রাগে কান
দিশম চং বিহুরেণ
যা গোঁসাই গুতুরুৎ দয় সাঁহেদা।"

অর্থাৎ ধরিত্রী নিজ অক্ষে ঘূর্ণায়মান। হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তুঁতপাখি তাই গান গাইছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানান দিচ্ছে যে – "দিশম চং বিহুরেণ' অর্থাৎ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবী অর্থাৎ সৌরজগতের নিয়মেই যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে সেই বার্তাই বহন করছে উদ্ধৃত ঐতিহ্যবাহী উক্ত ধর্মীয় সঙ্গীতটি।

প্রাচীনকালে সাঁওতাল জনজাতির ভাবনা যে বিজ্ঞান ভিত্তিক এমনকি তাদের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় পূজানুষ্ঠানে ('বাহা, সহরায়, মাঃ মড়ে') প্রভৃতিতে চালের গুঁড়ির যে 'খন্ড' বা মণ্ডলী দেওয়া হয় যা তাদের পৃথিবী ঘূর্ণন তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানকে তুলে ধরে। আধুনিক বিজ্ঞানের আগমনের বহুপূর্বেই এই পৃথিবী ঘূর্ণনের ধারণা ছিল। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই বিভিন্ন ধারণা, আশ্চর্য সব জীবনদায়ী ঔষধ, শিল্পচিত্র, নান্দনিকতাবোধ, পরিবেশপ্রিয়তা, এই সহজাত গুণগুলি রয়েছে তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে।

মানুষ বেঁচে থাকে তার ভাষার মধ্যে। সাহিত্যের মধ্যে, মাতৃদুগ্ধের মতোই তার মাতৃভাষা। বলা বাহুল্য সাঁওতালি ভাষা হল সাঁওতাল সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। সাঁওতালি সংস্কৃতি শুধু সাঁওতালি ভাষাকে সমৃদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ করেনি একই সঙ্গে সংস্কৃত, বাংলা সহ প্রতিবেশী বহু ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। সেইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে অন্যভাষার দ্বারাও সাঁওতাল ভাষা প্রভাবিত হয়েছে। আচার্য সুকুমার সেন এর কথায় – " পণ্ডিতেরা মনে করেন সাঁওতালি ভাষা বাংলা ব্যাকরণে প্রভাব বিস্তার করেছে।" আমরা জানি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হল 'চর্যাপদ'। এই চর্যাপদেও বহু সাঁওতালি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

"খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি"

এখানে 'খুন্টি', 'উপাড়ী' সাঁওতালি শব্দের ব্যবহার চর্যাপদে রয়েছে। সাঁওতাল ভাষার বহু শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে এসেছে। যেমন –

সাঁওতালি শব্দ	**সংস্কৃত শব্দ**
গতম (ঘি)	ঘৃতম্
চাতম (ছাতা)	ছত্রম্
মাতকম (মহুয়া)	মধুকম্

ভাষাতাত্ত্বিকদের বিচারে সাঁওতালি ভাষা অস্ট্রিক ভাষাবংশের কোল বা মুণ্ডারি শাখার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে গিয়ারসন সাহেব তাঁর "Linguistic Survey of India" নামক গ্রন্থে বলেছেন – "মুণ্ডাভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালি ভাষা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।"

সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হলো তার ধর্ম। ধর্ম যেমন তার সমাজের চালকশক্তি, তেমনি ধর্মকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়ে উঠেছে তার সংস্কৃতির এক বিশাল ধারা। সেই লৌকিক ও পৌরাণিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে রচিত। লৌকিক ও

পৌরাণিক দেব-দেবী যুগ যুগ ধরে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। হাজার হাজার বছর ধরে তারা সাঁওতালদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। তাদের বাদ দিয়ে সাঁওতালদের জীবন অকল্পনীয়। মারাংবুরু, জাহের এরা, মড়েকো-তুরইকো; আদি পিতা-মাতা পিলচুঁহাড়াম – পিলচি বুড়হি এদের নিয়ে রচিত হয়েছে লোকসাহিত্যের বিশাল ধারা। তাদের জীবন সংগ্রামে শক্তি জোগায় – বাবা ঈশ্বর।

"জঁহর জঁহর বাবা ঈশ্বর
গড আমিঞ বাবা"

সাঁওতাল পুরাণ কথা অনুযায়ী বাবা ঈশ্বরকে আরাধনা করতো। তাদের প্রকৃতির সঙ্গে অশেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যতটুকু জয়ী হয়েছে তার সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে নিদর্শন মিলে। তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে "বাহা, সহরায়, দাঁশায়, কারাম, মাঃ মড়ে, সাকরাত" এছাড়াও পাটাবিধৌ, শিলদৌপরব, ভীমপুরছাতা, বরোপাতা, সাঁওতাল সমাজে ধর্মীয় সংস্কৃতি বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাঁওতাল সংস্কৃতির অম্লান স্বাক্ষর রয়েছে তার গৃহনির্মাণ পদ্ধতিতে। ভাস্কর্য শিল্পের মতো মাটির দেওয়াল দিয়ে খড়ের ছাউনি দেওয়া গৃহ নির্মাণের নৈপুণ্য আর কারও নেই। সাঁওতাল পল্লীরমণীদের অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত হলেও মেয়েদের আঁকা আলপনা, দেওয়ালগাত্রে গেরুয়া মাটি দিয়ে অলংকরণ আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া শালপাতার থালা ও মলা তৈরি। গৃহস্থালির নিত্যব্যবহার্য জিনিস খেজুরপাতা বা তালপাতার চাটাই, মাদুর, আসন তৈরিতেও সাঁওতালি সংস্কৃতির রয়েছে স্মরণীয় স্বাক্ষর। এছাড়াও ধমসা-মাদল, বাঁশি, বানাম সহযোগে প্রদর্শিত যৌথ নৃত্যেও সাঁওতাল সংস্কৃতির অসাধারণ ঝলক পরিলক্ষিত হয়।

সাঁওতাল জনজাতির বিবাহ রীতিতেও রয়েছে স্বকীয়তা, স্বতন্ত্রতা। তাদের বিবাহরীতির সাতটি প্রথা বা পদ্ধতি আদিকাল থেকে প্রচলিত। এরা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের দেবতায় বিশ্বাসী। 'আপাৎ' অর্থাৎ পিতারূপে আলোর দেবতা – 'সিঞবঙ্গা' (সূর্য) 'ধারতি আয়ু' অর্থে ধরিত্রী মাতা 'ঞিদৌবঙ্গা' (চাঁদ) আঁধারের দেবতা অর্থাৎ সাঁওতাল জনজাতি ও প্রকৃতির শক্তি বা ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসী।

সাঁওতালদের পুরাণ অনুসারে ঠাকুর এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তারপর উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এই সমস্ত সৃষ্টিই হচ্ছে হাঁস-হাঁসলি (হংস-হংসী) থেকে জাত মানব-সন্তান পিলচু হাড়াম ও পিলচু বড়হি। বর্তমান আদিবাসী সাঁওতাল তাদেরই বংশধর বলে মনে করে। সাঁওতালদের 'হিহিড়ি পিপিড়ি'তে সাতটি ও সাসাংবেডাতে পাঁচটি পদবি সৃষ্টি হয়েছিল। সাঁওতালদের পুরাণ কাহিনিতে লিটৌ গোঁসাই প্রথম সৃষ্টি দম্পতিকে 'হাঁড়িয়া' নামক মাদক পান করার ব্যবস্থা করে মানুষের বংশবৃদ্ধি করিয়েছিলেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ১২টি পদবির প্রত্যেকটি

আবার বারোটি গোত্রে বিভক্ত।

সাঁওতাল সংস্কৃতি মূলত প্রাচীন তথা আদিবাসী সংস্কৃতি। যা আর্যেতর সর্বভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে সাঁওতাল সংস্কৃতির জন্ম। কালের প্রবাহে বিবর্তনের ধারায় সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতির উপর হিন্দু যুগ, বৌদ্ধ যুগ, মুসলিম যুগ ও মিশনারী যুগের প্রবল ঝড় বয়ে যাওয়ার ফলে সাঁওতাল সংস্কৃতির উপর নির্মম আঘাত ঘনিয়ে আসে। পল্লীকেন্দ্রিক সাঁওতাল সংস্কৃতি হয়ে ওঠে নগরমুখি। এই বিশ্বায়নের যুগে সাঁওতাল সংস্কৃতি এসে দাঁড়িয়েছে চরম সংকটের মুখে। উৎকট যান্ত্রিকতার বিষ নিঃশ্বাসে এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অগ্নিশিখায় সাঁওতাল সংস্কৃতি ধ্বংসের পথে চলেছে। প্রাচীন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতিনীতি, তাছাড়া 'জাহের থান', 'মাঝি থান', 'বারনি ঘাট' প্রভৃতি স্থান যা সাঁওতালদের নিজসত্তাকে প্রকাশ করে সেগুলোর উপরেও নগরায়ন ও বিশ্বায়নের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত। তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অন্যজাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাবে সাঁওতাল সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ধামসা মাদল ও বাঁশির তালে প্রদর্শিত মনমাতানো শালীনতায় সমৃদ্ধ যৌথ নৃত্যগীত আজকের যুগে টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সাঁওতাল জাতির এরকম এক গভীর সংকটাপন্ন অবস্থায় পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্ম বলেছিলেন –

"অল মেনাঃ তামা, রড় মেনাঃ তামা
ধরম মেনাঃ তামা, আম্‌হমেনাম
অলেম আৎলেরে, রড়েম আৎলেরে
আমহম আদঃ।"

অর্থাৎ বিপন্ন সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অতিকষ্টে ঘোষণা করেছেন –

"আছে তোমার বর্ণমালা, আছে তোমার ভাষা
আছে তোমার ধর্ম, জীবনেরই আশা
হারিয়ে গেলে ভাষা তোমার, হারিয়ে গেলে ধর্ম
নিজেই তুমি হারিয়ে যাবে, হারিয়ে গেলে ধর্ম।"

সে কালের সাঁওতালরা একই পরিবারভুক্ত ছিল। সাঁওতালরা যেন 'এক জাতি এক প্রাণ' মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল যার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় তাদের দ্বারা সংঘটিত 'হুল' বা বিদ্রোহের মাধ্যমে। কিন্তু আজকের সাঁওতাল সমাজে সেই জাতি-ধর্ম প্রেম, জাতীয়তাবোধ অনেকখানি ফিকে হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও অনৈক্য আজ প্রকট। ভৌগোলিক ও ধর্মী বিভেদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক বিভেদ। ধনী সাঁওতাল ও গরিব সাঁওতাল-এর মধ্যে ব্যবধান। বর্তমানে আর একটি ব্যবধান লক্ষ করা গেছে তা হল সাঁওতালদের মধ্যে এগিয়ে থাকা মানুষজন অনেকক্ষেত্রে নিজেদের দায়দায়িত্ব বা সামাজিক কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকছে।

ভারতবর্ষে ভূমিপুত্র আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতি, স্বতন্ত্রভাবে নিজের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম নিয়ে বেঁচে আছে। তারা চেষ্টা করে চলেছে কীভাবে জীবনযাত্রা আরও সুলভ হয়, প্রাণধারণ সহজ হয়। এই নিয়ে তার বিপুল প্রয়াস। এই সংগ্রামে সে যতটুকু জয়লাভ করেছে, জীবিকার প্রয়োজনে ও জীবনের তাগিদ যতটুকু মিটাতে পেরেছে তার সভ্যতা সংস্কৃতিতে ততটুকুরই নিদর্শন মিলে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতির মানস সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান পরিচয় তাদের ভাষা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করার রীতি, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন, দেবদেবী ও অন্যান্য প্রতীক এমনকি তাদের সঙ্গীত। তাদের দৈনন্দিন জীবনও একইসঙ্গে মধুর ও দায়িত্বপূর্ণ। তাদের সংস্কার, পূজা-আচার, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির উপর উত্তরকালে জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আর্যধর্মের নানাপ্রকার তান্ত্রিক আচার পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রভাব পড়ে লৌকিক জীবনে ধর্ম বিশ্বাস ও কর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি বিবর্তিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সাঁওতাল জনজাতির অনুশাসন, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি অনন্যতার দাবি রাখে। হাজার হাজার বছর পুরাতন ঐতিহ্যবাহী সাঁওতাল সংস্কৃতি আর্যতর সভ্যতা সংস্কৃতির অনবদ্য নিদর্শন যা সমগ্রবিশ্বের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সাঁওতাল সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্যকে আরও প্রসারিত করলে আগামী দিনে দেশ বিদেশের মানুষ ছুটে আসবে সাঁওতাল পল্লীগুলিতে আদি সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন দেখার জন্য।

তথ্যসূত্র : -

১. ‘কুদুম’ – সাঁওতালী হেঁয়ালী।
২. ‘ভাষাতত্ত্ব’ - ড. সুকুমার সেন।.
৩. ‘খেরওয়াল বংশ ধরম পুঁথি – রামদাস টুডু।
৪. বৃহৎবঙ্গ – দীনেশচন্দ্র সেন।
৫. তীরন্দাজ – ১০ সংখ্যা – ২০১৪।
৬. ‘বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন’ – ড. অতুল সুর।

....

প্রজন্ম ব্যবধান ও বাংলা উপন্যাস : প্রেক্ষিত সুন্দরবন

ড. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম

'Every Second a new generation is born which is much faster, elegent, curious, and creative than the past.'[১]

অতিসম্প্রতি (২০১৫) প্রকাশিত, 'Generation Gap' উপন্যাসে তৌহিদ লস্করের[২] (১৬) এ এক আবেগকথন, বা অতিকথন নয়; নির্ভেজাল সত্যকথন। নতুন প্রজন্ম অনেকবেশি গতিশীল, ধীশক্তিসম্পন্ন তো বটেই, তাদের চিন্তা-চেতনা-মনন-অভিলাষ-দর্শন পূর্ববর্তীদের থেকে প্রতিমুহূর্তে পাল্টে যায়। তাই 'নবীন' ও 'প্রবীণ'-এর এক মেরুকরণ সমাজের অন্তঃকরণে রয়ে যায় অগোচরে। ফলশ্রুতিতে আদর্শগত, জীবনদর্শনগত, ও ধারণাগত এক সংঘাতের জন্ম হয়। সে সংঘাত শুধু ব্যক্তি মননের ক্ষেত্রে নয়; সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বটে। প্রজন্মগত ব্যবধানের সাথে সাথে জীবনের স্বরমাত্রার পরিবর্তন তাই অবশ্যম্ভাবী।

উপন্যাসকার সেই জীবনের বহুরৈখিক রূপেরই প্রকাশক। সেই রূপে যেমন দেখা যায় ইতিহাসের মানুষ, অন-ইতিহাসের নগ্নসমাজপট, লোকমানসবৃত্তের ভগ্নদশার আলো-আঁধারী – দৃশ্য তেমনি ভেসে ওঠে প্রজন্মগত সামাজিক ব্যবধানের প্রতিবিম্বনও। শুধু আখ্যানগত দিক নয়, জীবনদর্শন-জীবনবীক্ষণ-জীবনচয়ন – এই ত্রিবিধ বৃত্তেই এক বৃহৎ ব্যবধানের ঢেউ আছড়ে পড়ে সাহিত্যের আদার কারবারীদের তটভূমে। উপন্যাসকাররা সময়ের স্রোতে নিক্ষেপিত ব্যক্তিক অসহায়তাকে নতুন করে বয়ন করতে ভাবনার জগতে শান দেয়, আর পোড়খাওয়া মানুষ, অখ্যাত কাহিনি, অজ্ঞাত ভাবনারা নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়। জীবনের বেদগাথা পাল্টে যায় – প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে – নতুন আঙ্গিক, নতুন ভাষ্য, নতুন বয়ন ও নতুন চেতনায়।

১. বাংলা উপন্যাসের ধারাপাত :

ঔপন্যাসিকের মৌলপ্রয়াস মানুষের ব্যক্তিত্বের রহস্যমোচন ও তার প্রকাশসাধন।[৩] ব্যক্তিত্বের রহস্যমোচন ও প্রকাশসাধনে কাল (Age) ও সময় (Time) একটা বড় ফ্যাক্টর। সময়ের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত মানুষের সংশয়, নৈরাশ্য, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আত্মপ্রতারণা, পরস্পর বিরোধিতা, এস্টাব্লিশমেন্টের প্রতি আনুগত্য, ভীরু

আপোস, কর্তাভজা মনোভাব, নতুন পৃথিবী অন্বেষণের তীব্র আকুলতা[৪] – যা আধুনিক মানুষকে ক্রমশ চঞ্চল ও অস্থির করে তোলে – তারই প্রকাশসাধনে উপন্যাসকার অগ্রাধিকার দেবেন। আর তাই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মুখে সময়ের দাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> 'সময়ের দায় ঔপন্যাসিককে মানতে হয়। সময়ের পাককে ঔপন্যাসিক এড়াতে চান। কারণ তিনি পৌঁছতে চান ব্যক্তিমানুষের কাছে। সেই ব্যক্তি মানুষ সময়ে অন্বিত, হয়তবা সময়ের পাকচক্রে বাঁধা। তার কাছে পৌঁছাতে ঔপন্যাসিককে হাজার পথ খুঁজতে হয়।'[৫]

বাস্তব সচেতনতা ও যুক্তিবাদের যুগল সমীকরণেই যে নতুন জীবনবীক্ষার পথ – সেই পথেই চলে উপন্যাস। আর ঔপন্যাসিক সেই পথের পথিকের 'রহস্যময় হৃদয়রাজ্য ও জটিল মানবচিত্ত'[৬] বিশ্লেষণ করেন বহুরৈখিক স্বরে। জায়া-জননী-ভগিনী, প্রেমিক-প্রেমিকা, প্রভু-ভৃত্য, কৃষক-ভূস্বামী, বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েত – ইত্যাকার অভিধায় বিধেয় সম্পর্কগুলো উপন্যাসের কায়া গঠনে সহায়ক হয়। সেই কথার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঔপন্যাসিক তার জীবনদর্শনকেই ব্যঞ্জিত করেন। ঔপন্যাসিক তা সৃজন করেন জীবনের আঁকাড়া তথ্যগুলি[৭] থেকে। জীবন তো ক্রমবর্ধমান, পরিবর্তনসাপেক্ষ। তাই রহস্য উদ্‌ঘাটনে উপন্যাসকারকে খোলস পাল্টাতে হয়। বদলাতে হয় পুরানো খাপ, আমদানি করতে হয় নতুন ঢাক। কাঠি বাজাতে হয় বহুধা স্বরে। আর তাই পালটে যায় গল্প বলার ধরন, গল্প কথার চলন, গল্পগাথার বুনন। কেননা, 'Illusion of Reality'-র[৮] পরিস্ফূটন শিল্পীকে করতে হয় নির্মোহ দৃষ্টিতেই। সেটা করতে গিয়ে প্রাত্যহিক বাস্তবতা ও সাপ্তাহিক ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে[৯] অতিক্রম করলেও তাতে শিল্পের অঙ্গহানি হয় না।

উপন্যাসের ধারাপাতের বদলবৃত্তান্তের সূচনা তিরিশের দশকে – 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি'র (১৯২৭) যুগে। লেখকরা তাদের সাহিত্য সরস্বতীর পাতায় অবলীলায় স্থান দিলেন জীবনের অপাংক্তেয়, অচ্ছুৎ বিষয়কে। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সবে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।'[১০] বিষয়-ভাষ্য-আঙ্গিক-বয়ান-জীবন সর্বমুখী এক স্বতন্ত্রতা বাংলা সাহিত্যে এনে হাজির করলেন কল্লোল যুগের শিল্পীরা। জীবনের নগ্নতা, মেকি সভ্যতার আস্ফালন, জীবনবাদের প্রগাঢ়তা – ইত্যাকার বিষয়ে বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কল্লোলের। আসলে 'কল্লোলের সেই যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো। শুধু সূত্রপাতের সাহস নয়, সম্পূরণের সাহস।'[১১] ফ্রয়েড, ইয়ুং, লরেন্স, হাক্সলী, রুশ ও স্ক্যান্ডেনিভিয়ান রচনার পাশাপাশি মোঁপাশা,

ফ্লবেয়ার, জোলার রচনার প্রভাব ঘুরে ফিরে এসেছিল এঁদের রচনায়। একদিকে নিম্নবর্গীয় বাস্তবজীবন, অন্যদিকে সামাজিক বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সোচ্চার উচ্চারণ – এই দ্বিবিধ দিকেই তাদের কলম শানিয়ে উঠেছিল। গোকুলচন্দ্র নাগ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা অন্ত্যজ শ্রেণির (subaltern) মর্মযন্ত্রণাকে ঠাঁই দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জগতে নতুন বাতায়ন খুলে দিলেন। এককথায়, তারা জীবনের 'অপর পৃষ্ঠা'[১২]কে শিল্পসুষমামণ্ডিত করলেন। আর তাতেই রচিত হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির নিম্নবর্গীয় মানুষদের 'দুঃখ-দারিদ্র্য-বিকৃতি-ব্যভিচার-জড়ত্ব ও কুসংস্কার এবং বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার মর্মান্তিক ইতিহাস।'[১৩] স্বাধীনোত্তর সুন্দরবনকেন্দ্রিক প্রান্তিক জীবনের রূপকারদের লেখনী সেই ধারাপথেই উত্তোরিত হলেও তাদের মেরজাইটা একটু অন্যরকম। সেদিকেই দৃষ্টি ফেরাতে হয়।

২. সুন্দরবন উপজীব্য উপন্যাস – প্রজন্ম বিভাজন : ভাবগত – ধারণাগত ও দর্শনগত দিকে দিয়ে

সুন্দরবন একটি 'Transition Area' বা সন্ধি অঞ্চল।[১৪] সন্ধি অঞ্চল এই কারণে যে, এখানে চতুর্বিধ জনগোষ্ঠীর চতুর্বেণী সংগম ঘটেছে। স্মরণে রাখি, সুন্দরবনে জনপত্তনের সূচনা ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌলার পতনের পর। ঐ বছরই ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মিরজাফরের কাছে থেকে সুন্দরবনের কুলপি পর্যন্ত জমিদারি স্বত্ব লাভ করে। অতঃপর শুরু হয় জঙ্গল চিরে আবাদ পত্তনের কর্মযজ্ঞ। এই কর্মযজ্ঞে একে একে সামিল হল – ১. বিহার, ঝাড়খণ্ড, মানভূম, সিংভূম থেকে আগত আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়, ২. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ মেদিনীপুর থেকে আগত জনগোষ্ঠী; ৩. স্বাধীনোত্তর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু সম্প্রদায় এবং ৪. এতদঞ্চলে বসবাসকারী প্রান্তিক পৌণ্ড্র ও মুসলমান জনগোষ্ঠী। এই চারটি গোষ্ঠীর আগমন-নিস্ক্রমণ-বিরোধ-বিনিময়-বিসংবাদে এখানে মিশ্র সংস্কৃতি (Mixed culture) গড়ে উঠেছে। বনজ বাতারণ-ভূমিজ বাতারণ ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ-ই সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাসকারদের মৌল উপজীব্য। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত একশ্রেণির ঔপন্যাসিক সুন্দরবনের এই লোকায়ত সংক্ষুব্ধ জীবনকেই উপন্যাসে অঙ্গীভূত করেছেন। মনোজ বসু, শিবশঙ্কর মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজকের তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দাস, সমীর রক্ষিত, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র, অমিতাভ ঘোষ প্রমুখ কথাশিল্পীরা তাদের লেখনীকে নতুন পথে চালিত করেছেন। এদের লেখনী কেন্দ্রাভীগ আকর্ষণ ছাড়িয়ে ক্রমশঃ কেন্দ্রাতীগ তথা নগর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে প্রান্তিক মানুষের অলিন্দে – লোকায়ত সংস্কৃতির অন্দরে ধাবিত হয়েছে। সাহিত্যের এ এক 'উজান যাত্রা',[১৫] ই বটে। বনবিবি, শাহজঙ্গলী, নারায়ণী,

দক্ষিণরায়, কালু রায়ের রাজত্বে বসবাসকারী প্রান্তিক জীবনের ওঠা-পড়া, রূপ-রঙ, বিশ্বাস-আচার-সংস্কার তথা দৈবনির্ভর এক ব্যতিক্রমী জীবনকথা প্রতিভাত হয়েছে, হচ্ছেও।

ভাবগত-ধারণাগত ও জীবনদর্শনগত দিক দিয়ে আমরা সুন্দরবন উপজীব্য উপন্যাসগুলিকে দুটি পর্বে বিন্যস্ত করব। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে আটের দশক পর্যন্ত সুন্দরবনের প্রথম প্রজন্ম এবং আটের দশকের পর থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সুন্দরবনের দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসাবে বিশ্লেষিত করব। এর মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসবে প্রজন্ম ব্যবধানের নিরিখ – তথা

১. পত্তন পর্বের সুন্দরবন
২. পরিবর্তিত আধুনিক সুন্দরবন।

দুই প্রজন্ম

পত্তন পর্বের সুন্দরবন	পরিবর্তিত আধুনিক সুন্দরবন
(স্বাধীনতার পর থেকে আটের দশক)	(আটের দশকের পর থেকে বর্তমান কাল)
মনোজ বসু, শিবশঙ্কর মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।	সমীর রক্ষিত, অমর মিত্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ ঘোষ প্রমুখ।

সুন্দরবনের দুই পর্বের প্রজন্মগত ব্যবধানের নিরিখটি এভাবেই স্পষ্ট হবে –

প্রথম প্রজন্ম :
১. দৈবনির্ভর জীবনালেখ্য ও বাংলা উপন্যাস।
২. ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন্দল – ভেড়ি সংঘাত; সুন্দরবনের স্বভাবসিদ্ধ বাস্তবতা
৩. ইউটোপিয় সমাজদর্শন ও বাংলা উপন্যাস : পত্তনপর্বের সুন্দরবনের সমবায়িক জীবনচেতনা
৪. সুন্দরবনের 'Core Zone'-র ভয়াল বাস্তবতা।

দ্বিতীয় প্রজন্ম :
১. দৈবনির্ভরতার আড়ালে আধুনিক জীবনচেতনা।
২. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংঘাতের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যকামিতা ও প্রশাসনিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই : আধুনিক সুন্দরবনের বাস্তবাখ্যান।
৩. ইউটোপিয় ও সমবায়িক আদর্শের উত্তরণ : সাংস্কৃতিক চলমানতার শৈল্পিক রূপায়ণ – আধুনিক সুন্দরবনের প্রতিভাস।
৪. ম্যাজিক রিয়ালিজম ও পোস্টমডার্ন উপন্যাস : আধুনিক সুন্দরবনের অচেনা ইমেজ।

৩. প্রথম প্রজন্ম : পত্তনপর্বের সুন্দরবন ও বাংলা উপন্যাস ।।

৩.১. দৈবনির্ভর জীবনালেখ্য ও বাংলা উপন্যাস :

সুন্দরবনের মানুষের সকাল শুরু হয় বনবিবির বন্দনায়, রাত নেমে আসে অদৃশ্য জাঙ্গলিক দেবদেবীর সান্ধ্যসংগীতে। দৈবনির্ভর এই জীবন পত্তন পর্বের সুন্দরবনের এক অতিবাস্তব ঘটনা। জঙ্গলের হিংস্র পশু – বাঘ-কুমির-সাপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাদের প্রধান আয়ুধ ছিল বনবিবি-নারায়ণী-দক্ষিণরায়-কালুরায়-আটেশ্বরের সন্তুষ্টিবিধান। তাই সুন্দরবন উপজীব্য রচনায় অবলীলায় স্থান পেয়ে যায় দেবতাদের অলৌকিক মাহাত্ম্য কথা ও দৈবনির্ভর জীবনকথা।

স্বাধীনোত্তর বাংলা উপন্যাসে মনোজ বসুই সর্বপ্রথম সুন্দরবনের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক জীবনকে স্পষ্ট করলেন। তাঁর জীবনাভিজ্ঞতালব্ধ জীবনবীক্ষা ও মাটি মানুষের অকৃত্রিম মমতার উৎসার 'জলজঙ্গল' (১৯৫১) উপন্যাস। লেখকের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি : 'গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয় ... ... কাঠ কাটতে মধু ভাঙতে জীবিকার শতবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায়, বাঘ-কুমির-সাপের কবলে পড়ে তার মধ্যে কতজনে আর ফেরে না। জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, বনবিবি ও বাঘের রাজ্যে সওয়ার গাজি কালুর রাজ্য রহস্যময় সুন্দরবন ছোটবেলা থেকে আমায় আকর্ষণ করত।'[১৬] সেই রহস্যময় জীবনের সরস রূপায়ণ 'জলজঙ্গল', যা দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলমাতা বনবিবির মাহাত্ম্য কথার ভিতে।

তাই উপন্যাসের সূচনাটা হয়ে যায় বনবিবির অপার কৃপা বর্ষণের মধ্য দিয়ে। হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ সুন্দরবনের জঙ্গলজীবী মানুষের দৈবনির্ভরতা তথা বনবিবির কাছে শত্রু-দুশমন দমনোদ্দেশ্যে ভক্তের আকুতিই লেখক প্রারম্ভেই তুলে ধরেন :

'মাগো মা তোর বালক আইল বনে
শত্তুর দুশমন দমন করে রাখিস ছি-চরণে।'

উপন্যাসে মধুসূদন রায় আবাদকৃত 'মৌভোগ'এর বনবিবিতলা – বকুলতলা একটি জাগ্রত স্থান। এই বনবিবির থানের মাহাত্ম্যকথা ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেন ধনা-মনা-দুখে (বনবিবির জহুরনামা) উপকথার আদলে। এইখানেই বনবিবির জাগ্রত দর্শন। এবং এই দর্শনকে বাণীবদ্ধ করার প্রাক্কালে ঔপন্যাসিক অবিশ্বাসী পাঠককেও সচকিত করান : 'অবিশ্বাসী যদি থাকো, পুঁথি বন্ধ করো এখানেই।' পাঠককেও এভাবে মনোজ বসু তার বিশ্বাসের অংশীদারও করিয়েছেন।

মৌলে দল ফেলনাকে ভয়ঙ্কর জঙ্গলে দক্ষিণরায়ের মুখে ফেলে দিয়ে আসলেও সে বেঁচে যায়। কেননা সে 'মাগো মা' বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল এই বকুলতলায়। আর 'মা, ডাকে সুপ্রসন্ন বনবিবি তার ভক্তদের তো রক্ষা করবেই। সোনার মুকুট পরিহিতা এক পরমা সুন্দরী নারী তাকে কোলে তুলে নেয়। কুমিরের পিঠে সওয়ার হয়ে ফেলনা বাড়ি ফেরে বনবিবির কৃপায়।

স্পষ্টতই মনোজ দুখের জীবন কাহিনির আড়ালে ফেলনার মর্মন্তুদ ও রোমহর্ষক কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সুন্দরবনের সংগ্রাম বিধ্বস্ত মানুষরাইতো এক একজন দুখে। ফেলনা তাদেরই একজন। তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য মা বনবিবি করুণার পসরা সাজিয়ে রেখেছেন। লেখক নির্মোহ দৃষ্টিতেই বনবিবির অনাড়ম্বর পূজা পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন :

> "করুণাময়ী বনবিবি। বাদাবন তার রাজ্য। হিংস্র বাঘ কুমীর ও দাঁতাল তার কাছে পোষা মেয়ের মতোন। ... দেড় হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া একটা জায়গা মেপে নাও, হাতখানেক উঁচু গোলপাতার একটু ছাউনি করো, ঘরের সামনে উঁচু হয়ে বসে 'মা মা' বলে ডাকো বারকয়েক। ব্যাস, হয়ে গেল মায়ের মন্দির। ফুল যদি নাও জোটাতে পারো, গরাণ পাতায় পুজো করো। মা জননী তাতেই তুষ্ট।"[১৭]

বনবিবির সন্তুষ্টিবিধানে সুন্দরবনের শতশত দুখেদের এই পন্থা করায়ত্ত বলেই হাজার কষ্টেও দুখেদের মৃত্যু হয় না সুন্দরবনে। 'জলজঙ্গল' উপন্যাসের ভিত এভাবে দেবী মহিমার বাতাবরণেই তৈরি করেছেন ঔপন্যাসিক।

শুধু বনবিবিই নয়, - গাজি, কালু, ছায়াল পীর, রণগাজিদেরও পূজা দিতে হয় জঙ্গলে। কেননা তারাও রক্ষাকালীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাঘ তাদের হুকুমের গোলাম, বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে তারা বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। তাই সন্তুষ্টিবিধানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পূজা প্রদান করে। 'বন কেটে বসত' (১৯৬১) উপন্যাসে তাই নতুন করে এসে যায় এই পূজা ব্যবস্থাপনা। পরপর দুটো ঘর, ঘরের চারকোণে লাল নিশান। প্রতিঘরের দুটি ভাগ। প্রথম ঘরে আসন কালুগাজির। দ্বিতীয় ঘরে – ছাওয়াল পীর, রণগাজি। মনোজ বসু এদের সহজ সরল পূজা পদ্ধতির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

> 'ফুল জোটাতে পারো ভালো – নইলে বনবিবির বেলা যেমন হল পাতা, লতা ছিঁড়ে পুজো। মানষেলার দেবতা গোঁসাইদের মতন এদের বায়নাক্কা নেই। পুজো সেরে নির্ভাবনায় চরে বেড়াও জঙ্গলে। গাছ কাটো, মৌচাক ভাঙো, আবাদ কর, ঘর বাঁধো।'[১৮]

দৈবনির্ভরতার এই প্রসঙ্গ মনোজ বসুর লোকশ্রুত নয়, একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি বাস্তব – সুন্দরবনবাসী জেলে-মৌলে-বাউলেদের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ঔপন্যাসিকের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্ণনা প্রখর বাস্তবসচেতনার পরিচায়ক।

সুন্দরবনের বাস্তবতার দিশারি শিবশঙ্কর মিত্রের 'বনবিবি' (১৯৬৬) উপন্যাসের চালিকা শক্তি বনবিবি স্বয়ং। উপন্যাসের দুই মৌল চরিত্র কলিম ও লায়লার জীবন পরিচালিত হয়েছে বনবিবির অদৃশ্য হাতের ইশারায়। সুন্দরবনের হিংস্র নরখাদকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর কলিমের হৃদয়ে দৈবীমহিমা

সঞ্চারিত হয়েছে। এক অলৌকিক শক্তিই তার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে। এবং এই ঘটনাই তাকে বাওয়ালির জীবন চয়ন করতে প্রণোদিত করেছে। জলজ্যান্ত বাঘের মুখ থেকে ফিরে আসা বনবিবির করুণা ছাড়া কখনই সম্ভব নয়। - এ বিশ্বাস আপামর সুন্দরবনবাসীর। কলিমেরও :

> 'দৃঢ় প্রত্যয় এলো ... ... বনবিবির অদৃশ্য স্নেহেই তার জীবন সেদিন ফিরে পেয়েছে, নইলে বাঘের কোল থেকে কে কবে ফিরতে পারে। মনে হলো, বনবিবির উপাসক বাওয়ালির জীবনই তার জন্য নির্দিষ্ট।'[১৯]

তাই 'বাউলে হতে এলি কেন?' – এ প্রশ্নের সাপেক্ষে কলিমের চটজলদি জবাব :- 'বনবিবির দয়ায়'। শিবশঙ্কর মিত্র কলিমকে, এককথায় সুন্দরবনের দৈব নির্ভর জীবনের প্রতিভূ হিসাবে চিত্রিত করেছেন।

কলিমের গুরু আকরাম বাওয়ালি নামজাদা গুণিন। সুন্দরবনের ১৭৪নং জঙ্গলে বাঘের খপ্পর থেকে শিষ্য কলিম মন্ত্রবলে ও বাওয়ালির নৈপুণ্যে সবাইকে রক্ষা করে। বন থেকে বেরুনোর সময় বাদাবনের কর্দমাক্ত মাটি নিজের কপালে ও কলিমের কপালে লেপটে দেয় আক্রাম বাওয়ালি :

> 'কি ভাবলি, কার কথা ভাবলি?
> - কেন বনের কথা ... ... বনবিবির কথা।
> - না, শুধু তা নয়, বনবিবির বাহনের নামেও মাথা নোওয়া।'[২০]

স্মরণীয় বনবিবির বাহন বাঘ। তাই বাঘের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে তাকেও সেলাম জানাতে কুণ্ঠাবোধ করে না সুন্দরবনের বাউলেরা।

উপন্যাসের নায়িকা লায়লা – 'বাদার গিন্নি'। মঠবাড়ি চকের 'দাইডাক্তার'ও বটে। সেই কাজে বনবিবি তার চালিকা শক্তি। কেননা লায়লার বিশ্বাস : 'বাদাবনে বনবিবির দয়া না পেলে কোনোও কাজ হাসিল হয়, না হওয়া সম্ভব।' সুন্দরবনের আবাদক্ষেত্রের প্রত্যেকটি কাজে বনবিবি শেষ ভরসা – তা সে আঁতুড় ঘরে সন্তান প্রসব হোক আর জঙ্গলের হিংস্র জন্তু জানোয়ার বশ করা হোক। তেমনি বনবিবির মদতপুষ্ট 'বাওয়ালি' রা হয়ে ওঠে এক একটা চকের রক্ষা কর্তা। আপদ-বিপদ-ভরসা-নির্ভরতার অন্যতম স্থল সুন্দরবনের এই বাউলেরা। ঔপন্যাসিক লায়লার চরিত্রে বনকন্যা বনবিবির রূপকেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

পঞ্চাশের দশকের কথাকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায় নাগরিক আবেষ্টনী ছিন্ন করে অনাগরিক ধূসর নিস্তরঙ্গ প্রান্তিক জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার আর বেঁচে থাকার আবহনীতি স্পষ্ট করলেন, 'বনবিবির উপাখ্যান' (১৯৭৮), 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি' (১৯৮১) ,উপন্যাসে। গোসাবার শম্ভুনগরে শিক্ষকতার সূত্রেই তিনি সুন্দরবনের হৃদস্পন্দন অনুভব করেছিলেন। মনোজ বসুর উত্তরসূরি বরেন। মনোজের মতই 'লেখার বিষয় থেকে শুরু করে রীতি প্রকৃতি সবকিছুই পাল্টে ফেলার'[২১] তাগিদেই প্রান্তিক সাহিত্যের মুক্ত বিহঙ্গ মেলে ধরলেন - 'বনবিবির উপাখ্যান'-এ।

সুন্দরবন বনবিবির রাজ্য। উপন্যাসে তাই বনবিবির ছোঁয়া না থাকলে সুন্দরবনের স্পষ্টতা ধরা পড়ে না। লেখকদের রচনায় 'বনবিবি' ও 'সুন্দরবন' সমার্থক হয়ে ওঠে যেন। তাই সুন্দরবনের আখ্যান নামান্তরে হয়ে যায় 'বনবিবির উপাখ্যান'। বসন্ত রোগে আক্রান্ত গৌরী অপদেবীর তকমা পেলে লেখকের ব্যথিত আত্মা গুমরে ওঠে। তাই গৌরীকে লেখক সুকৌশলে বনবিবিতে উন্নীত করান। ঘোষবনের ফাদার গ্যাব্রিয়েলই তাকে সুস্থ করেন। বনবিবি পূজার দিনে দয়ালের তাই মনে হয় গৌরী 'সাক্ষাৎ জগন্ময়ী মা'। পূজা স্থলে বনবিবির নামে জয়ধ্বনি ওঠে। গৌরী যেন সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাতে। বনজ-গ্রামজ-লোকজ-দেবজ জীবনবীক্ষার এক অপূর্ব নির্মাণ 'বনবিবির উপাখ্যান'। বাদাবনের উপাখ্যানের পাশাপাশি এ আখ্যান গৌরীর বনদেবীতে উত্তীর্ণ হওয়ার উপাখ্যানও বটে।

৩.২ ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন্দল – ভেড়ি-সংঘাত : পত্তন পর্বের সুন্দরবনের স্বভাবসিদ্ধ বাস্তবতা

'ভেড়ি' সুন্দরবনের মানুষদের উপার্জনের একটা স্থল। সম্পত্তির উর্ধ্বগামী সূচকেরই একটি। ভেড়ি নিয়ে সংঘাত তাই পত্তন পর্বের সুন্দরবনের একটি জ্বলন্ত বাস্তব সমস্যা। নামান্তরে এ সংঘাত পাড়া অথবা চক দখলের লড়াই। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ বেনামী জায়গা যারা জঙ্গল সাফ করে দখলীসত্ত্ব কায়েম করে – সেই স্থান তাদেরই – সুন্দরবনের এ এক অলিখিত সংবিধান। পত্তন পর্বের সুন্দরবনের এটাই স্বভাবসিদ্ধ বাস্তবতা। উপন্যাসকারদের লেখনীতেও ভিন্নভাবে চিত্রায়িত হয়েছে ভেড়ি দখলের লড়াই। লড়াই এখানে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি, ব্যক্তি বনাম গোষ্ঠী, গোষ্ঠী বনাম গোষ্ঠীর মধ্যে।

'ভেড়ি' সুন্দরবনবাসীদের জীবন-মরণের অংশীদার। শিবশঙ্কর মিত্রের লেখনীতে ভেড়ির মাহাত্ম্য কথা সুন্দরভাবে চিত্রায়িত :

> 'ভেড়িই হল এদেশের প্রাণ। এ দেশের অর্থ ও অনর্থের মূল। তাই ভেড়িকে লক্ষ্য করে এদেশের দলিল দস্তাবেজ, শর্তাবলী নির্দিষ্ট হয়। রাজবন্দী হলে ভেড়ি বাঁধা, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি জমিদার ও জোতদারের দায়িত্বে থাকে, তখন বিঘা প্রতি নিরিখ আড়াই টাকা পর্যন্ত উঠবে। আর যদি প্রজাবন্দী হয়, ছোট ছোট প্রজাদের আপন অংশমাফিক ভেড়ির দায়িত্ব নিতে হয়। বিঘা প্রতি নিরিখ বড় জোড় পাঁচসিকা, না হয় দেড় টাকা।'[২২]

'বনবিবি' উপন্যাসে মঠবাড়ির উত্তরঘেরি বনাম দক্ষিণঘেরির সংঘাত নামান্তরে আনন্দগাজি ও কলিমের সংঘাত – ভেড়ি দখলের লড়াইকে স্পষ্ট করেছে। রাত্রে গোপনে ভেড়ি কেটে নোনাজলের আড়স্রোতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করার অমানবিক পন্থা সুন্দরবনের জোতদার নায়েবদের করায়ত্ত। তাই সংঘাত কখনো কখনো সীমা অতিক্রম করে যায়। 'বনবিবি' উপন্যাসে পত্তন পর্বের এই বাস্তব সমস্যা শিবশঙ্কর মিত্রের দৃষ্টি এড়ায়নি।

মনোজ বসু 'বন কেটে বসত' উপন্যাসে পত্তন পর্বের ঘোষড় জঙ্গল ও নদীতীরবর্তী এক ব্যতিক্রমী ঘরের বর্ণনা দিয়েছেন – 'আলা'। সুন্দরবনের মাছমারারা মেছোঘেরির নিকটবর্তী স্থানে মৎস আদান প্রদানের জন্য একটি আলয় নির্মাণ করে। ঔপন্যাসিক এই 'আলা' নামের দ্বিমুখী ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

এক. 'আলয়' বা গৃহ থেকে 'আলা' নামটি নিষ্পন্ন।

দুই. আলার উঠানে জৌলুষপূর্ণ জোরালো আলো ঝোলানো থাকে, তাই তা আলোর সঙ্গে সম্পর্কিত।

অতি দূর থেকে মাছমারার দল আলোর নিশানা দেখে সোজা চলে আসে আলায়। আলার আলো তাই গহন অন্ধকারে বাদাবনের মাছমারাদের পথ নির্দেশকও বটে। আলার মাচার উপর বসে ম্যানেজার হিসাব নিকাশ করে। প্রয়োজনে তা বিশ্রামাগারও হয়ে ওঠে। তাই 'আলা', 'আলয়'ও বটে। সুন্দরবনের মেছোঘেরির সন্নিকটস্থ অঞ্চলে এই রকম 'আলা' চোখে পড়ে। এই আলায় আলায় সংঘাত সুন্দরবনের স্বভাবসিদ্ধি বাস্তবতাও বটে।

'বন কেটে বসত' উপন্যাসে চৌধুরিগঞ্জের আলার সঙ্গে সাঁইতলার গগনের মেছোঘেরির সংঘাত – সুন্দরবনের এক অতিবাস্তব আখ্যান। চৌধুরিদের মেছোঘেরি থেকে রাধেশ্যামের মাছ চুরি, পরিণামে রাধেশ্যামের জাল আটক ও মারধরের ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে গগনের দলবল, বিশেষত জগা। তারই বদলা নিতে গগনের ছায়াসঙ্গী জগন্নাথ চৌধুরিদের মেছোঘেরির নৌকা চুরি করে। পিছিয়ে থাকে না চৌধুরিদের দলও। তারা গোপনে গগনের মেছোঘেরির বাঁধ কেটে দেয়। এই আলার সংঘাত গগনকে সর্বস্বান্ত করে।

ভেড়ি তথা চর দখলের এই লড়াই সুন্দরবনের আবহমান কালের সমস্যা। দু'দলের চাপান-উতর ও রাজনৈতিক সমীকরণে কখনো কখনো রক্তস্রোত প্লাবিত হয় ভেড়িতে। বিজয়ী দল ভেড়ির কর্তা বনে যায়। বিধ্বস্ত কৃষকদের দাদ-হাজা-চুলকানির সাথে জমি তথা ফসল রক্ষার জন্য লড়াই-সুন্দরবনের কৃষক সংগ্রামেরই বার্তা বহন করে। একদিকে জমি আঁকড়ে পড়ে থাকার লড়াই অন্যদিকে আধিপত্যকামির আগ্রাসন – এই দ্বিবিধ বৃত্তই উপন্যাসকারদের লেখনীতে সাবলীলভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

৩.৩ ইউটোপিয় সমাজ দর্শন ও বাংলা উপন্যাস : পত্তন পর্বের সুন্দরবনের সমবায়িক জীবন চেতনা

'ইউটোপিয়' (Utopia) শব্দটির আভিধানিক অর্থ : 'বাস্তব অথবা কাল্পনিক সর্বদোষমুক্ত কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র, দেশ বা অঞ্চল'।[২৩] গ্রিক দার্শনিক প্লেটোই সর্বপ্রথম কল্পনাভিত্তিক এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। তবে প্লেটো কথিত সেই সমাজ ছিল – কাল্পনিক অভিজাততন্ত্র (Utopian Aristrocracy),

সমাজতন্ত্র নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ ও বৈষম্য থেকে সর্বহারাদের মুক্তির কথা প্রথম উচ্চারিত হয় টমাস ম্যুরের 'Utopia' নামক একটি সামাজিক উপন্যাসে। সেখানে তিনি শ্রেণিহীন শোষণহীন এক দ্বীপের কল্পনা করেছিলেন, যেখানে কায়িক পরিশ্রমই হবে সভ্যতা নির্ণায়ক মাপকাঠি। সর্বদোষমুক্ত এই দ্বীপে অলস মুনাফালোভীদের কোনো স্থান নেই। এখানে নেই বিত্তবান-বিত্তহীন, ধনী-কৃষক-ভূস্বামী-ভূমিহীন বিরোধ। নেই বিরুদ্ধ মেরুর মানুষ। তাই শ্রেণি-সংঘাতও নেই। প্রত্যেকেরই পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে সমাজ এগিয়ে চলবে। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের কল্পবাদী সমাজতান্ত্রিক – স্যা মিমো, চার্লস ফুরিয়ে, রবার্ট ওয়েন, এতিয়েন কাবেত, উইলস্ট্যালনীরা শ্রেণিসংঘাতহীন সমবায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রচলনের সপক্ষে জোর সওয়াল করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে হোসেন মিঞার 'ময়নাদ্বীপ' – এই utopian আদর্শের সর্বাত্মক উদাহরণ, যেখানে জীবন প্রবাহিত হয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম-শ্রমের নিবিড়তায়।

সুন্দরবন কখনই 'utopia' নয়। কিন্তু পত্তন পর্বের নবগঠিত সুন্দরবনের সমাজব্যবস্থা কেমন হবে, তা উপন্যাসকাররা কল্পনায় বুনন করেন। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে যেমন ছিল Utopian Socialism–এর আদর্শ, তেমন ছিল সুন্দরবনের আবাদ পত্তনের হেমিল্টনের সমবায়ভিত্তিক আদর্শ ও কর্মপ্রয়াস। কেননা, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সবাই মানবেন, হেমিল্টনই সুন্দরবনের হোসেন মিঞা। স্কটল্যান্ডে জন্ম হলেও সুন্দরবনই তার ধাত্রীমাতা। ১৯০৩ সালে তিনি সুন্দরবনের গোসাবাতে ৯০০০ একর জমি কিনে আবাদ পত্তনের সূচনা করেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের নিয়ে তিনি গোসাবা, সাতজেলিয়া, রাঙাবেলিয়া – এই তিনটি দ্বীপ মনুষ্যবসবাসের উপযোগী করে তোলেন। মহাজনী অত্যাচার থেকে সুন্দরবনের কৃষককুলের মুক্তিই তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ১৯০৪ সালে ধর্মগোলা স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রথম সমবায় ব্যবহার পত্তন করেন সুন্দরবনের গোসাবাতে। এখানে তিনি ১৫ সদস্যের Co-operative Credit Society তৈরি করেন। ১৯২৮ সালে Consumers Co-operative Society–র সূচনা করেন। ১৯১৯ সালে মডেল কৃষিখামার তৈরি করে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। 'Co-operative paddy saler Society গঠন করেন ১৯২৩ সালে। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন গোসাবায় 'কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক' ও ১৯২৭ সালে জামিনি রাইস মিল। শিক্ষার প্রসারে বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি ১৯৩৬-এ গোসাবায় এক টাকার নোটেরও প্রচলন করেন। সুন্দরবন যেন হয়ে ওঠে নতুন এক রাষ্ট্র। নানাবিধ অসম্ভব কাজ সম্ভব করেছেন – এক ফসলা জমিকে তিন ফসলাতে উত্তীর্ণ করা, আপদকালীন ধর্মগোলা

স্থাপন করে নিরন্ন মানুষকে আহার্য দান করা। এ হেন মানুষকে তো হোসেন মিঞা বলতেই হয়। মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমিল্টনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবও ছিল। সুন্দরবনের সমবায়িক সমাজপ্রতিষ্ঠায় তিনি সাগ্রহে এঁদের মতামত গ্রহণ করেছিলেন। তাই উপন্যাসে সুন্দরবনের পত্তন পর্বের সমাজ বিন্যাসে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে হেমিল্টনের সমবায়িক আদর্শ, নইলে অপূর্ণ থেকে যাবে সুন্দরবনের জীবনকাব্যের ছন্দ।

হ্যামিল্টনীয় সমবায়িক আদর্শের সার্থক উত্তরণ ঘটেছে মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে, মধুসূদন রায়ের 'মৌভোগ' ও আবাদ পত্তনেও। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মাধ্যমে। সুন্দরবনের 'মৌভোগ'এ নয়া আবাদ পত্তনের কারিগর সে। আর আবাদকৃত স্থান নিজের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নামাঙ্কিত করেন – (মধু > মৌ) 'মৌভোগ'। ক্রমশঃ সেখানে বসবাস শুরু হয়েছে মধুসূদনের প্রখর দৃষ্টি – যারা আসছে, প্রত্যেককে সর্বপ্রকার সুবিধা দিচ্ছেন তিনি। যেন হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপের আদল। অবিশ্রাম খাটুনি, জীবন সেখানে নির্মম, নীরব। তবে হোসেন মিঞার সঙ্গে মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তর পার্থক্য। স্বভাবে কবি হোসেন মিঞা কিছুটা নিষ্ঠুর, সুচতুরও বটে। 'অন্যায় সে কারো প্রতি করে না, শুধু তাকেই হোসেন শাস্তি দেয়, ভীষণ ও মর্মান্তিক, যারা শত্রুতা করে হোসেনের অকারণ ক্ষতি করতে চায়, বিঘ্ন ঘটায় হোসেনের স্বপ্ন সফল করার পথে'। কিন্তু মধুসূদন প্রখর বাস্তববাদী। কর্মঠও বটে। জঙ্গল হাসিল করে চাষবাসে মেতে তো আছেনই; পরন্তু তাঁর নবসাম্রাজ্যের অংশীদারদের সার্বিক মনোরঞ্জনের জন্য গ্রাম্য মেলা, কুস্তি, যাত্রা আসরের ব্যবস্থাও করে। পৌষ-সংক্রান্তির পর সাপ্তাহিক হাট বসে যায় মেলার জের হিসাবে। এক সমবায়িক সমাজগঠনে বদ্ধপরিকর মধুসূদন।

উদ্বৃত আয় মধুসূদন নিজের কাছে নয়, সমাজের সার্বিক মঙ্গলেই ব্যয় করেন। মধুসূদনের এই কর্মপ্রচেষ্টা ও নবসাম্রাজ্যের সদস্যদের প্রতি তার ঐকান্তিক মঙ্গলকামনা তাকে এক আদর্শ সমাজতন্ত্রীতে উত্তীর্ণ করে। উনিশ শতকীয় তিন সমাজবাদী দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ে, রবার্ট আওয়েন, স্যা সিমো – এঁদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে মধুসূদনের জীবনাদর্শ কোথাও যেন খাপ খেয়ে যায়। শোষিত-বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষদের প্রতি সিমোর অবদান মার্কস এঙ্গেলস প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন। 'Das Capital' গ্রন্থে কার্ল মার্কস লিখেছেন : 'Saunt-Simon Speaks directly for the working class and declears their emancipation to be the goal of his efforts'। এঙ্গেলসও 'Socialism' গ্রন্থে মার্কসের সমর্থন করেছেন। সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার মুক্তির প্রয়াসে সিমো বুর্জোয়া পুঁজি ও অর্থসম্পত্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজের উন্নতিসাধনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। রবার্ট ওয়েন ও সমবায়ভিত্তিক সমাজবিন্যাসের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, সমাজের মৌলিক একক যদি সাধারণের সেবার জন্য কাজ করে,

তবেই মানবচরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব হবে। মোটকথা, তার ইউটোপিয়ান সমাজের মূল কথা : সম্প্রদায়গত এক যৌথ জীবন, যেখানে মুক্ত পরিবেশে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের সকলে পরস্পরের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। মধুসূদন ও 'মৌভোগ'এ শোষণহীন সমবায়িক সমাজগঠনে প্রয়াসী হয়েছেন। উপার্জিত সম্পত্তি সকল সম্প্রদায়ের সুষ্ঠ জীবন পরিচালনে ব্যয় করেছেন। নাচ-গান-আলো-বাজনা-রাজা-রানী, 'রাজকন্যা' সবমিলিয়ে যেন ইন্দ্রলোক'এর আয়োজন সম্পন্ন করেছেন মধুসূদন। উনিশ শতকীয় সমবায়িক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের এই প্রতিফলন 'জলজঙ্গল'কে মহিমান্বিত করেছে।

ঔপন্যাসিক শিবশঙ্কর মিত্র 'বেদে বাউলে' (১৯০৫) উপন্যাসে হ্যামিল্টনীয় সমবায়িক আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। উপন্যাসে এসেছে সমবায়ের আদর্শে 'পাড়া কমিটি' গঠনের কথা। গরিব কৃষকদের মধ্যে 'দশে মিলে করি কাজ' তথা সমবায়ের যে বীজ উপ্ত করেছিলেন হ্যামিল্টন, তারই শাখা পল্লবিত হয়েছে সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া দ্বীপে। হ্যামিল্টন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন পূর্বতন এক বিপ্লবী কর্মী – পাড়ায় তিনি 'মাস্টারদা' নামে পরিচিত। হ্যামিল্টনীয় সমবায়িক আদর্শের বাস্তবায়নে তিনি 'পাড়া কমিটি' গঠনের ডাক দিলেন। 'পাড়া কমিটি'ই হবে কৃষকদের সার্বিক জীবন পরিচালনার নির্দেশক। কোন ব্যক্তি নয়, সমষ্টিই সেখানে শেষ কথা বলবে।

'পাড়া কমিটি'র কাজের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক শিবশঙ্কর মিত্রের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিফলিত। সমাজতান্ত্রিক উইলস্ট্যানলী অনুর্বর ও অকর্ষিত জমি চাষের কথা বলেছেন, '.......আবার দার্শনিক ব্যাবেক এমন একটি সমাজের কথা বলেছিলেন, যেখানে সমস্ত ব্যক্তিই কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এ হেন দার্শনিক চিন্তাধারার মতই 'পাড়া কমিটি'তে সবাই একত্রে কাজ করবে, পাড়ার সবাই'- একত্রে। সভায় চত্বর ভর্তি চাষিদের আনাগোনা। তর্কাতর্কি ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে তারা সঠিক পথটি খুঁজে নেয়। 'আর সে পথকে কাজে রূপ দিতে হবে সব্বাইকে – যে যেমন ভাবে পারে।' – এভাবেই সমবায়িক আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

'আমাদের সকলের বাড়তি আয়' – এই শ্লোগানকে বাস্তবায়িত করতে ফসল তোলার পর বাকি সাতমাস লঙ্কা চাষ করে অর্থ উপার্জনের ধারা অব্যাহত রাখে 'পাড়া কমিটি'। এ তো সমাজতান্ত্রিক আদর্শেরই প্রকাশ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মৌল নীতি – সমাজের সর্বার্থেই ব্যক্তি কাজ করবে এবং কাজের গুণ (Quality) ও পরিমাণ (Quantity) অনুযায়ী তারা পারিশ্রমিক পাবে। এই আদর্শের প্রথম পর্যায়ে ছিল, 'From each accroding to his capacity to each according to his work'। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে, তেমনি পারিশ্রমিক পাবে।[২৫] কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজের

উচ্চপর্যায়ে সাম্যবাদী সমাজে এই ধারণার বদল ঘটে। মার্কস বলেছেন : 'From each accroding to his ability to each according to his needs.', অর্থাৎ 'সামর্থ্য' অনুযায়ী কাজ করলেও 'প্রয়োজন' অনুসারে সমাজভাণ্ডার থেকে ব্যক্তি তার পারিশ্রমিক পাবে।[২৬] মাস্টারদার 'পাড়া কমিটি'ও জমির পরিমাণ ও শ্রমের নিবিড়তা অনুযায়ী টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে এবং অতিরিক্ত অর্থ গচ্ছিত রাখে সমাজভাণ্ডারে, আগামী সনের জন্য। ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিই হয়ে ওঠে সমাজ নির্দেশক। পত্তন পর্বের সুন্দরবনের সমাজবিন্যাস এই আদর্শেই গড়ে উঠেছিল। শিবশঙ্কর মিত্রের উপন্যাসে তারই ঘোষিত রূপ।

সুন্দরবনের বেতনা তীরবর্তী মালো সমাজের জীবনার্তি ও মর্মযন্ত্রণার সুবিন্যস্তরূপ সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' (১৯৮০)। ঔপন্যাসিক ডাক্তার ভূপতি বর্মণের চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমবায়িক আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মালো সমাজের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্যই তিনি কো-অপারেটিভের প্রচলন করেন। খটিদারদের বিপ্রতীপেই কো-অপারেটিভের প্রবর্তন এবং সেখানেই মাছ বিক্রির ব্যবস্থা। কো-অপারেটিভের উদ্বৃত্ত আয়ের সমবন্টন হবে – এই সমবায়িক আদর্শ নিয়েই ভূপতি বর্মণের পথ চলা। তাই অনিবার্যভাবে খটিদার আবদুলের সঙ্গে তার সংঘাত চরমে ওঠে। কো-অপারেটিভের বিরুদ্ধে নানান চক্রান্ত শুরু হলেও ভূপতি তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখে। শতপ্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে সমবায়িক আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। শ্রীপদর সামনে ডাক্তার তার অবরুদ্ধ আবেগ ফাঁস করে :

> 'কো-অপারেটিভ আমার ব্যক্তিগত নয় বলে তবু অনেকটা আমার। যাদের জন্য শুরু করেছিলাম, কতটুকু লাভ হয়েছে জানি না।.. তবে তুলে দিই নাই কেন? ওই যে বললাম, ঘোর বা নেশা যাই বল ... আজ যদি তোমরা নিজের হাতে তুলে নাও, বাধা দেব না, সাধ্য মতো সঙ্গে থাকব।'[২৭]

জীবনের শেষপর্বে এসে ডাক্তার তার আদর্শকে উত্তরসূরি শ্রীপদর হাতে তুলে দিতে চায়। আর শ্রীপদ এই সমবায়িক আদর্শে নতুন করে বাঁচার অর্থ খুঁজে পায়। এক অমোঘ সত্যের মুখোমুখি হয়; 'কেউ কাউকে বাঁচায় না, নিজেদের বাঁচতে হয়।' – বাঁচতে হয় সমবায়িক প্রচেষ্টায়। সমবায়িক আদর্শে মালো সমাজকে উজ্জীবিত করার দায়ভার তাই শ্রীপদকেই নিতে হয়। জঙ্গলে গেলেও 'কোটাল শেষের দিন গুনতে থাকে'। সমবায়িক আদর্শেই তাকে ঘরে ফেরার আহ্বান জানায়। ভূপতি বর্মণের প্রচেষ্টা ও শ্রীপদর বাঁচার আগ্রহ – এই দু'ইয়ের স্থির মিলন বিন্দুর উৎস : সমবায়িক সমাজতান্ত্রিক আদর্শই।

৪. দ্বিতীয় প্রজন্ম : পরিবর্তিত সুন্দরবন ও বাংলা উপন্যাস

৪.১ দৈবনির্ভরতার আড়ালে আধুনিক জীবনচেতনা : শিশুশ্রমের প্রাপ্য আদায়ের লড়াই

সুন্দরবন উপজীব্য উপন্যাসের কথাশরীর নির্মাণে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে

বনবিবি, শাহজঙ্গলী, দক্ষিণরায়, নারায়ণী কিংবা ধনা-মনা-দুখে উপকথার আদল। কিন্তু আটের দশকের পর নির্ভেজাল দৈবনির্ভরতার পরিবর্তে আধুনিক জীবনচেতনা সঞ্চারিত হয়েছে ঔপন্যাসিকদের শিল্পসত্তায়। বনবিবি, শাহজঙ্গলী; ধনা-মনার কাহিনির অবয়বে সামাজিক শোষণ বৈষম্য এবং তা নিরসনে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জ্বলন্ত অবয়ব রচনা করলেন সমীর রক্ষিত 'দুখের আখ্যান' (১৯২৮) উপন্যাসে। উপন্যাসের নামেও উপকথার আদলটা রয়ে যায় কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে প্রতীকী। 'বনবিবির জহুরনামার' সমীকরণটি উলটে নিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে পরিবর্তিত সুন্দরবনের শোষণ-বৈষম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গি ঔপন্যাসিক সমীর রক্ষিতের শিল্পসত্তায় বিরাজমান।

হ্যাঁ, নয়ের দশকের প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক সমীর রক্ষিতের 'দুখের আখ্যান' (১৯৯৮) ধনা-মনা-দুখের উপকথার আধুনিক ভাষা। ভক্তের আকুতিতে মা বনবিবি গঙ্গার কোল জোড়া করে এক পুত্র সন্তান উপহার দেয়। সে তো বনবিবিরই বরপুত্র। তাই তার নাম রাখা হয় দুখে। ঔপন্যাসিক সুকৌশলে দুখের জন্মক্ষণকে শাশ্বত করেছেন, বনবিবির করুণাপ্রাপ্তির অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশে। অসহ্য গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মূর্ছা যায় গঙ্গা। অন্ধকার চোখে 'মাগো' বলে চিৎকার করে ওঠে। তখন সেই অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মতো আবির্ভূতা হয় বনবিবি।

> 'বনবিবি হাসে, হেসে বলে – পুত্রের মুখ দেখবি না গঙ্গা? পুত্রের এত শখ, কিনতুম কষ্ট সইতে পারনি, চোখে জল আসে, ডরাও। ছিঃ তুই না মা? পুত্রের মুখ দেখ, নে দেখ।'[২৮]

বনবিবির আশীর্বাদধন্য এই নবজাতকের নাম রাখা হয় তাই দুখে। দক্ষিণরায়ের হাত থেকে বনবিবি কর্তৃক দুখে উদ্ধারের সেই মানসদর্শন ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন পালটে দেয়। বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায়, যেখানে জীবনচক্রের পারদ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী, সেখানে একটা নবজাতক যে জীবনযন্ত্রণা ও ক্রুরতার দৃষ্টি নিয়ে আবির্ভূত হবে – সেটাই স্বাভাবিক। দুখের জন্ম তাই সহজ সমীকরণে বিশ্লেষণযোগ্য নয়। জন্মলগ্নে প্রত্যেক নবজাতক 'কান্না' দিয়েই আত্মঘোষণা করে, কিন্তু দুখে জন্মানোর পরমুহূর্তে কাঁদে না, খলখল করে হেসে ওঠে – যা তার ব্যতিক্রমী সত্তার ইঙ্গিতবাহী। এ দুখে সাধারণগৃহে জন্মেও অতিমানব – সমগ্র উপন্যাস জুড়ে লেখক সেই আবহই তৈরি করেছেন।

কলকাতায় ছোট্ট, দুখে জীবনসংগ্রামের কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। কেষ্টর চা দোকানে বেয়ারার কাজ পায়। তার এক হাতে চটের থলে আর অন্য হাতে আলু পেঁয়াজের ফর্দ – দুখের যেন মনে হয় – লিখিত আদেশ – কাঠ কেটে আনো। যেন দক্ষিণরায়ের আদেশনামা :

> 'ওরে ধনা, কী বলিব আর।
> নররক্ত খেতে ওবে বাসনা আমার।।

এক লোক মোরে যদি দিতে পার তুমি।
মোম মধু সাত ডিঙা দিব তোরে আমি। '

হিংস্র ক্রুর নিষ্ঠুর, শিশু নির্যাতনকারী কেষ্ট রায় এখানে ক্ষিণরায়ের প্রতীকে আভাসিত। আর দুখের সামনে আবির্ভূতা অসহায় বৃদ্ধ মহিলা – যিনি দুদিন অভুক্ত থেকে খাদ্যের সন্ধানে কলকাতার রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরছে – দুখের দৃষ্টিতে সে-ই গল্পে শোনা উপকথার দুখের মা। দুখের মনে হয়েছে : 'ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে যার চোখ গেছে, যে কানে শুনতে পায় না, যে পথে পথে ঘুরে ঘুরে ছেলেকে খোঁজে বনবিবির উপাখ্যানের সন্তানকাতরা অসহায়, দুখের মার সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় অভুক্ত বৃদ্ধার তুলনা – লেখকের গভীর জীবনবোধের পরিচায়ক।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কালু-ই দুখের অন্তরে বিদ্রোহী সত্তাকে জাগিয়ে দেয়। এ যুগের ধনা দক্ষিণরায়রা ওঁৎ পেতে বসে আছে। নিরীহ অসহায় মানুষদের খুবলে খাচ্ছে। তাই আত্মরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। কালু সেই সংগ্রামের জন্য দুখেকে উদ্বুদ্ধ করে। বিদ্রোহী মনোজ এখানে হয়ে ওঠে শাহজঙ্গলী। জীবনযন্ত্রণা ও সামাজিক নিষ্পেষণে বিধ্বস্ত কালু-দুখেরা লেখকের কলমে যেন এ যুগের দুখে হয়ে ওঠে। মনোজের চকিত উদ্ভাসে মুগ্ধ দুখে। তার গায়ে ওয়াটার প্রুফ, মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথা টুপিতে আচ্ছাদিত। সে সমাজের জীর্ণ শিকড় ধরে টান মারবে, উপড়ে দেবে সামাজিক বৈষম্যের ভিত। তাই মনোজ শাহজঙ্গলীর রূপকে আভাসিত :

> 'সেই জঙ্গলী শা, বনবিবির ভাই, সারা মুখ দাড়ি, যে বনবিবির ইঙ্গিতে বাঘ তাড়া করে। যে বাঘ দুখেকে খেতে আসে। সে বাঘ ছোটে – জলজঙ্গল নদী নদ খাড়ি দ্বীপ পার হয়ে যায়। জঙ্গলী শাও ছোটে, জঙ্গলী বাঘও ছোটে। জঙ্গলী কি ধরে ফেলেছে বাঘটাকে, নাকি এখনও ছুটছে? ছুটে চলেছে?'[২৯]

উপন্যাসে দক্ষিণরায় রূপী কেষ্ট আত্মকেন্দ্রিক, অর্থপিশাচ, ক্ষমতালোভী, আর বনবিবিরূপী অধর যেন সামাজিক বিপ্লবের প্রধান সেনানী। আর মনোজ-শাহজঙ্গলী। বনবিবি ও শাহজঙ্গলীর যৌথ-সংঘবদ্ধ প্রয়াসে দক্ষিণরায়ের চরম পরাজয় ও দুখে উদ্ধারের মতই অধর ও মনোজের সমন্বয়ী সংগ্রাম চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে উপন্যাসে। এ যুগে দুখেদের তাই আর কোন ভয় নেই। শিশু শ্রমিক তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না আর। ঔপন্যাসিক সমীর রক্ষিতের যুগমানসলব্ধ এই বোধ প্রবহমান কথাসাহিত্যের জীর্ণতাকে টান মেরে কথা সাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা দানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

৪.২ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংঘাতের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যকামিতা ও প্রশাসনিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই : আধুনিক সুন্দরবনের বাস্তবাখ্যান

সুন্দরবনে গ্লাসিয়েশন-ডিগ্লাসিয়েশন চক্রের প্রভাবে, জোয়ার-ভাটার আবর্তে কখনো কখনো নতুন চর বা দ্বীপ জেগে ওঠে। গজিয়ে ওঠা চরে সমুদ্রদুয়ারে নিরাশ্রয় মানুষরা ছুটে আসে, বসত বানায়। চরকে কেন্দ্র করে নতুন সমাজের পত্তন হয়। গজিয়ে ওঠে নতুন নতুন কলোনি। কিন্তু সভ্য মানুষের করাল দ্রংষ্টায় প্রশাসনিক আগ্রাসন ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যকামিতায় তাদের বাস্তু উচ্ছেদ হতে হয়। বিতাড়িত হতে হয়। তখনই শুরু হয় প্রশাসন তথা রাষ্ট্রের সঙ্গে চরবাসীদের সংঘবদ্ধ লড়াই। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এই লড়াই ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'চরপূর্ণিমা' (১৯৯৫) ও অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' উপন্যাসে বহুমাত্রিক স্বরে চিত্রায়িত। আধুনিক সুন্দরবনের এই বাস্তবাখ্যান বাংলা উপন্যাসে নতুন অভিমুখীকরণের সূচকও বটে।

সমুদ্র আর নদী, বালি আর চর – এ সবের সমন্বয়ে 'বালিস্তানের চর' – শীতের শুটকি মাছের মরশুমে মাত্র চারমাসের (কার্তিক, অগ্রহায়ন, পৌষ, মাঘ) জীবন – সেই জীবনকে কেন্দ্র করে মাছমারাদের সম্বৎসরের সংসার নির্বাহ। অথচ সেখানে, দারিদ্র্যপীড়িত জেলে-জেলেনিদের জীবন উপাচারে থাবা বসায় সরকারি ফরেস্টার অফিসার তথা প্রশাসন। বাসস্থান নয়, বৃক্ষরোপণ করতে হবে সেখানে – এই জিগির তুলে চর দখলের লড়াইতে নেমে পড়ে রাষ্ট্র। সুন্দরবনে গজিয়ে ওঠা চরকে নিয়ে সংঘাত – ঔপনিবেশিক আগ্রাসন – এ সমস্যা জ্বলন্ত বাস্তব। ঝড়েশ্বরের 'চরপূর্ণিমা' এই সমস্যারই আর এক প্রস্ত রূপ।

ঔপন্যাসিক এই সত্যপ্রতিপাদন করেছেন যে, 'বালিস্তান'ই সাগরে মাছমারা জেলেনিদের 'ভাতের থালা', 'অন্নদাত্রী মা'। এখানে চলে না আইনের অনুশাসন, ভূগোলের গোলকধাঁধা, কিংবা প্লানটেশন প্রোগ্রাম। অরণ্য-মানুষের সহাবস্থান সেই আদ্যিকাল থেকে চলে আসছে। অরণ্যের ক্রোড়ে মানুষ ঘর বাঁধে, জলের কিনারে ঠাঁই নেয় মানুষ। সেই সহাবস্থানের কথা ফরেস্টার অফিসার জানে না। শুধু ভূগোলের ব্যাপ্তি নয়; সামাজিক বিন্যাসটাও জানতে হয়, নতুবা যেখানে সেখানে শিকড় চালালে মাটি খুঁজে পাবে না। কেননা :

> 'পাঁচ ছ'হাজার লোকের আট দশমাসের নগদ মজুরীর প্রাপ্তির জায়গা হল এই চারমাসের চর। লক্ষ লক্ষ টাকার ড্রাই ফিস পণ্যটি ভারতের কতগুলো রাজ্যে যে চলে? এর সঙ্গে জড়িত মানুষ ...।'[৩০]

প্রশাসনের গোঁয়ার্তুমি সহ্য করবে না সাবাড়েরা। তাই চার হাজার ঝাউচারার শিকড় আর মাটি খুঁজে পায় না। সাবাড়ের দলবল চারা উপড়ে ফেলে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে 'চরের বুক খুঁড়ে জীবিকার অস্থায়ী ছাউনি' গড়ে ওঠে। কোনো utopia নয়; সুন্দরবনের এ এক অতিবাস্তব আখ্যান। অস্থায়ী সংসার, অস্থায়ী কলোনির জন্ম হয় চরে। চর তখন শুধু বালির চর থাকে না, 'বিশ পঞ্চাশ একশো টাকার নোটের' চর হয়ে ওঠে। চরবাসীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে পিছু হটে প্রশাসন। ঝড়েশ্বরের

উপন্যাসে এ এক মৌল দিক, যা কিনা আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বের যে কোন ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামিতার সঙ্গে সহজেই সমীকৃত হয়ে যায়।

> এই প্রসঙ্গে আমার অন্য একটি প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উল্লেখ করতে হয় : 'শিল্পের কাছে হার মানে ইতিহাস, জীবনের কাছে পরাজিত হয় ভূগোল। প্রভুর দাসত্ব আর মানতে চায় না হাভাতে মানুষ। তারা নিজেদের চলার নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে যায় অবলীলায়। ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে তারা নিজস্ব মাটিকেই লালন করে – সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে যূথবদ্ধতার অস্ত্র। গড়ে তোলে এক সমবায়িক জীবন। তাদের নিজস্ব ভূমি আর মাটির টানে নির্নিমেষ মুগ্ধতায় তাকিয়ে থাকে। সে মুগ্ধতা বেঁচে থাকার মুগ্ধতা। ঝড়েশ্বর নিজেও কখনো কখনো সেই মুগ্ধতার শরিক হন। দ্বীপে লালিত মৃতপ্রায় আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতান। সেই নিবিড়ভাবে মেশা ও নির্নিমেষ মুগ্ধতায় প্রান্তিক জীবনকে উপলব্ধি করার অসামান্য ক্ষমতার জেরেই ঝড়েশ্বর স্রোতের বিপ্রতীপে কলম চালান। শিল্পকে কালোত্তীর্ণ করতে সেটাই তো চাবিকাঠি। 'চরপূর্ণিমা' তাই কালজয়ী হয়ে যায়।'[৩১]

ঝড়েশ্বরের 'চরপূর্ণিমা' ধারাপথের সার্থক উত্তরণ অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' (২০০৭)। চার নয়, ছ'মাসের অস্থায়ী সংসার ধনপতির চরে উঠে এল নতুন দর্শন নিয়ে। রাষ্ট্র নামক সরকারি যন্ত্রের পেষণে পিষ্ট মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ – দারিদ্র্য অসহায় চরবধূদের নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার আবহনীতিকেই স্পষ্ট করলেন ঔপন্যাসিক অমর মিত্র। নারী যেন ভোগ্যবস্তু – ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামিতার এই স্পষ্ট চেহারার বিরুদ্ধাচরণ করে নারী তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ হয়। সেই সঙ্গে তাদের একমাত্র উপার্জিত চরভূমি, যা কিনা সরকারি 'পয়স্ত' ভূমিও বটে, তাই তাকে দখল করতে সরকারি আগ্রাসন – তারই বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে নারীশক্তি – একুশ শতকীয় চেতনার লেখকের এই বোধ সহজেই বৈশ্বিক (Universal) রূপ পেয়ে যায়। তাই অমর মিত্র অবশ্যই স্বতন্ত্র পূর্ববর্তী লেখকদের থেকে।

অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' (২০০৭) – সুন্দরবনে উত্থিত এক দ্বীপে ছ'মাসের পৃথিবীতে বসবাসকারী চরবধূদের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনসংগ্রাম – সেই সঙ্গে 'গরমেন'-এর আগ্রাসী থাবার বিরুদ্ধে চরবধূ যমুনা, বাতাসি, কুন্তিদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ও সর্বাধিকার রক্ষা – এ হেন বহুমাত্রিক বয়ানে বিন্যস্ত একটি মাইলস্টোন সূচক উপন্যাস।

উপন্যাসের মূল প্লট – ধনপতির চর – 'ঘোড়াদল থেকে সাড়ে ছয় লিগ দূরে, বঙ্গোপসাগরের মোহনায় কাছিমের পিঠের মতো ভেসে আছে ধনপতির চর। 'ধনপতির চরে তিনদিকে নদী, সমুদ্রের মতো নদী, সমুদ্র প্রায় নদী আর একদিকে

দক্ষিণে সমুদ্র' – এই বাস্তব অবস্থানটি আমাদের চিনিয়ে দেয় যে, ধনপতির চর সুন্দরবনেই গজিয়ে ওঠা কোন চরভূমি। এই চরের অধীশ্বর ধনপতি নামধারী এক বৃদ্ধ – যে কিনা নিজেকে হার্মাদ পেরুর বংশধর, কখনোবা বৃদ্ধ কাছিম বলে পরিচয় দেয়। চরবাসীদের কাছে সে বরাবরই 'অলিক বিত্তান্ত' রচনা করে তার পরাকাষ্ঠা দেখাতে চায়। শীতের শুটকি মাছের মরশুম শুরু হতেই জীবিকার অন্বেষণে ঘোড়াদল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে জেলে জেলেনিরা আসে এই ছ'মাসের চরে। তারা দিশিং করে, মাছ শুকায়, শুকনো মাছ ডাঙায় পাঠিয়ে দেয়। এই ছ'মাসের রোজগারই তাদের সারা বছরের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়। ধনপতির চরে গন্ধ বসে যায়। বহির্জগৎ থেকে ব্যবসায়ীরা আসে। মীনা বাজারের পত্তন হয়।

সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলে গজিয়ে ওঠা ধনপতির চরে প্রশাসন তথা 'গরমেন' দখলদারি প্রতিষ্ঠা করতে সরকারি সক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখায়। এ শুধু চর দখল নয়, চরের নারীদখলও বটে। চরনারীদের তরল মাংস উপভোগ করতে সব শ্রেণির 'গরমেন' মরিয়া প্রয়াস চালায়। এবং তা সফল করতে সরকারি সক্ষমতার সুবিধাবাদী ব্যাখ্যান তৈরি করে নেয়। যমুনা-বাতাসি-কুন্তিরা সেই আখ্যানে জড়িয়ে পড়ে। তাই রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের সমান্তরাল বয়ান রচনা করেন ঔপন্যাসিক :

> 'ছ'মাসের পেটের ভাত, ঘরবিছানা, স্বামী, দু'চার পয়সা হাতে স্নো, পাউডার, সাবান – এ সব ঠিক রাখতে গরমেন চটালে চলে না। তারা জানে ধনপতি সর্দারও শেষপর্যন্ত 'গরমেন'-এর অধীন। এ পৃথিবীতে 'গরমেনত-এর বাইরে কিছু নেই। গাছ, পানি, জেলে নৌকা, জেলে, গাঙের মাছ, কচ্ছপ, চর, চরের মাটি, চরের গাছগাছালি সবেতেই গরমেনের অধিকার।'[৩২]

সর্বশক্তিমান, সর্বগ্রতাসী, বহুরূপধারী যে ধনতান্ত্রিক রথ, যা প্রান্তিক মানুষদের কথায় 'গরমেন', 'যোগন্তা আমিন', 'বিডিও, নিসপেক্টর পুলিস' এরা 'গরমেন'এর প্রতিভূ – এদের কাছে চরবধূদের অসহায়তার কথা লেখক প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু শেষাবধি এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছে নারীর মনের ভিতর থেকে, নারীর কণ্ঠস্বরে।[৩৩] তাই অমর মিত্রের এই পাঠকৃতি হয়ে ওঠে অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশবাদের দ্বারা মথিত জনজীবনের প্রতি ইশারা।[৩৪] ঔপন্যাসিকের এই কণ্ঠস্বর আধুনিক মানুষকে নতুন করে জাগিয়ে দেয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 'গরমেন'এর সর্বাত্মক উপস্থিতির চেহারাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে।

ধনপতির সপ্তদশী বিবি – ধনেশ্বরি কুন্তি যেন নারী জাগরণের মূর্ত প্রতীক, নারীকে নিয়ে কামোন্মত্ত পুরুষের খেলার ছক সে ভাঙতে চায়। নারীর শরীর বিক্রি ও নারী পাচার চক্রের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। চরে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ও চর রক্ষার্থে সে নিজের নারীত্বকেও বিসর্জন দেয়। কুন্তির এই ঔদার্য ও বৃহত্তর স্বার্থে

নারীত্বের বিসর্জন – তাকে চরনেত্রী করে তোলে।

> 'আমি এ চরের মালকিন, এই চর, গাঙ, সমুদ্দুর, আশমান, তারা, গাঙের মাছ, গাঙের পাখি সব আমার।'[৩৫]

এ হেন 'নতুন বেত্তান্ত' রচনা করে সে চরনারীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। এমনকি প্রজাদের বার মাসের স্বচ্ছলতার জন্য সে ধনপতিরও বিরুদ্ধাচারণ করতে পেছপা হয়নি। এ ক্ষমতা কুন্তির ছাড়া আর কারই-বা আছে।

আসলে ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে সর্বহারা চরবধূ কুন্তি, বাতাসি, যমুনাদের এই সংগ্রাম ঔপন্যাসিকের সাম্যবোধের পরিচায়ক। রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের স্বপ্ন দেখে – যে সমাজ হবে মাতৃতান্ত্রিক – নারী ফিরে পাবে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব। আর এই লক্ষ্য পূরণে কুন্তিরা ধনপতির পৌরুষকে জাগাতে চায় অপ্সরা কর্তৃক দেবতাদের ধ্যান ভাঙানোর মতই :

> 'জাগাও ধনপতিরে! চুমা দাও! বুকের কাপড় ফেলি দাও, বুকি ঠেকাও, ঘুম ভাঙবে? বস্তর খুলে জাগাও ধনপতিরে। এতেই গরমেন হার মানবে?'[৩৬]

আসলে ঔপন্যাসিক অমর এখানে বহুমাত্রিক লড়াইকে স্পষ্ট করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. ইসলাম বলেন :

> 'লড়াই এখানে খাদক ও খাদ্যের মধ্যে, ভোগেচ্ছু ও ভোগপাত্রের মধ্যে। খাদক ভোগ করতে যাচ্ছে, খাদ্য নিজেকে খাদ্য হতে দিতে চায় না – এরই লড়াই। সেই আদিম সাপ-ব্যাঙ-বাঘ-মানুষের লড়াইয়ের মতো একেবারে খাদক-খাদ্যের লড়াই। ধনপতির চরের লড়াইটা এই পর্যায়ের। আবার সব ভোগকারীরা একে অপরের সহায়ক, বলতে গেলে a chain of lumpens এখানে ক্রিয়াশীল। আর খাদ্য যারা, তারা প্রায় বৃথা লড়াই করছে খাদ্য না বনবার জন্য এবং লালন করছে অমোঘ স্বপ্ন, ঘর-সংসার, জীবনের।'[৩৭]

হ্যাঁ, একথা সত্যি যে লড়াইয়ের ধরন বহুমাত্রিক। এখানে খাদ্য নারী এবং খাদক প্রশাসন তথা 'গরমেন'। প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই লড়াইকে বৃথা বলবার হেতু কোথায়? তাহলে তো ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন মিথ্যে হয়ে যায়। তাই আমাদের বক্তব্য হবে :

> 'এ লড়াই অস্তিত্বের লড়াই, বাঁচার লড়াই, ভোজ্য থেকে নিবৃত্তির লড়াই। কিন্তু চরদখলের বিরুদ্ধে যখন তারা সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দেয়, তখন তা দেশকাল নিরপেক্ষ বৈশ্বিক হয়ে ওঠে। তা অবশ্যই সরকারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনজাতির জমি বা মাটি কামড়ে পড়ে থাকার লড়াইয়ের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে। কুন্তিদের এই সংগ্রাম তাই সমকাল ছুঁয়ে আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়।'[৩৮]

একেবারে নবীনযুগের ভারত নামান্তরে রাষ্ট্রব্যবস্থার পেষণে পিষ্ট অসহায়ের দিনলিপি

এবং সংঘবদ্ধ সংগ্রামের আবহগীতি 'ধনপতির চর', রাষ্ট্র নামক শ্রেণিযন্ত্রের আগ্রাসনধর্মিতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে মুখরিত ব্রাত্য চরনারীদের মর্মন্তুদ জীবন নির্যাসও বটে।

মূলকথা হলো : সুন্দরবনে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি; ব্যক্তি বনাম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিবর্তে পোস্টমডার্ন উপন্যাসে জায়গা পাচ্ছে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যকামিতা ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিরন্ন মানুষদের লড়াই – বেঁচে থাকার লড়াই। এ লড়াই তাই শুধু সুন্দরবন নয়; বিশ্বের যে কোনো ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে।

৪.৩ ইউটোপিয় ও সমবায়িক আদর্শের উত্তরণ : সাংস্কৃতিক চলমানতার শৈল্পিক রূপায়ণ – আধুনিক সুন্দরবনের প্রতিভাস

টমাস ম্যুরের 'Utopia'-র ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যে বহন করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় – 'ময়নাদ্বীপ' গঠনের মাধ্যমে। এই ইউটোপিয় ঐতিহ্যের উত্তরণ ঘটে যায় সুন্দরবনকেন্দ্রিক পোস্টমডার্ন উপন্যাসে। ঝড়েশ্বরের 'চরপূর্ণিমা' উপন্যাসের 'বালিস্তান' (যা আসলে কাকদ্বীপের অদূরে 'কালিস্থান' নামক দ্বীপ) 'কিংবা সেমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে 'ভুবনডাঙা', 'নতুন দ্বীপ', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে মেদনমল্লের দূর্গ নিকটস্থ 'চড়াবিদ্যার চর' কিংবা অমিতাভ ঘোষের 'হাংরি টাইড'-এর 'গর্জনতলা', 'লুসিবাড়ি' দ্বীপ (যদিও নাম দুটি কাল্পনিক, কিন্তু তার চারিপার্শ্বস্থ বর্ণনায় সুন্দরবনেরই বৃহত্তম বেধ উঠে আসে) – এই সব দ্বীপে কলোনাইজেশনের বিস্তার – আধুনিক পরিবর্তিত সুন্দরবনের সাংস্কৃতিক চলমানতারই সূচক।

জগৎবিখ্যাত ইঙ্গভারতীয় কথাশিল্পী অমিতাভ ঘোষ আধুনিক সুন্দরবনের নতুন সমাজ বিন্যাসের অলিন্দে উঁকি দিলেন – 'হাংরি টাইড' (২০০৪) উপন্যাসে। স্বাধীনোত্তর সুন্দরবনের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ধারাপাত রচনার দৃষ্টান্ত হয়ে যায় 'হাংরি টাইড'। উপন্যাসটির ব্লার্বে লেখা আছে –

> 'গত শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে এই কাদামাটি আর বাদাবনের দেশেই এক সাহেব আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ড্যানিয়েল হেমিলটনের সেই স্বপ্নের সূত্র ধরেই লেখা হল ভাটির দেশের নতুন ইতিহাস। অলিখিত বিধিবিধানের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বাদাবনের সংস্কৃতি।'[৩৯]

পিয়া-কানাই-ফকির-হরেণ-নির্মল-নীলিমা অনেকগুলো চরিত্রের অন্তহীন টানাপোড়েন সুন্দরবনের আধোক্রোস-আধোউল্লাস প্রকৃতি আর মরিচঝাঁপির মর্মন্তুদ ইতিহাস – একটি স্থির কিছুতে মিলিতকরণের অসামান্য ক্ষমতা ও শিল্পনৈপূণ্য দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সেইসঙ্গে ইউটোপিয় ও হ্যামিলটনীয় সমবায়িক আদর্শের উত্তরণ ও

আধুনিক সুন্দরবনের সাংস্কৃতিক চলমানতার প্রকাশভূমি হয়ে উঠেছে 'হাংরি টাইড'।

বাদাবনে নতুন সমবায়িক সমাজগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন হ্যামিলটন। সেই আদর্শ ও ঐতিহ্যের উত্তরণ ঘটেছে নীলিমার কর্মপ্রয়াসে। উপন্যাসে নির্মলও দশ বছরের ছোট্ট কানাইকে শোনায় হ্যামিল্টনীয় আদর্শের কথা :

> 'না, টাকার দরকার ছিল না সাহেবের। উনি চেয়েছিলেন একটা নতুন ধরণের সমাজ গড়তে, একটা নতুন দেশ গড়তে। ওঁর ইচ্ছা ছিল সে দেশটা চলবে সমবায় পদ্ধতিতে। যেখানে প্রত্যেকের জমি থাকবে, কেউ কাউকে শোষণ করবে না।'[৪০]

ইউটোপিয় সমাজবাদী দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ে, রবার্ট ওয়েন, এতিয়েন কাবেতদের আদর্শেরই বিচ্ছুরণ।

সাম্যচেতনার মূল কথা – ব্যক্তি মানুষের পেশার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকবে না। উপন্যাসে নির্মলের জবানীতে হ্যামিল্টনীয় আদর্শ :

> 'উনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, এমন একটা জায়গার যেখানে সব্বাই – পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকালবেলায় হবে চাষি, দুপুরে কবি, আর সন্ধ্যাবেলায় ছুতোর মিস্ত্রি।'[৪১]

এই আদর্শ অবশ্যই সমাজচেতনার ফল। একই মানুষ দিনের সময় বিশেষে একাধিক পেশায় নিয়োজিত হবে। কবি-চাষি-ছুতোর মিস্ত্রী। অর্থাৎ ভাবুক-শ্রমিক-নির্মাতা। ইউটোপিয় দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ে এমন একটি সমাজগঠনের কল্পনা করেছিলেন, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের পছন্দ মতো কাজ করবে নির্দিষ্ট বৃত্তিতে বাঁধা পড়বে না। এর ফলে কাজ হয়ে উঠবে আনন্দদায়ক। সাম্যবাদী দর্শনও এই কথাই বলে :

> 'In communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes ... to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticize after dinner, just a I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shephered or critic'.[৪২]

একই ব্যক্তি সকালে পশুশিকার, বিকালে মৎস শিকার, সায়াহ্নে পশুপালন ও নৈশ ভোজের পর তার্কিক আলোচনাতেও সময় অতিবাহিত করতে পারবে। নীলিমা সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই সুন্দরবনে বাদাবন ট্রাস্টের জন্ম দেয়। সুন্দরবনে সাংস্কৃতিক চলমানতার দিশারিও তিনি।

সুন্দরবনের লুসিবাড়ি দ্বীপে অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণাদগ্ধ মেয়েদের স্বনির্ভর করতে তার একের পর এক পদক্ষেপ। শ্রমের বিনিময়েই তারা স্বনির্ভর হবে। গোসাবা থেকে সাবান, দেশলাইসহ টুকিটাকি জিনিস কিনে এনে লুসিবাড়িতে বিক্রি

করা – অর্থ উপার্জনের এই অভিনব ভাবনাতেই নীলিমার লুসিবাড়িতে মহিলা সংগঠনের সূত্রপাত, যার পল্লবিত রূপ – 'বাদাবন ট্রাস্ট'।

নবনির্মিত সুন্দরবনের নতুন সমাজ গঠনে বাদাবন ট্রাস্টের এই মহৎ প্রচেষ্টা নীলিমাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদীদের সরণিতে স্থান করিয়ে দেয়। হাসপাতাল, ওয়ার্কশপ, অফিসঘর, গেস্ট হাউস, নার্সিংহোম – সুন্দরবনের আধুনিকীকরণে নীলিমার এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যেন হ্যামিলটনীয় ঐতিহ্যের উত্তরণ। নতুন সভ্যতার উন্মেষে ব্যক্তিনাম হারিয়ে সে হয়ে ওঠে 'মাসিমা'। সাধারণ মানুষের জন্য তার এই কর্মপ্রয়াস তাকে 'স্বর্ণযুগের এক বিচিত্র চরিত্রে' উন্নীত করে। তাই ৭৬ বছরের বৃদ্ধা নীলিমা পেয়ে যায় রাষ্ট্রপতির সম্মানও। একদিকে হ্যামিলটনীয় ঐতিহ্যের উত্তরণ অন্যদিকে সাংস্কৃতিক চলমানতা – এই দ্বিবিধ বৃত্তের কেন্দ্রভূমিতে নীলিমার অবস্থান তাকে আদর্শ সমাজতন্ত্রীতে উন্নীত করে।

৪.৪ ম্যাজিক রিয়ালিজম ও পোস্টমডার্ন উপন্যাস : আধুনিক সুন্দরবনের অচেনা ইমেজ

অতিপ্রাকৃত ঘটনার অলৌকিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণই যাদু (Magic), কিন্তু যখন তা আধুনিক মানুষের নিয়তি তাড়িত জীবনকে, জীবনের অনিঃশেষ যন্ত্রণাকে তুলে ধরে এবং বাস্তবজীবনের পরিপুষ্টিদানে সহায়ক হয়ে ওঠে তখনই তা জাদুবাস্তবতার চেহারা নেয়। কঠিন নির্মম বাস্তবের প্রকাশ এখানে স্বপ্ন-কল্পনা-মিথ-রূপকথা আর অলীক চিত্রকল্পের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়।

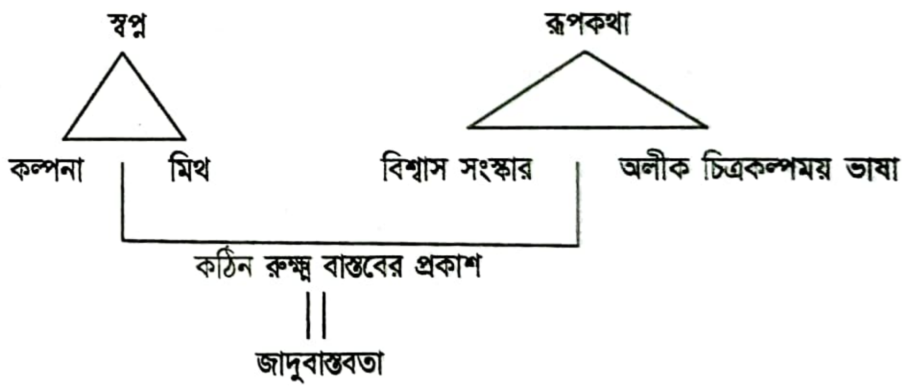

আকাশ বিহারী কল্পনার পাশাপাশি এখানে থাকবে ধূলি-মাটি-কাদার বাস্তব চৌহদ্দির চিত্রণ। তাই স্বপ্ন আর বাস্তবের সীমারেখা মুছে যায় এখানে। এই সমস্ত উপাদানের অন্তর্বয়নে 'পরাজগতের গ্রন্থনা দিয়ে জাগতিক বাস্তবের জীর্ণ বয়নকে অপসারিত করে পাঠকৃতির প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন অলিন্দগুলি দেখিয়ে দিতে চান ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার সূত্রধারেরা'।[৪৩] যেখানে থাকবে কুণ্ডলীকৃত গোলকধাঁধাময় প্লট, বাস্তবের চিতায় কল্পনার আগুন আর ব্যাখ্যাতীত ঘটনার সন্নিবেশ।[৪৪] এভাবেই

অবাস্তবের ভাষায় বাস্তবকে প্রকাশের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে পোস্টমডার্ন উপন্যাসে। এর ফলে উপন্যাস 'বাস্তব ভাষা প্রকাশের দড়িদড়া একটু আড়াল হয়ে রহস্যের আলো বিকীর্ণ করতে থাকে। তা আপাতভাবে অবিশ্বাস্যতার বাক্যবন্ধন, শব্দপ্রয়োগ, চিত্রকল্প ভিন্ন ধাঁচের, তথাপি তা বাস্তবের সংকটকে ঝঙ্কৃত করে।'[৪৫] সমীর রক্ষিত, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্রদের রচনায় সুন্দরবনের বিশ ও একুশ শতকীয় ভৌত-কুহকি-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রকাশ দেখা গেছে, যা পত্তন পর্বের সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে পাওয়া যায়নি।

সমীর রক্ষিতের 'দুখের আখ্যান' (১৯৯৮) উপন্যাসটি ম্যাজিক রিয়ালিজমের সার্থক রূপায়ণ। ছোট দুখে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন, তার আচরণও অস্বাভাবিক। বনবিবির জহুরনামার দুখের সঙ্গে সমীর রক্ষিতের দুখের একাত্মতা-আধুনিক যন্ত্রযুগের যন্ত্রণা প্রকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছে। এ যুগের কায়েমি স্বার্থবাজ তথা ধনা-মনা-দক্ষিণরায়দের শায়েস্তা করতে দুখের নিরন্তর সংগ্রাম। তাকেই আবর্তিত করে মনোজ, অধর, কালুরা উঠে এসেছে শাহজঙ্গলী, বনবিবির রূপ ধরে। মিথ ও উপকথার ঘূর্ণনে বারংবার বাস্তববৃত্তটি পাক খেয়েছে সারা উপন্যাস জুড়ে। যেমন, বিদ্রোহী মনোজের মধ্যে ঔপন্যাসিক দেখেন শাহজঙ্গলীর রূপ :

> 'সে ভাঁজকরা ঝাপটা নামানো থাকে, সেটা বাইরের থেকে তুলেছে মনোজ, তার গায়ে ওয়াটার প্রুফ, মাথায় টুপি, মুখময় দাড়ি, চকিত উদ্ভাসনে, বিদ্যুতের আলোয় এই মুখ, যা দেখে দুখে আপন মনে বলে ওঠে — জঙ্গলী শা।'[৪৬]

সমীর রক্ষিত মনোজ সত্তার মধ্যে এক লুকানো শক্তিকে খুঁজে পেয়েছেন, যা কঠিন বাস্তবের শোষণ-বৈষম্যকে ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজগঠনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠবে। জাদুবাস্তববাদী যেমন পারিপার্শ্বস্থ বাস্তবকে অনুসরণ না করে তার আড়াল থেকে রহস্যকে অনুধাবন করেন।'[৪৭] সমীর রক্ষিতের দুখে মনোজরা সেই পথকে বেছে নিয়েছে। ঔপন্যাসিক এভাবে বাস্তবকে ভাঙতে ভাঙতে আসল সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন। 'দুখের আখ্যান' তাই ম্যাজিক রিয়ালিজমেরই এক রূপ, বলা যায়।

ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশবাদী ও পরাবাস্তববাদী বর্ণনার যুগল সম্মিলন 'জলতিমির' (২০০২)। আটটি আপাত অসংলগ্ন ও গোলকধাঁধাঁময় ফ্রেমের অন্তর্বয়নে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞানতত্ত্ব, পরিবেশতত্ত্ব, আর্সেনিক দূষণের ভয়াবহতা, সেই সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ-রিরংসা ও রাজনৈতিক বৃত্তে গ্রামীণ জীবনের ওঠা-পড়ার কাহিনি। এসব কাহিনির পরিপূর্ণতাদানে অবলীলায় মিশ্রণ ঘটালেন অলৌকিকতা, বনবিবির মাহাত্ম্যকথা, মিথ, পুরাণ ও রূপকথার আদল। যেমন, দুটো গোধিকা হত্যার পর মালতীর উপলব্ধি :

> 'ওরা প্রাণী নয়, অন্য কেউ। হয়তো এই গ্রামটিকে রক্ষা করছিল ঢুকবার

> মুখে বাসা বেঁধে। দক্ষিণরায় যদি বাঘ হয়ে ভয় দেখাতে পারে, কেউ কী গোধিকার রূপ ধারণ করতে পারে না।'[৪৮]

বাস্তব ও কল্পনা, চকিত সময়বদলের নৈপুণ্য, সহসা চমকের উপাদান[৪৯] – ইত্যাকার ম্যাজিক রিয়ালিজমের বৈশিষ্ট্য সাধনের রচনায় লক্ষণীয়।

স্বপ্ন-কল্পনা-সংস্কার-কিংবদন্তি, বাস্তব-বাস্তবাতীত, রূপকথা, মিথ আর চিত্রকল্পময় ভাষার মিশ্রণে রচিত, সুন্দরবনের অতিবাস্তবের অন্তহীন উন্মোচন অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' (২০০৭)। যেখানে প্রকাশিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের নগ্ন চেহারা ও তারই বিরুদ্ধে চরবধূদের সংগ্রামচিন্ততা। এই বাস্তবাধিক বাস্তবের প্রকাশের অমর মিত্র সারামাগোর 'The Stone Raft', উপন্যাসের মতো এক কুহকি বাতাবরণ তৈরি করেছেন সারা উপন্যাস জুড়ে।

উপন্যাসের শুরুতে বাস্তব আর অবাস্তরের প্রচ্ছায়া। ধনপতির চরটি বাস্তব এবং কল্পলোকে মোড়া একটি ধূসর ভূমি –

> 'ঘোড়াদল থেকে সাড়ে ছয় লিগ দূরে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় কাছিমের পিঠের মতো ভেসে আছে ধনপতির চর। লোকে জানে কাছিমের পিঠ-ই। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন কূর্ম অবতার ঘুমিয়ে আছে বঙ্গোপসাগরের মোহনায়।'[৫০]

এই কাছিমের পিঠেই নুড়ি কাঁকর বালি পলি দিয়ে তৈরি হয়েছে চর। চর উৎপত্তির এই বাস্তব ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রাচীন কূর্ম অবতার 'কাছিম'এর সমন্বয়েই বাস্তব ও পরাবাস্তবের মিশেল রচনা করলেন ঔপন্যাসিক। আবারও পাঠককে পরিচিত হতে হয় অবাস্তব আখ্যানে –

> 'ধনপতির চর তো আর দাঁড়িয়ে নেই। চরভূমি প্রতিদিনই এক এক বিন্দু সরে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে ... একদিন নাকি ধনপতির চর থাকবে না।'[৫১]

এভাবেই ঔপন্যাসিক কুহকি বাতাবরণ তৈরি করে চমক লাগিয়েছেন। অথচ ধনপতির চরের পারিপার্শ্বস্থ – ঘোড়াদল, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, নামখানা – ইত্যাদি স্থান নাম অতিবাস্তব।

চরবাসীদের উৎখাত করে প্রশাসন যখন দখল নিতে আসে ধনপতির চর, তখন ধনেশ্বরী কুন্তিকে চর নিয়ে পলায়নের 'অলীক বেত্তান্ত' রচনা করতে হয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসন প্রতিহতকল্পে কুন্তিরা চর নিয়ে চলে যাবে – 'যে লিসবোঁয়ার গরমেন নেই' – সেইখানে। হয়ত চলেও গেছে। বিডিও অনিকেত সেনের কথায় তারই প্রতিধ্বনি :

> 'যে পুলিশ বাহিনি চরের দখল নিতে চলেছে আজ, তারা হয়ত খুঁজেও পাবে না ধনপতির চর। চর নিয়ে চলে গেছে চরবাসীরা।'[৫২]

চরের এই সঞ্চরণশীলতা গভীর দ্যোতনা আনে উপন্যাসে। কেননা, অসহায় চরবধূদের 'গরমেন'-ই আগ্রাসন থেকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দেবে চরের চলমানতা

ওরফে কূর্ম অবতার কাছিম সর্দার। তারা বাস্তব থেকে বাস্তবাতিতে পাড়ি দিতে চায়। কেননা সেখানে ধর্ষণকামী কোন রাষ্ট্র নেই – শ্রেণিহীন-শোষণহীন এক কল্পরাষ্ট্র - Utopia। যেখানে নারী ফিরে পাবে তার পূর্ণ স্বাধিকার।

আসলে ঔপন্যাসিক অমর মিত্র সুন্দরবনের কঠিন বাস্তব পাষাণভারকে কল্পনার হাতুড়ির ঘায়ে চূর্ণ করেছেন। তার অবিশ্বাস্য শব্দপ্রয়োগ (ইনকুমারি, গরমেন, নিস্পেকটর) ও বাক্যবন্ধন হয়ত ব্যাখ্যাতীত, কিন্তু তাতেই প্রকাশিত হয়েছে বস্তুবাদী প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্য সুর আর একুশ শতকীয় এক জ্বলন্ত সংকটের (ঔপনিবেশিক আগ্রাসন) ঝঙ্কার। নির্দিষ্ট কালখণ্ডকে অমর মিত্র প্রসারিত করে দেন হাজার বছরের ক্যালেণ্ডারে, এভাবেই। তাই 'ধনপতির চর' জাদুবাস্তবতারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

অর্থাৎ সুন্দরবন উপজীব্য এইসব পোস্টমডার্ন উপন্যাসে আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দু ও ভাষা প্রকাশের দড়িদড়ায় একটা অবয়বহীন আতঙ্ক সঞ্চারিত হলেও তা একেবারেই অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক নয়; বরং তাতে একটা 'সত্যকথন ও কাল্পনিক কর্মকর্তার (agency)[৫৩] প্রত্যক্ষ সংযোগ বিদ্যমান। - যা বাংলা উপন্যাসের একটি পোস্টমডার্ন আঙ্গিক-ম্যাজিক রিয়ালিজমেরই দ্যোতক। আটের দশকের পূর্বের লিখিয়েদের এ বস্তু দুর্লভ ছিল।

৫. কথা শেষ এবং...

নতুন প্রজন্ম কথাটি আপেক্ষিক। প্রতিমুহূর্তে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ডের ব্যবধানে সাংস্কৃতিক অভিরুচিরও পরিবর্তন হয়। শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি – সমূহ দিকের খোলসটা বদলে যায়। কেবল ধ্যান-ধারণা বা নীতি চিরকাল একটি স্থিরবিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকে না। মানুষের মনন, চিন্তা ও চেতনার রাজ্যের পরিসীমা বহুধা বিভক্ত হয়ে যায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আর এই বদল বৃত্তান্তের সাথে সাথে শিল্পীমানসও নতুন সৃষ্টিতে আঁকুপাঁকু করে। আজ যা সত্য, কাল তা অর্ধসত্য, পরশু তা মিথ্যে মনে হয়। কেননা, নতুন প্রজন্মের নতুন ভাবনা বিগত-এর মিথ্যাকে সত্য কিংবা সত্যকে চিরমিথ্যে জ্ঞান করে। সমাজ ও সংস্কৃতির অন্দরে এই ভাবনাই ক্রিয়াশীল। তাই শেষ কথা বলবে কে?

তবে এটুকু নির্দ্বিধায় বলা চলে, সুন্দরবনের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ক্রমশ বদলে গেছে। শুধু বদল নয়, সুন্দরবনের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন আজ সাংস্কৃতিক অভিঘাত ও যুগমানসের ধাক্কায় ক্রমশ জটিল হয়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রে প্রান্তিক মানুষের ধারণারও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তাই অনিবার্যভাবেই উপন্যাসে ভাবগত ও দর্শনগত এক ব্যবধান তৈরি হয়েছে। কেননা, গামছা গায়ে খোলা হাওয়া খাওয়ার পরিবর্তে সুন্দরবনের আধুনিক প্রজন্মের সকাল শুরু হয় কম্পিউটার,

ইন্টারনেট, ফেসবুকে মুখ দর্শন করে। দৈবনির্ভরতা, তন্ত্র-মন্ত্র—কুসংস্কারের পরিবর্তে নগর সভ্যতার ঢাল তলোয়ার তাদের নিত্যসঙ্গী। এককথায় আধুনিক গ্রামীণ সুন্দরবন বাংলার যে কোন প্রান্তিক অঞ্চলের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে হয়ত সুন্দরবনের স্বতন্ত্রতাও থাকবে না। তখন আবারও ভাবিকালের ঔপন্যাসিকদের নতুন দর্শন, নতুন অভিলাষ খাড়া করতে হবে। নতুন বয়ন, নতুন মনন, নতুন ভাষ্য রচনা করতে হবে। কেননা, আজ যা সত্য, কাল তা অর্ধসত্যের তক্‌মা নিয়ে বেঁচে থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে। ভাবনার বদল হলেও স্থির বিন্দুটির কি পরিবর্তন হবে সুন্দরবনের, এই জিজ্ঞাসা থেকে যায় আমাদের মনে!!

তথ্যসূত্র :

১. Tawhid Laskar, Generation Gap (a novel), Book Palace, H.N. Road, Panbazar, Guwahati, Assam, 2015.

২. তৌহিদ লস্কর আসামের এক Teenager novelist. Don Bosco High School থেকে ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। বর্তমানে আজমল কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত। এই তরুণ উদীয়মান ঔপন্যাসিক রচিত, 'Generation Gap' (২০১৫) নতুন প্রজন্মের আত্মসমীক্ষার কাহিনি।

৩. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯, পৃষ্ঠা – ১৬।

৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০০৪, পৃষ্ঠা – ১১৩।

৫. দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, দে'জ, কলকাতা, ২০০৬, পৃষ্ঠা – ৯০।

৬. রামেশ্বর শ', আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধপ্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ৯-১০।

৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা – ১৪।

৮. দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের কথা, ২য় জি.এ.ই সংস্করণ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা – ১৮।

৯. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১ম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ৯-১০।

১০. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১০ম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৪১৬, পৃষ্ঠা – ৪৭।

১১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ঐ, পৃষ্ঠা – ১৩৫।

১২. জীতেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, দে'জ, কলকাতা, ২য় পরিমার্জিত পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ২০।
১৩. তদেব, ঐ. পৃষ্ঠা – ২০।
১৪. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা – ১৫৫।
১৫. অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, রত্নাবলী, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৫, পৃষ্ঠা – ১৯২।
১৬. মনোজ বসু, ঝিলমিল, পৃষ্ঠা – ১৬৮।
১৭. মনোজ বসু, জলজঙ্গল, সুন্দরবন অমনিবাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৯, পৃষ্ঠা – ১০।
১৮. মনোজ বসু, বন কেটে বসত, সুন্দরবন অমনিবাস, ঐ পৃষ্ঠা – ২৩৭।
১৯. শিবশঙ্কর মিত্র, বনবিবি, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা – ১১১।
২০. তদেব, ঐ, ১৩২।
২১. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৮৩।
২২. শিবশঙ্কর মিত্র, বনবিবি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৬৭।
২৩. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ২৫৯।
২৪. অমল মিত্র, ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলনে শতবর্ষের আলোকে স্যার ড্যানিয়েল হেমিল্টন' – শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, সম্পাদনা – দেবপ্রসাদ জানা, দীপ প্রকাশন, ২০০৫, পৃষ্ঠা – ৬৮-৬৯।
২৫. সুভাষচন্দ্র সোম, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ১১।
২৬. মৃণালকান্তি ঘোষদস্তিদার, মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা – ১৫৮।
২৭. সাধন চট্টোপাধ্যায়, গহিন গাঙ, উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮, পৃষ্ঠা – ৪৪-৪৫।
২৮। সমীর রক্ষিত, দুখের আখ্যান, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা – ৮-৯।
২৯. তদেব, ঐ, পৃষ্ঠা – ৭৪।
৩০. ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, চরপূর্ণিমা, দে'জ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা – ৯০।
৩১. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম, 'ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও অমর মিত্রের চর আখ্যান : উপন্যাসের নতুন অভিমুখ', 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস : স্বতন্ত্র জীবনের ধারাভাষ্য', সম্পাদনা – শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম, অভিযান

পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা – ১৪৮।

৩২. অমর মিত্র, ধনপতির চর, দে'জ, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা – ১৩৭।

৩৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল, দে'জ, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা – ৩৭১।

৩৪. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা – ২৯৯।

৩৫. অমর মিত্র, ধনপতির চর, ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৩৫।

৩৬. তদেব, ঐ পৃষ্ঠা – ৩৮২।

৩৭. ড. সা'আদুল ইসলাম, 'ধনপতির চর : চরভূমির আদি অন্ত আগ্রাস ও আধিপত্যকামিতার রসায়ন', সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, ১ খণ্ড, ২০১১, পৃষ্ঠা – ১৮৯।

৩৮. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম, 'ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও অমর মিত্রের চর আখ্যান : উপন্যাসের নতুন অভিমুখ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৬৬।

৩৯. অমিতাভ ঘোষ, দি হাংরি টাইড, অনুবাদ – ভাটির দেশ, ভাষান্তর – অচিন্ত্যরূপ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ২০১০, ব্লার্বের ভূমিকাংশ।

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৬।

৪১. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৭।

৪২. Marx and Engels, Basic writing on politics and philosophy, edt. by – Lweis S. Feure, Garden City, Doubleday Anchor Books, 1959, page – 254.

৪৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, ঔপন্যাসের বিনির্মাণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৩৫।

৪৪. বিপ্লব মাজী, বাংলা উপন্যাস : ২০০ বছর, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা – ৩৮৩।

৪৫. রবিন পাল, উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন, অক্ষয় প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০১১, পৃষ্ঠা – ১৬৯।

৪৬. সমীর রক্ষিত, দুখের আখ্যান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৭৪।

৪৭. John Mellen, Magic Realism, Page – 1.

৪৮. সাধন চট্টোপাধ্যায়, জলতিমির, উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮, পৃষ্ঠা – ৪৪১।

৪৯. J.A. Cuddon, Dictionary of Literary terms and literary Theory, Doubleday and Company, Garden City, New York, 1976, page – 522.

৫০. অমর মিত্র, ধনপতির চর, দে'জ, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা – ৯।

৫১. তদেব, ঐ, পৃষ্ঠা – ৯।

৫২. তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৮৩।

৫৩. অমলকুমার ঘোষ, বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা – ১০।

....

প্রজন্ম ব্যবধানে দুই 'সাধারণ মেয়ে'

সুদীপ্তা চক্রবর্তী

সেদিন কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে বইপাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ-ই চোখ পড়ল একটা বই-এর ওপর। তরুণ বসুর 'ভিন্ন নারী অন্য স্বর'। পাতলা চটি বই। দামও খুব বেশি নয়। উল্টেপাল্টে দেখে বেশ ভালো লাগল। কিনেও ফেললাম। বাড়িতে এসে বইটা পড়তে গিয়ে দেখলাম এমন কিছু নারীর জীবনের করুণ গল্প আছে সেখানে, যেটা আপাত গল্প বলে মনে হলেও আসলে সেটা সত্যি। আজ সমাজে যাদের পরিচয় পতিতা বলে। দিনের বেলা ভদ্রবেশী কাপুরুষেরা যাদের দেখলে ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আর রাতে আবার তাদেরই শরণাপন্ন হয় জৈবিক চাহিদা পূরণের কারণে। এই নারীদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পুরুষের ভালোবাসায় প্রত্যাখ্যাতা, কিংবা সমাজের কাছে বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা। তবু তারা ভুলতে পারেনি তাদের প্রেমকে, তাদের ভালোবাসাকে। পরিণামে ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েই অনেক অভিমান আর যন্ত্রণাকে সঙ্গে করে আজ তারা নিজেদের সঁপে দিয়েছে চির অন্ধকারের হাতে। হয়তো তথাকথিত সমাজের বিরুদ্ধে এটাই তাদের নীরব প্রতিবাদ। সত্যিই তো, রোজ কত মেয়ে নারীত্বের বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে এভাবেই হারিয়ে যায় অজানার উদ্দেশ্যে। কে-ই বা তার খবর রাখে! মনে পরে গেল কবি জয় গোস্বামীর লেখা সেই দুটো পংক্তি –

> "তবু আগুন বেণীমাধব আগুন জ্বলে কই?
> কেমন হবে, আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই?"

নব্বই-এর দশকে কোনো এক পুরুষের প্রেমে বঞ্চিতা এক নারী এভাবেই গর্জে উঠেছে প্রতিবাদে। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে সমাজের কিছু সুবিধাবাদী পুরুষদের মুখের ওপর। তার ভালোবাসার উপেক্ষা, অবমাননা – এতো একঅর্থে তার নারীত্বেরই অপমান। প্রায় ছয় দশক আগে তিরিশের দশকে আরও এক সাধারণ মেয়ে, মালতীও প্রতিবাদ জানিয়েছিল তার ভালোবাসা তথা নারীত্বের অবমাননার। তবে ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন প্রকরণে। মেয়ে মানেই উপেক্ষার, অবহেলার, ঘৃণা করে দূরে ঠেলে রাখার – প্রজন্মান্তরে এমনই ধারণার নজির রেখেছে আমাদের সমাজ। আর মেয়েরাও যেন এই ধারণাতেই অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল এতকাল। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা হারিয়ে ফেলেছিল নিজেদের পরিচয়। ভুলে গিয়েছিল প্রতিবাদ

করতে। তারা মানতে শিখেছিল, বা বলা ভাল, জন্মের পর থেকেই তাদের মানতে বাধ্য করা হয়েছিল, শেখানো হয়েছিল, যে মেয়ে মানেই সমাজের জন্য সমাজেরই কাজে বলিপ্রদত্ত। যুগে যুগে তাই আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই-এ সীতার মতোই অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে তাদের বারবার। এটাই হয়ে উঠেছিল তাদের একমাত্র নিয়তি। ভাবতে অবাক লাগে, আজও পুরুষের কাছে শুধুই এক ভোগ্যপণ্যের উর্ধ্বে উঠতে পারল না নারীরা! আজও প্রতিমুহূর্তে সমাজের কিছু দুষ্টকীটের দংশন আর ধর্ষণ ছিন্নভিন্ন করে দেয় নারীকে। না, শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও। যে ক্ষতের কোনো প্রলেপ হয় না। টিভিতে, সংবাদপত্রে কিছু মানুষের সান্ত্বনা আর সহানুভূতিতেই অবসান হয়ে যায় সেই বিষাক্ত, যন্ত্রণাজর্জর অনুভূতির। শুনেছি, এখনও রাজস্থানের কোনো এক গ্রামে মেয়ে সন্তানের জন্ম হলেই নাকি তাকে মেরে ফেলা হয়! এরই নাম কি স্বাধীনতা? মানুষ কি সত্যি এতটাই নৃশংস!

সময় বদলেছে, বদলেছে জীবনের অভিজ্ঞান। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই-এ মেয়েরা আজ আর পিছিয়ে নেই। সমস্ত নির্যাতন, অবহেলা, অত্যাচার সহ্য করার পরিণতিতে আজ সে হয়ে উঠেছে যন্ত্রণার মূর্তিমতী প্রতিমা। প্রতিবাদে ঋজু চিন্ময়ী প্রতিমার ভাস্কর্য আজ নারীর সমগ্র দেহে, তার চাল-চলনে। কি সমাজে, কি বাড়িতে – সর্বত্রই আজ নারী পুরুষের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে চলার প্রয়াসী। আজ তারা প্রত্যেকেই নিজের পরিচয়ে পরিচিত। কেউ শিক্ষিকা, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অ্যাস্ট্রোনট আবার কেউ বা পৃথিবী বিখ্যাত খেলোয়াড়। এই পরিচয়েই তার নারীত্বের সম্মান। নিজের পরিচয় তৈরি করার দৌড়ে আজ পিছিয়ে নেই গৃহবধূরাও। 'বোকাবাক্স'-র দৌলতে আজ তারাও 'পাড়ার সেরা বৌঠান' কিংবা 'দিদি নম্বর 1', কিংবা 'গোয়েন্দা গিন্নি'। গোটা পৃথিবী তাদের চেয়ে এক একজন 'ধন্যিমেয়ে'র পরিচয়ে। অমুকের মেয়ে বা অমুকের স্ত্রী নয়, নিজের পরিচয়েই আজ তারা অনন্যা। তাদেরই সম্মানার্থে এখন পালিত হয় বিশ্বনারী দিবস। শত নির্যাতনেও মেয়েরা আর হেরে যাবে না, মরে যাবে না – এ তো আজকের দশকের প্রমাণিত সত্য। সাধারণ থেকে অসাধারণত্বে উত্তরণের লড়াই-এ আজ তারা এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে।

কিন্তু মেয়েদের জন্য এই লড়াইটা খুব সহজ ছিল না। শুধু মুখে নয়, কাজের মধ্যদিয়েও প্রয়োজন ছিল প্রতিবাদের, যে সমাজ নারীদের অবহেলায়, অনাদরে পিছে ফেলে রেখেছে, প্রতিবাদ জাগতে হবে সেই সমাজের জঠর থেকে। আর সাহিত্য যেহেতু সমাজের আরশি তাই সাহিত্য-ও একঅর্থে প্রতিবাদের হাতিয়ার। স্বভাবতই সাহিত্যও পিছিয়ে থাকেনি একাজে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে উঠে এসেছিল সেই প্রতিবাদ, অবলা নারীর আঁতের কথা। একবার নয়, বারবার। যেমন, বাইশ বছর ধরে 'রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা' – সংসারের এই একচাকাতেই বাঁধা ছিল 'মুক্তি' কবিতার মেয়েটি। এর বাইরে অন্য

কোনো পরিচয় ছিল না তার। স্বপ্ন-সখ-আহ্লাদ-ভালোবাসা সবই হারিয়ে গিয়েছিল জীবনপথের অদৃশ্য কোনো বাঁকে। হারিয়ে গিয়েছিল তার নিজের আত্মপরিচয়। তাই মরণরূপী বসন্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবার সে মুক্তি পেতে চেয়েছে। খুঁজে নিতে চেয়েছে তার জীবনের পূর্ণতাকে, তার নারীত্বের পরিচয়কে –

"মধুর ভুবন মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী,
দাও খুলে দাও দ্বার –
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।।"

(মুক্তি : পলাতকা)

সময়ের সাথে সাথে বদলে যায় মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি-মনন-চিন্তন চিরাচরিত মূল্যবোধ। তাই 'পলাতকা' কাব্যের গৃহবধূটি 'পুনশ্চ' এসে বদলে যায় অনেকটা। বদলে যায় তার প্রতিবাদের ধরন। প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে মৃত্যুর পথ বেছে নেয় না। বরং সেই যন্ত্রণাই তাকে শক্তি জোগায় রুখে দাঁড়াবার। তার চেতনায় বইয়ে দেয় অগ্নিপ্লাবী প্রতিবাদের রক্তস্রোত। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটি সেইরকমই এক সামান্য মেয়ের গল্প যে প্রত্যাখ্যানের পরেও ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছে। সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছে তার আত্মপরচিয়। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ লেখা 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটি মূলত মালতী নামের একটি সাধারণ মেয়ের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার গল্প। যে তার অকৃত্রিম ভালোবাসার মধ্যেই খুঁজে নিতে চেয়েছে তার নিজের পরিচয়। অন্তঃপুরের এক অচেনা অপরিচিত মেয়ে এই মালতী। যে সাহিত্যের ভাষায় জ্বলে উঠতে চেয়েছে চিরপরিচয়ের আলোকে।

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন –

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না" –

চাওয়া আর পাওয়া, সাধ আর সাধ্যের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব চিরকালীন। 'পুনশ্চ'-এর 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটি সেই সাধ আর সাধ্য, চাওয়া আর পাওয়ার দ্বন্দ্বেরই এক ভিন্ন প্রকরণ। কবিতার নায়িকার নাম মালতী। অত্যন্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে সে, বয়সও তার বেশি নয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই তার এই কচি যৌবন মায়া ধরিয়েছিল একজন পুরুষের চোখে-মনে। প্রেমের ফাঁদ পাতা এই ভুবনে প্রেমের মায়া আচ্ছন্ন করেছিল মালতীকেও। বসন্তের আগমনে তারও নবযৌবনে লেগেছিল ভালোবাসার পরশ। আর সেই ভালোবাসার জাদু ভুলিয়ে দিয়েছিল সাধারণ মেয়ের অতি সাধারণত্বকেও –

"একজনের মন ছুঁয়েছিল

আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে –
ভুলে গিয়েছিলেম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি',

সে আরও ভুলে গিয়েছিল তার মতো হাজার হাজার মেয়ে আছে এই বাংলাদেশের বুকে – 'অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে'। কিন্তু সে জানত না ঐ অল্প বয়সের চটকেরই শুধু দাম আছে পুরুষের কাছে, কিন্তু দাম নেই আন্তরিক ভালোবাসার। সম্মান নেই নারীর নারীত্বের। অধিকাংশ পুরুষই নারীর অন্তরে লুকিয়ে থাকা সত্য নারীত্বের খোঁজ রাখে না, জানতে চায়না তাদের স্বভাবের গভীরে থাকা অসাধারণত্বের কথা। তাই মালতীর মতো সাধারণীরাও বিকিয়ে যায় মরীচিকার দামে।

মালতীর জীবনেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তার জীবনেও বসন্ত স্থায়ী হয়নি বেশিদিন। একদিন যে নরেশ অজানা কোনো কারণে মালতীকে বরণ করে নিয়েছিল ভালোবেসে – সে-ই আজ প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছে চিরতরে! বিলেতে সুন্দরী লিজিদের মায়ায় আবার নতুন করে ভুলেছে সে। প্রত্যাখ্যাতা মালতীর মন হয়তো দেবযানীর মতই বলে –

'কোথা হতে এলে তুমি নির্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দুই দণ্ড অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন
ছিন্ন ক'রে নিয়ে, মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে; যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুইভাগ ক'রে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে! লুটাইল ধূলি – 'পরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা!' ('বিদায় অভিশাপ')

নরেশের মতো পুরুষদের কাছে মেয়েরা কোনো অবসর বিকেলে সময়কাটানোর নিছক উপকরণ একঠোঙা পপকর্নের মতো। যৌবনের মায়া কেটে গেলেই একরাশ সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে যাদের উড়িয়ে দেওয়া চলে। নারীহৃদয়ের গোপনে সযত্ন-লালিত অকৃত্রিম ভালোবাসার চেয়ে যৌবনের বনে বসে কিছু মিথ্যে আশ্বাসের মধুপানের লোভ অনেক বেশি প্রিয় এই নরেশদের কাছে। তাই লিজির ফাঁপা হৃদয়ের প্রণয়ভরা কথা মিথ্যে হলেও নরেশের কাছে সেটাই সত্যি। মালতীকে চিঠিতে সে সেকথাই জানিয়ে লিখেছে –

"কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কি,
কিন্তু চমৎকার – "

হীরে বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়?"

এরপরই বদলে যায় মালতীর ভাবনা-চেতনার জগৎ। না, দেবযানীর মতো সে তার প্রেমাস্পদকে কোনো অভিশাপে বিদ্ধ করেনি। বরং ভালোবাসার ব্যর্থতায়, প্রত্যাখ্যানের প্রতিবাদে একজন সাধারণ মেয়ে হিসাবে মালতী খুঁজে নিতে চেয়েছে তার নারীত্বের পরিচয়। সেই পরিচয়কে সিঁড়ি করে সে পৌঁছাতে চেয়েছে অসাধারণত্বের চূড়ান্ত সীমায়। নরেশের মতো পুরুষেরা যে সীমায় পৌঁছুতে পারবে না কোনোদিন। শুধু দূর থেকে অনেক মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে দেখবে এক সাধারণ মেয়ের অসামান্য প্রতিভার উজ্জ্বল প্রকাশকে।

মালতী বুঝতে পেরেছিল বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে ভালোবাসার দৌড়ে তার মতো সাধারণ মেয়েরা বারেবারে প্রত্যাখ্যাত হবে নরেশদের কাছে, হেরে যাবে লিজিদের সাথে প্রতিযোগিতায়। রাতের গভীর অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে পরমকরুণাময়ের কাছে হৃদয়ের যেসব অসম্ভব ইচ্ছার কথা মালতীরা জানায়, তা কোনোদিনই বাস্তবায়িত হবার নয়। আর তা বুঝেই মালতী দ্বারস্থ হয় বাস্তববাদী লেখক শরৎচন্দ্রের। তাঁকে লিখতে বলে সেইসব 'মালতী'দের কথা, যারা –

"..সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।"

বাস্তবে হেরে গেলেও লেখনীর স্পর্শে তারা জয়ী হতে চেয়েছে চিরতরে। শরৎবাবুকে মালতী তাই অনুরোধ করেছে, তাঁর নায়িকা যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে সেইসব অসম্ভব বরলাভ করে। আর পরিণামে যেন তিনি তাঁর নায়িকাকে জিতিয়ে দেন। একদিকে লন্ডনে নরেশ বছর বছর ফেল করবে, অন্যদিকে তখন শরৎচন্দ্রের মালতী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে লাভ করবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সম্মান। এরপরই লেখকের লেখনীর ছোঁয়ায় সে পাড়ি জমাবে ইউরোপে – যেখানে হাজার হাজার বিদ্বান জ্ঞানী বিশ্বজয়ীর ভিড়েও সবাই তাকে চিনে নেবে – আবিষ্কার করবে নতুনভাবে, নতুনরূপে। না,

"শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে;
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য – মূঢ়ের দেশে নয় –
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ, জর্মান, ফরাসি।"

আর সেই বিশ্ববিজয়ীদের বিরাট সভায় নরেশ আর তার অসামান্য মেয়ের দল দাঁড়াবে এসে এককোণে। দূর থেকে দেখবে আর অবাক হবে আপন নারীত্বের বিভায় ভাস্বর মালতীকে দেখে। এই সেই মালতী, যাকে একদিন সে 'বাসি ফুলের মালা'র মতো ফেলে এসেছিল। সে আরও দেখবে –

"ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে — "

হোক না কল্পনা, হোক না স্বপ্ন। তবু তাতেই তো মালতী জিতবে। জিতবে তার নারীত্ব। গোটা দুনিয়া তাকে চিনবে একজন নারীর পরিচয়ে। আর এখানেই তার জয়, তার নারীত্বের চরম সার্থকতা।

সমস্ত কবিতা টি জুড়ে বাংলাদেশের প্রেমে বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা এক সাধারণ মেয়ে এভাবেই সাহিত্যে, কল্পনায়, স্বপ্নে জানিয়েছে প্রতিবাদ। খুঁজে নিতে চেয়েছে বিশ্ববাসীর চোখে বিশেষত পুরুষের চোখে নিজের আত্মপরিচয়। কিন্তু কবিতার একেবারে শেষে এসে যখন ফুরিয়ে গেছে তার স্বপ্ন, লঘু হয়ে গেছে কল্পনা তখন সে পুনরায় নেমে এসেছে বাস্তবের নির্মম রুক্ষ মাটিতে। নিজেকে সে আবারও বেঁধে ফেলেছে সামান্যতার গণ্ডীতে। সেখানে হয়তো মালতীর সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কিছুটা হলেও যুগগত দোলাচলতা কাজ করেছে। মালতীর বর্তমান পরিচয়ে ফুটে ওঠা তার নিরুপায়তার আর্তি কবিতার শেষে সেই দোলাচলতাকেই স্পষ্ট করেছে –

"হায় রে সামান্য মেয়ে,
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়।"

এখানেই আলাদা হয়ে গেছে প্রায় ছয় দশক পরের এক নারী। তিরিশের দশক থেকে নব্বই-এর দশকের বিস্তৃত এই কালপরিসরে প্রজন্মব্যবধানে বদল ঘটে গেছে নারীর মনস্তত্ত্ব, তাদের ভাবনা-চিন্তার গতিবিধি। তাই সবকিছুকে ভাগ্যের নিরুপায়তা বলে কিংবা সবকিছুর ওপর বিধির বিধানের লেবেল সেঁটে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি আজকের প্রজন্মের নারী। বরং নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে লিখেছে সে। তৈরি করেছে বাস্তবে, তার আত্মপরিচয়। নিজের নারীত্বের প্রতি এটাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এই নারী 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ে'র 'সেলাই দিদিমণি'। এটাই তার পরিচয়। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত জয় গোস্বামীর অন্যতম বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো'-র একটি বিখ্যাত কবিতা এই 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' মালতীর নামের অনুষঙ্গে হোক বা না হোক, এই কবিতাও মূলত এক সাধারণ মেয়েরই গল্প। লক্ষ করার বিষয় বিদ্যালয়টি বালিকাদের, ভবিষ্যতে যারা হবে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির কারিগর। সেই অখ্যাত বিদ্যালয়ের এক অখ্যাত সেলাই দিদিমণি এই কবিতার নায়িকা। সম্পূর্ণ কবিতায় কোথাও নাম নেই সেই বঞ্চিতা মেয়েটির। সাধারণ বলেই কি তার নামের কোনো প্রয়োজন নেই? নাকি সব সাধারণ মেয়েরই প্রতিনিধি সে। তাই নির্দিষ্ট কোনো নামের গণ্ডীতে বাঁধা যায় না তাদের? 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' বস্তুত তথাকথিত সমাজের বিরুদ্ধে এক বঞ্চিতা নারীর চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ সেইসব হ্যাট-কোট-বুট পরা বেণীমাধবদের বিরুদ্ধে, সাদা চামড়ার ভিতরে লুকিয়ে আছে যাদের

দাঁত-নখ বের করা এক কুৎসিত বীভৎস রূপ। চ্যালেঞ্জ সেইসব বেণীমাধবদের বিরুদ্ধে, যাদের ভালোবেসে ব্যর্থ, অবহেলিতা মেয়েরা একসময়ে হারিয়ে যায় অন্ধকার চোরাগলির পথে। তারপর প্রতিরাতে হাতে হাতে বদলানোটাই হয়ে যায় যাদের একমাত্র নিয়তি।

অখ্যাত সেই সেলাই দিদিমণিরও প্রথম যৌবনে এসেছিল প্রেম। সেই ভালোবাসার নাম, সেই প্রেমের নাম বেণীমাধব। আজকের 'সেলাই দিদিমণি, সেদিন সবেই নবম শ্রেণির ছাত্রী। সদ্যপ্রস্ফুটিত সেই যৌবনের কোনো একদিন বান্ধবী সুলেখার বাড়িতে তার সাথে আলাপ হয়েছিল শহর থেকে বেড়াতে আসা সদ্যযুবক বেণীমাধবের। সবদিক থেকেই বেণীমাধবের জায়গা সেলাই দিদিমণির থেকে অনেক উঁচুতে। বেণীমাধব লেখাপড়ায় ভালো। তার ওপর আবার থাকে শহরে, অন্যদিকে খুব সাধারণ সেলাইদিদিমণির বাবা কাজ করে দোকানে। তার ওপর আবার সেলাইদিদিমণির গায়ের রঙ-ও কালো। অর্থাৎ নিতান্তই সাধারণ ঘরের এই মেয়েটির চেহারাও নিতান্তই সাধারণ। পুরুষের মন আকর্ষণের সহজ চটকদারিত্ব তার চেহারায় নেই। আর তা স্বীকার করতেও কোনো কুণ্ঠা নেই তার। তবে প্রেম তো অন্ধ। পাত্র-পাত্রী বিচার সে করেনা কখনো। তাই এত অসমতা সত্ত্বেও –

"কুঞ্জে অলি গুঞ্জে তবু ফুটেছে মঞ্জরী
সন্ধেবেলা পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করি
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন ষোলো
ব্রীজের ধারে, বেণীমাধব লুকিয়ে দেখা হলো"

এসবই তো প্রথমবার প্রেমে পড়ার লক্ষণ! এও বোঝা যায়, বেণীমাধবের মনেও ধরেছিল প্রেমের রঙিন নেশা। প্রথম প্রেম, চোখে রঙিন স্বপ্ন। মনে মোহের আচ্ছন্নতা। জগৎ ভুলে শুধুই সুখস্বপ্নের তরঙ্গে দুটি মনের ভেসে চলা! কিন্তু এই স্বপ্নসুখ তো বাস্তব নয়। বাস্তব যে বড় কঠিন, নির্মম। তাই খুব সহজেই স্বপ্নভঙ্গ হয় সেলাই দিদিমণির। বাস্তবের রূঢ় মাটিতে আঁছড়ে পড়ে সে। না, আজ আর সে বেণীমাধবের প্রেমিকা নয়! আর এটাই বাস্তব, এটাই সত্য। অথচ এই বেণীমাধবই তো সেলাইদিদিমণিকে একদা ভালোবেসে টেনে নিয়েছিল কাছে –

"আপনি করিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে
লেগেছে কি ভালো, হে জীবননাথ,
আমার রজনী, আমার প্রভাত –
আমার নর্ম, আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে?" (জীবনদেবতা : চিত্রা)

আর আজ তা অতীত। এখান থেকে ফিরে গিয়ে হয়তো বেণীমাধব ভুলেই গেছে তাকে। আজ তাই তার পাশে নতুন এক সঙ্গিনী। এবার কিন্তু সে মানানসই।

নতুন সঙ্গিনী হয়তো জানেই না এক অখ্যাত 'কালো মেয়ে'র এই করুণ প্রেমের কাহিনি। সে হয়তো জানেই না তার আজকের প্রেমিক একদিন তারই মতো

অন্য একটি মেয়ের ভালোবাসায় মগ্ন হয়েছিল। রূপের ঝলক না থাকলেও ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠদান একবুক ভালোবাসা ছিল যার কাছে। কথা দিয়েছিল হয়তো তাকেও। সাথে চলার, পাশে থাকার। তাই খুব স্বাভাবিক বেণীমাধবের পূর্বপ্রেমিকার এই প্রশ্ন –

"বেণীমাধব, বেণীমাধব, এতদিনের পরে
সত্যি বলো, সেসব কথা এখনো মনে পড়ে?
সেসব কথা বলেছো তুমি তোমার প্রেমিকাকে?"

ভালোবাসা যদি একদিকে ত্যাগের নামান্তর হয়, তবে অন্যদিকে তা হয় অত্যন্ত Possessive। বেণীমাধবের প্রতি সেলাই দিদিমণির ভালোবাসা ছিল নিখাদ সত্য। তাই এতদিন পরেও তার প্রথম প্রেমকে সে ভুলতে পারেনি। বরণ করে নিতে পারেনি অন্যকোনো পুরুষকে নিজের জীবনসঙ্গী হিসাবে। কিন্তু তবুও এ যে মানুষের মন! তাই ঈপ্সিতকে না পাওয়ার নিদারুণ যন্ত্রণা হয়তো কখনো জলের বদলে চোখে আনে আগুনের লেলিহান শিখা –

"আমি কেবল একটি দিন তোমার পাশে তাকে
দেখেছিলাম আলোর নীচে : অপূর্ব সে আলো!
স্বীকার করি, দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো
জুড়িয়ে দিলো চোখ আমার, পুড়িয়ে দিলো চোখ
বাড়িতে এসে বলেছিলাম, ওদের ভালো হোক!"

এই আলো ভালোবাসার আলো। যা বেণীমাধব আর তার নতুন প্রেমিকাকে হয়তো উজ্জ্বল করে তুলেছিল। কিন্তু পুড়িয়ে দিয়েছিল সেলাই দিদিমণির হৃদয়। আর তারই জ্বালা থেকে তার চোখে জ্বলে উঠেছিল আগুন।

এখন তার পরিচিতি পাড়ার সেলাই দিদিমণি বলে। অনেককিছু হারিয়ে, অনেক বঞ্চনা, অনেক প্রত্যাখ্যানের পথ পেরিয়ে এইটুকুই আজ তার পাওনা। আজ সে নিজের পরিচয়ের আলোয় উজ্জ্বল। এই আত্মপরিচয়ই তাকে জুগিয়েছে জীবনসংগ্রামের শক্তি, দিয়েছে প্রতিবাদের অসীম সাহস। জীবনযাত্রা আজও তার প্রথমদিনের মতোই অতিসাধারণ। খাটে শোয়ার বিলাসিতা আজো তার জীবনকে ভারাক্রান্ত করেনি কোথাও। হৃদয় তার ভালোবাসায় পূর্ণ হলেও চাঁদের জ্যোৎস্না আর আজ তাতে নেশা ধরায় না। ভালোবাসায় বঞ্চনা, যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে সেই মন আজ হয়ে উঠেছে কঠোর বাস্তবের উপযোগী। তার আজকের বর্তমান হয়তো কালকের ভবিষ্যত জানে না, হয়তো তার দিনান্তে পান্তা ফুরায়; তবু সেলাই দিদিমণির পরিচয়ই আজ তার হেতালের লাঠি –

"আজ জুটেছে, কাল কী হবে? – কালের ঘরে শনি
আমি এখন এই পাড়ায় সেলাই দিদিমণি –"

সে দেখেছে, কাউকে ভালোবেসে তার পরের বোন মিলিয়ে গেছে চোরাপথের বাঁকে। তার খবর আজ আর রাখে না কেউ। ভালোবাসা তার পথে আলো বিছিয়ে

দেয়নি, বরং তার ভবিষ্যতকে ঠেলে দিয়েছে এমন এক নিবিড় অন্ধকারের দেশে – যেখানে রাতের শেষে কোথাও কোনো নতুন সূর্য পথ দেখায় না। তার স্বচ্ছ আলো জীবনকে ভরে তোলে না কখনো –

"আমার পরে যে-বোন ছিলো চোরাপথের বাঁকে
মিলিয়ে গেছে, জানি না আজ কার সঙ্গে থাকে – "

নারীর উপর নারীত্বের উপর এত অত্যাচার, এত অন্যায়ের পরও সমাজের মুখে কুলুপ! সেলাই দিদিমণিও কি আপাত নখদন্তহীন এই সমাজের বদল ঘটাতে পেরেছে? পারেনি। তবে সে থেমে থাকেনি। চ্যালেঞ্জ করতে পিছপা হয়নি। সে একা এই কীটদংশিত ঘুণধরা সমাজের কাঠামোকে বদলাতে পারবে না জেনেও প্রতিবাদের রাস্তাটা দেখাতে ভোলেনি। কবিতার শেষ পংক্তিতে সেই চ্যালেঞ্জেরই প্রতিচ্ছবি – বেণীমাধবের মতো ভদ্রবেশী পুরুষ তথা সভ্যতার খোলসপরা অমানবিক নির্দয় নির্মম এই সমাজের বিরুদ্ধে –

"তবু আগুন, বেণীমাধব, আগুন জ্বলে কই?
কেমন হবে, আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই?"

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আমরা পেরিয়ে এসেছি অনেকগুলি প্রজন্ম। সভ্যতাও থেমে থাকেনি কোথাও। পরাধীনতার যন্ত্রণাযুগ পেরিয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। এসেছে টেলিভিশন, নিত্যনতুন তথ্যপ্রযুক্তি। কিন্তু নারী? তার স্বাধীনতা, তার মর্যাদা এসব কি আজও 'মিথ্যে বুলি'ই হয়ে থাকবে? মাটি থেকে ছ'ফুট উঁচুতে বাঁধা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দেওয়া কিছু ভাষণের মধ্যেই আটকে থাকবে? সেই পুরাণের যুগ থেকে সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা-রা যে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে এসেছে বারবার, স্বাধীনতার এতগুলো প্রজন্ম পেরোনোর পর আজও কি তার সত্যিই অবসান ঘটেছে? না, নারীর মুক্তি, তার নারীত্বের সম্মান আজও অধরা। তাইতো, আজও শেষ হয়নি তার ওপর অত্যাচারের, বঞ্চনার, প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস রচনা! তবে কি নারীর জন্য সমাজ আর তার তথাকথিত বিচার অহল্যার মতোই পাষাণপ্রতিম? পুরাণের অহল্যা প্রাণ ফিরে পেয়েছিল রামের পাদস্পর্শে। আর প্রজন্মব্যবধানে অহল্যারূপী সমাজ পুনর্বার প্রাণ ফিরে পাবে নারীর পুনর্জাগরণে। নিজেদের লড়াই লড়তে হবে তাদের নিজেদের। কারণ নারী-ই তো ধাত্রী এই সমাজের, এই সভ্যতার। তার জঠরেই তো জন্ম নেবে নতুন প্রজন্ম। তাই তারই হাত ধরে পরিশ্রুত হবে উত্তরপ্রজন্ম। সৃষ্টি হবে নতুন সমাজ। যে সমাজে নারীর জন্য থাকবে না শুধুই অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন, থাকবে না টেলিভিশন কিংবা সংবাদপত্রে তার বঞ্চনার আর অত্যাচারের খতিয়ান। সেই নতুন সমাজে এই মানহারা মানবীরা পাবে মহীয়সীর সম্মান। বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার মতোই নতুন প্রজন্মের নারী সেদিন চিহ্নিত করে দেবে সমাজের বুকে তাদের নারীত্বের পরিচয় –

"দেবী নহী, নহি আমি সামান্যা রমণী।

পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

(চিত্রাঙ্গদা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গ্রন্থপঞ্জী :

১. ভিন্ন নারী অন্য স্বর, তরুণ বসু, দুর্বার প্রকাশনী।
২. চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী।
৩. সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪. দর্পণে রবীন্দ্র কবিতা, অশোককুমার মিশ্র।

....

চন্দন সেনের নাটক 'অনিকেত সন্ধ্যা' : প্রজন্ম ব্যবধানের অনিবার্য শিল্পায়ন

সন্তোষকুমার মণ্ডল

'অনিকেত সন্ধ্যা' নাটকে চন্দন সেন মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনকে চারটি প্রজন্ম-এ ব্যাপ্ত করে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। নবীন প্রজন্মের প্রতিভূ প্রীতমকুমার মুখার্জী ওরফে পাপু স্কুল বয়, বয়স সাত-আট বছরের বেশি নয়। নাট্যকার স্পষ্ট করে বয়স উল্লেখ না করলেও স্প্রিং রিডার-এর মধ্যে কমিকস্-এর বই রেখে লুকিয়ে পড়া কিংবা বাবার কাছে জানতে চাওয়া – 'মা তোমার কে হয় বাপি?' ইত্যাদি ঘটনা ও সংলাপের মধ্যদিয়ে তার অপরিণত বয়সের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ঐ পরিবারের প্রবীণতম প্রজন্ম পাপুর ঠাকুরদার পিতা ভীষ্মদেব মুখার্জী ওরফে গ্র্যান্ডি বয়স সাতাশি। মাঝখানে আরো দুটি প্রজন্ম। পাপুর ঠাকুরদা কর্ণদেব ওরফে দাদাই, বয়স একষট্টি বছর এবং তার বাবা-মা প্রিয়তোষ ও মালবিকা – মধ্য তিরিশে দাঁড়িয়ে। সাত থেকে সাতাশি এই আশি বছরের ব্যবধানে চারটি প্রজন্মের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক ও তার সঙ্কটকে শিল্পরূপ দান করেছেন নাট্যকার।

চার প্রজন্মের এই সংসারে রোজগেরে দম্পতি প্রিয়তোষ ও মালবিকা ভারকেন্দ্র অবস্থান করে। তাদের সন্তান প্রীতম নাবালক মাত্র। আর প্রবীণ দুই প্রজন্ম প্রিয়তোষের পিতা কর্ণদেব অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তবে বেঁচে থাকার জন্য আর্থিক নির্ভরতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রবীণতম ভীষ্মদেব পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। বেঁচে থাকার জন্য অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সত্তর বছর বয়সে তার পত্নী বিয়োগ ঘটে। তারপর দীর্ঘ সতের বছর ধরে একাকীত্বের জীবন যাপন করে চলেছেন। বয়সের গোঁ তাঁকে আরো বিচ্ছিন্ন করেছে। একমাত্র সন্তান কর্ণদেবও বিপত্নীক। স্ত্রী নীলিমা সাত বছর হল ছেড়ে গেছে। সঙ্গীতজ্ঞের জীবন আবেগসর্বস্ব তাই সতের বছরেও ভীষ্মদেব অর্ধাঙ্গিনীর অভাব অনুভব করেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রাজ্ঞ; সামঞ্জস্যপূর্ণ। চুয়ান্নতে পত্নী চলে যাওয়ায় একটু কষ্ট হলেও বোঝেন – জীবন অনেক বড় – 'তোমারে বাদ দিয়েও দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।' তবে কর্ণদেবের প্রতি সম্পূর্ণ ও প্রীতমের প্রতি ভীষ্মদেবের আংশিক নির্ভরতা গড়ে উঠেছে। এদের স্নেহে, ভালোবাসায় সাহচর্যে প্রাণের স্ফূর্তি খুঁজে পান। কিন্তু সংসারের অন্যান্য সদস্য প্রিয়তোষ, মালবিকা কিংবা চাকর অর্জুনের সাহচর্য তিনি পছন্দ করেন না।

তাদের বহু সাধাসাধিতেও তাদের হাতে খান না। অনাহারে দিন কাটিয়ে দেন। ভীষ্মদেবের এই আচরণ পারিবারিক সংকটকে অনিবার্য করে তোলে।

রক্তের সম্পর্ক পরিবার গড়ে না, গড়ে দায়বদ্ধতা। মানবিক সম্পর্কই পরিবার গঠনের মূলভিত্তি। পরিবার স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের মধ্যে সীমায়িত নয়। তা যেমন অঙ্গীভূত করে নেয় পূর্ববর্তী প্রজন্মকে, তেমনি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারে। এমনকি বাড়ির ঝি-চাকরও সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়, যদি অর্থ ও শ্রমের সম্পর্ক সরিয়ে তা মানবিক হয়ে ওঠে। একটি পরিবারের মর্ম কথাই হল – 'আয় ভাই ... আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।' মুখার্জ্জী পরিবারে এই পারিবারিক বন্ধনে কোন ফাঁক ছিল না। সকলেই প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও পরিবার থেকে বিদায় নিতে হল দুই প্রবীণ সদস্যকে – বৃদ্ধাশ্রমে। এই অনিবার্য বিয়োগান্তিক পরিণামের একমাত্র ভিলেন – সময়। সময়ই সম্পর্ক ভাঙা-গড়ার নিয়ামক শক্তি।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে পাঠরত পাপুর ঘোর ভাঙে পিতা প্রিয়তোষের প্রশ্নে – 'পাপু তোমার পুজো ভ্যাকেসন শেষ হচ্ছে কবে খেয়াল আছে? কবে?' এ প্রশ্নের নেপথ্যে জিজ্ঞাস্য যাই থাক; উদ্দেশ্যে – খুব মনযোগ দিয়ে স্প্রিং রিডারের মধ্যে লুকিয়ে কমিক্স্ বই পড়াটা ধরে ফেলা। তাকে প্রত্যক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করে না, বরং মামের হাত থেকে রক্ষা করতেই বইটা চেয়ে নেয় এবং দুপুরে মাম যখন অফিসে, তখন পড়ার কথা বলে। জোর করে পাঠ্য বইয়ের মধ্যে সন্তানকে ঠেসে রাখাটা এ প্রজন্মের বাবা-মার স্বাভাবিক প্রবণতা হলেও যাদের মধ্যে উদার ও ব্যতিক্রমী প্রয়াস দেখা যায়, প্রিয়তোষ তাদের মধ্যে একজন। মা মালবিকা কিন্তু আর পাঁচটা মায়ের থেকে অভিন্ন নয়।

এ প্রজন্মের বাবা-মায়েরা সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামেই পড়াতে চান। কারণ ইংরেজিটা ভালো জানলে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় যেমন সুবিধা পাওয়া যায়, তেমনি বিশ্বের সর্বত্রই তার কর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠার কোন বাধা থাকে না। যেখানে বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীরা ভাষাগত সীমাবদ্ধতার কারণেই প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারে না। বাংলা মিডিয়ামের এই সীমাবদ্ধতা ও ইংলিশ মিডিয়ামের সর্বত্রগামিতা সম্পর্কে সচেতন প্রিয়তোষ অনেকটা গর্ব করেই পাপুকে বলে – "ইংলিশ মিডিয়াম-এ পড়তে পড়তে তুমি যেমন বাংলা এখনো ভালো করে রপ্ত করতে পারোনি, তেমনি লুকিয়ে পড়াটাও রপ্ত হয়নি" – বাংলা যেহেতু কাজের ভাষা নয়, তা রপ্ত করতে না পারাটায় খুব বেশি ক্ষতি নেই, কেননা সেটা ভবিষ্যতে তেমন কাজে আসবে না। লুকিয়ে বই পড়াটা বিশেষ করে বাঙালি সাহিত্যিকদের সকলেরই প্রায় অভিজ্ঞতায় সত্য। পাঠ্যবই পড়ে বা মুখস্ত করে কেউ লেখক হয় না। পাঠ্যবইয়ের বাইরে পাঠকের ভালো লাগা বই-এর যে সমুদ্র রয়েছে সেখানে সাঁতার কাটতে না পারলে লিখবার রসদ সংগ্রহ করা যায় না। ইংলিশ মিডিয়ামের

পঠনপাঠনে কেরিয়ারিস্ট হওয়া ছাড়া আর কোন লক্ষ্য থাকে না। বাবা-মাও সন্তানের পেছনে এত এত টাকা খরচ করেন সন্তানকে 'কেরিয়ারিস্ট' দেখতে চান বলেই। ভোগবাদী আধুনিক সমাজব্যবস্থায় বাংলা মিডিয়াম তাই ক্রমশ তার গুরুত্ব হারাচ্ছে।

প্রীতমকুমার ওরফে পাপু তাঁর বাবা-মায়ের মতোই অবলীলাক্রমে ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। এই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নতুন একটি ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। যে ভাষাকে বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনটাই বলা চলে না। উভয়ের মিশ্রণে এক নতুন ভাষা 'বাংরেজি'। এই প্রজন্মের সেলিব্রেটিরাও বাংরেজিতেই কথা বলেন। বাংলা ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট করার জন্য বাংলা ভাষাপ্রেমিরা এতে আহত হতে পারেন, কিন্তু তাতে এ প্রজন্মের মানুষেরা তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি অনুভব করেন না। বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণ তৈরি করে ভাষাকে বাঁধতে চেয়েছেন, কিন্তু শিক্ষায়তনের গণ্ডিতে পরীক্ষার নাগপাশে বেঁধে বিদ্যার্থীদের ব্যাকরণ মানতে বাধ্য করা গেলেও ভাষার বিবর্তনে লাগাম টানা সম্ভব হয়নি। এই প্রজন্ম যে বাংরেজিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, তাকেও বাংলা ভাষা প্রেমী মানুষেরা বাগে আনতে পারেননি। বাংরেজির ব্যাধি এমনভাবে গ্রাস করেছে যে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার মানুষ পাওয়া ভার। অচিরেই যদি ৫ মিনিট শুদ্ধ বাংলায় বক্তৃতাদানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তো আমি অন্তত অবাক হবো না। কিন্তু যদি শুদ্ধতার শুচিবাইকে সরিয়ে রেখে বাস্তবতাকে মেনে নিই, তবে কে বলতে পারে, বাংরেজিই স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পাবে কিনা, কিংবা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে বাংলার চেয়ে উন্নত হয়ে উঠবে কিনা।

'অনিকেত সন্ধ্যা' নাটকে নবীন প্রজন্ম পাপুর প্রায় মাতৃভাষা হয়ে উঠেছে বাংরেজি। শুদ্ধ বাংলা তার কাছে সংস্কৃত শেখার মত দুরূহ হয়ে উঠবে। পাপুর মতো বাংরেজিতে অভ্যস্ত বাবা-মার সন্তান যারা, তাদের কাছে বাংরেজি মাতৃভাষা বা ক্রেওল (creole)-এর মর্যাদা পেতে চলেছে। চন্দন সেন নাটকে তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তুলে ধরেছেন। হিন্দিভাষী বন্ধুদের সাহচর্যেই বোধকরি পাপু বাংলা-ইংরেজি মেশানো বাক্যের মধ্যে হিন্দি শব্দ ঢুকিয়ে ফেলে! 'সুবিধা'র পরিবর্তে 'সুবিস্তা' বলে। তখন প্রিয়তোষ তার ভুল ধরিয়ে বলে – 'সুবিধা, সুবিস্তা নয়, ওটা হিন্দী, সুবিধা – প্রিভিলেজ সুবিধা।' তখন এটা পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, যে বাংলা-ইংরেজির সহাবস্থান বা মিশেল ব্যাকরণ সম্মত হোক বা না হোক, তাদের মর্যাদাও সমাজ সম্মত। কিন্তু তার মধ্যে হিন্দীর মিশেল 'নৈব নৈব চ'। এটা নতুন প্রজন্মের দান বলতেই হবে।

মধ্য তিরিশের দম্পতি প্রিয়তোষ ও মালবিকা পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবন সংগ্রামে ব্রত গ্রহণ করেছে। স্বামী-স্ত্রীর সাবেকি ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে সংসারের প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের জীবনবেদ-

> "আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
> মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।

পঞ্চশরের বেদনামাধুরি দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু ভয় নাই, জানি নিশ্চয় – তুমি আছ, আমি আছি।।”

পারসিয়ালি প্যারালাইসড্ দাদুকে দেখাশোনার জন্য অন্তত একজন নার্স তার সেবাযত্ন করবে, অপরজন কাচাকুচি পরিষ্কার টরিষ্কার করবে এমন দু'জন লোক চায়। কিন্তু দু'জনের রোজগারে সবদিক সামলে এই অতিরিক্ত খরচ করতে না পারায় মালবিকা নিজেই দাদুর সেবাযত্ন করে, কাপড় বিছানাপত্র পরিষ্কার করে দেয়। এ সব করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে অফিস দৌড়াতে হয়। অতিরিক্ত অর্থ রোজগারের জন্য ব্যাঙ্ককর্মী প্রিয়তোষকে O.T. (over time) করতে হয়। স্ত্রীর পরিশ্রম লাঘব করতে গিয়ে প্রিয়তোষই অনেকটা জোর করে ধারে ওয়াশিং মেশিন কিনেছে, মাসে তার প্রিমিয়াম শোধ দিতে হয়।

সচরাচর পক্ষাঘাতগ্রস্ত পিতাকে ছেড়ে কর্ণদেব বাইরে থাকেন না। কিন্তু আসানসোলে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বোধকরি সংসার চালাতে হিমসিম খাওয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে একটু সহায়তা দিতে। পাপুর এক প্রশ্নের জবাবে মালবিকা যে উত্তর দেয়, তাতে মনে হয় পুত্র-পুত্রবধূর ঐকান্তিক ইচ্ছাতেই কর্ণদেব বক্তৃতা দিতে যেতে সম্মত হয়েছিলেন। গ্র্যাণ্ডিকে ছেড়ে দাদাই-এর বাইরে যাওয়া দেখতে অনভ্যস্ত পাপু প্রশ্ন করে – 'দাদাই তো বাইরে স্টে করে না।' জবাবে মালবিকা বলে – '...তুমি কি জান? হাউ মাচ্ ইওর দাদাই ইজ পেড্ ফর সাচ্ লেকচারস্?' অর্থাৎ মূলত টাকার জন্য বৃদ্ধ একান্তভাবে নির্ভরশীল পিতাকে ছেড়ে যাওয়া চলে। এই নবপ্রজন্মের কাছে যে কোন মানবিক সম্পর্কের উপর টাকার স্থান। টাকার জন্য যে কোন সম্পর্ক গড়া বা ভাঙা চলে। মধ্যতিরিশের যে প্রজন্ম যারা সন্তানের বাবা-মা কিংবা যারা 'সন্তানের জন্ম দেবে জন্ম দেবে' বলে স্বপ্ন দেখে তারা বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে অর্থের প্রলোভনে সুদূর বিদেশে পাড়ি জমাতে কোন দ্বিধাবোধ করে না। একবার ভাবেও না, তার অবর্তমানে তাদের কি হবে? ঠিক তার আগের প্রজন্মের মানুষ কর্ণদেব যিনি ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ তিনি তার নাম-যশ-খ্যাতির প্রলোভনে সাড়া দিতে পারেন না। অক্ষম পিতা তার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে বলে। মধ্যতিরিশের এই প্রজন্মের কর্তব্যহীন দায়িত্বহীন মানসিকতার ফলেই একজন ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক কমল চক্রবর্তী একদা কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন – সারা কলকাতাই তো আজ Old Age Home-এ পরিণত হয়েছে। প্রজন্মগত এই ব্যবধান মারাত্মকভাবে খুব দ্রুত গ্রাস করছে আমাদের।

পাপু তার দাদাইকে জানে। দাদাই কখনো অর্থের লোভে তার অক্ষম পিতাকে ছেড়ে যেতে পারে না। তাই তার সাফ জবাব – 'দাদাই মোটেই গ্রিডি নয়।' মালবিকা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে – "পাপু আমরা কিন্তু কেউ গ্রিডি নয়। ও.টি.

করলেও তোমার বাপি কিন্তু গ্রিডি নয়। এ যুগে কস্ট ও লিভিং কত হাই জানো! বড় হও বুঝবে। আচ্ছা তোমার দাদাই না থাকলে তুমি এত ছটফট করো কেন? এ ব্যাপারে তুমি আর তোমার গ্র্যাণ্ডি একই রকম।" পাপু এখনও জীবনজটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেনি, আর গ্র্যাণ্ডি সাতাশি বছরের বৃদ্ধ এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে এক বয়স্ক শিশু। শিশু তার হৃদয়ের কাছাকাছি আপনজনকে বোঝে। রক্তের সম্পর্ক দিয়ে নয়, ভালোবাসার সম্পর্কে। পাপুর দাদাই প্রাজ্ঞ অধ্যাপক। জীবনকে তিনি জানেন, তার পরিণামকেও। ভালোবাসা দিয়েই তাই তিনি জীবনকে আঁকড়ে ধরেন। তাই তার অভাব পাপুর মতো গ্র্যাণ্ডিও অনুভব করে, তার সঙ্গহীনতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রিয়তোষ-মালবিকারা যে প্রজন্মের প্রতিভূ, তাতে হৃদয়ঘটিত ব্যাপারটাও তাদের কাছে লাভ-ক্ষতির অঙ্কে গৃহীত হয়, আন্তরিকতা থেকে নয়। তাই দাদাই-এর অবর্তমানে যে হৃদয়চাঞ্চল্য পাপু বা গ্র্যাণ্ডির মধ্যে দেখা যায়, সেটা মালবিকা-প্রিয়তোষের মধ্যে মেলে না। তার কারণ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক-শ্বশুর মোটা অঙ্কের সম্মানদক্ষিণা ঘরে নিয়ে আসবে। তাইতো পাপুকে বলে – "হাউ মাচ্ ইওর দাদাই ইজ পেড্ ফর সাচ্ লেকচারস্।" এই লাভলোকসানের অঙ্কেই মধ্যতিরিশের হৃদয় কথা বলে। তাই পাপুর দাদাই-এর উপর গ্র্যাণ্ডির সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার কথা জানা সত্ত্বেও কর্ণদেবকে সেমিনারে বক্তৃতা দিতে যাওয়ায় উৎসাহিত করেছে। ভেবেছিল গ্র্যাণ্ডিকে একটি দিন ঠিক সামলে নেবে। কিন্তু পারেনি। কর্ণদেব লায়ন্'স ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে গেস্ট স্পীকার হতে চলে যাওয়ার পর থেকে ভীষ্মদেবকে কেউ কিছু খাওয়াতে পারেনি। একটু দুধ ছাড়া। চাকর অর্জুন রাতেও মুখার্জ্জী বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন তাকে যা করেই হোক খাওয়াবে বলে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত তাকে খাওয়ানো যায়নি। এই ব্যর্থতা নিয়ে প্রিয়তোষ ও মালবিকার মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি তথা মতান্তর হয়েছে কিন্তু সেমিনারে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্তটা যেহেতু তারা যৌথভাবে গ্রহণ করেছিল, তাই ব্যর্থতার দায় দু'জনেই ভাগ করে নিয়েছে। মনান্তরের কোন কারণ ঘটেনি।

রিমির অবাঞ্ছিত আগমন পাপুর গ্র্যাণ্ডিকে নিয়ে বিড়ম্বনার প্রসঙ্গটিকে ধামাচাপা দিতে সহায়তা করেছে। সাবেকি মূল্যবোধ – 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' আর মধ্যতিরিশের প্রজন্মে সংসার সুখের হয় মেনে নেওয়ার ক্ষমতায়। প্রিয়তোষের কণ্ঠে সেই সত্যই ধরা পড়েছে – "এ সংসারের সমস্ত রোগ উপশমে মত হিসাবে তোমারটাই আমি মেনে নিয়েছি, নিচ্ছিও, কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা পরস্পর একমত নাও হতে পারি, তুমি সেটা জানো।" আসলে মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার মধ্যেই পারিবারিক সম্পর্ক অটুট থাকে। তবে সেটা একতরফা হলে চলে না। অনিকেত সন্ধ্যা নাটকে প্রিয়তোষ-মালবিকার সম্পর্কে কোন ফাটল না দেখালেও তার বীজটা কিন্তু রোপণ করে দিয়েছেন নাট্যকার।

তবে মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার সংকটকে প্রজন্মগত ব্যবধানে

সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন। প্রবীণতম প্রজন্ম ভীষ্মদেব মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার অনেক উর্ধ্বে — 'বুড়ো মানুষের গোঁ' সাংঘাতিকভাবে প্রতীয়মান। কর্ণদেব তার একমাত্র পুত্র। একমাত্র বন্ধু। কর্ণদেবই তার অস্তিত্বের স্মারক। তিনিই এই সাতাশি বছরের পক্ষাঘাতগ্রস্ত পিতাকে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ান, গান গেয়ে খাইয়ে দেন। একদা প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতজ্ঞ নিঃসঙ্গ জীবনে গানের সুরে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেন। পুত্রের অবর্তমানে নাতি ও নাতবৌ-এর সাহচর্য মানতে না পারায় তাদের হাতে না খাওয়ায় দাদুর কথা ভেবে প্রোমোশনাল ট্রান্সফার প্রত্যাখ্যান করা, কোথাও বেড়াতে যেতে না পারা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মালবিকা ও প্রিয়তোষ যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দাদুকে একটি ভালো 'ওল্ড এজ হোমে' পাঠিয়ে দেবে। একটু কস্টলি হলেও দাদুর সেবাযত্নের যেন কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য একটি ভালো হোমই পছন্দ করেছে তারা।

সরাসরি সেকথা কর্ণদেবকে জানাতে পারেনি প্রিয়তোষ-মালবিকা। দাদুর জন্য তাদের নানাবিধ ত্যাগের ফিরিস্তি শুনিয়ে সমাধানের একটা পথ বের করতে চাইছিল — আর ভাবছিল ওল্ড এজ হোমের প্রসঙ্গটা কর্ণদেবের মুখে সমাধানের সূত্র হিসাবে উচ্চারিত হোক। কিন্তু তার পরিবর্তে পিতার দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কর্ণদেব পুত্র ও পুত্রবধূকে প্রমোশনাল ট্রান্সফার নিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। কারণ মালবিকার প্রশ্ন ছিল — "আপনি কি ভাবেন বাবা আমৃত্যু আমরা মহত্ত্বের নামাবলী গায়ে চাপিয়ে অন্ধকার স্যাঁতস্যাতে ঘরের মধ্যে অতীতের প্রাচীন বিগ্রহ পুজো করে যাব? আমৃত্যু?" কর্ণদেব জানেন, মহত্ত্বের বিজ্ঞান দেখিয়ে বা শুনিয়ে বার্দ্ধক্যের অনিবার্য যন্ত্রণাকে ঠেকানো যায় না। রোগে যন্ত্রণায় অভিমানে নিঃসঙ্গ ঘরবন্দী একজন মানুষ শুধু কি খাবার জন্য বাঁচে! অধ্যাপকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সেই উপলব্ধি — "এই অবস্থায় একটা বৃদ্ধ শুধু দুবে'লা দুমুঠো খেতে চায় না, না প্রিয়তোষ গরিবের খুদও না, রাজভোগও না! সেই বৃদ্ধ চায় সঙ্গ ... কোম্পানি ... কথা বলার লোক, যে তার পাশে বসে তাকে সহানুভূতি জানাবে, খোঁজ খবর নেবে কিংবা দেবে। সে সংসারের পক্ষে এখনও গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা আভাস দিয়ে তার বেঁচে থাকাটাকে অর্থবহ করে তুলতে পারে, এমন লোক কিংবা কোম্পানি সে চায়।" সেই সময় মালবিকা বা প্রিয়তোষ দিতে পারেনি, তার জন্য কর্ণদেবের কোন অভিযোগ নেই। কর্ণদেব নিজেই পিতার নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গীতে-সাহচর্যে-স্মৃতিকথায় ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

ভীষ্মদেবের আর্তি — 'হে মুনি অতীত / কথা কও কথা কও।' অতীতের জগতের মধ্যে ভীষ্মদেব প্রাণময় হয়ে ওঠেন। মালবিকা-প্রিয়তোষ আধুনিক মানুষ। তারা নিজের হাতে গড়া ভীষ্মদেবের বাড়িটাকে রিমডেলিং করে আধুনিক করে নিয়েছে, পুরানো আসবাব সরিয়ে আধুনিক ডিজাইনে তৈরি আসবাবে ঘর ভরিয়ে তুলেছে। বাবার অনুরোধে তারা ভীষ্মদেবের ঘরটির কোন সংস্কার করেনি। বিখ্যাত

শিল্পীদের ফটো দিয়ে সাজানো ঘরে ড্যাম্প লেগে যাওয়ায় ফৈয়জ খাঁ, আমীর খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, নিধুবাবু, ওংকারনাথ ঠাকুর, জ্ঞান গোস্বামী, দক্ষিণামোহন ঠাকুর প্রমুখের ফটোগুলো খুলে রাখা হয়েছে। বহু দিন দেখতে না পাওয়া ফটোর আর্তি ধরা পড়েছে তার কণ্ঠে। সতের বছর আগে সহধর্মিণী মৃণালিনী চলে যাওয়ার পর ভীষ্মদেব তার স্মৃতি আগলে বসে আছে। ফটোর মতোই মৃণালিনীর ঘরে পাতা খাটটির জন্যও তার হৃদয় ব্যথিত হয়। প্রিয়তোষেরা সেই খাট বিক্রি করে দিয়েছে। মৃণালিনীর ছবিটাও সে ঘরে আর নেই। সে কথা শুনে ভীষ্মদেব ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তার জগৎটা কেমন দুমড়ে মুচড়ে যায়। অধ্যাপক পুত্র বোঝেন — হিস্ট্রি নেভার রিপিটস্ ইটসেলফ।' অতীতকে ফিরিয়ে আনা যায় না কিন্তু ভীষ্মদেবের সবটাই তো অতীত, অতীতকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চান।

প্রিয়তোষ-মালবিকারা ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বর্তমানের ফ্রেমে বাঁধতে চান। অতীত নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। তবু অতীতের উপর ভিত্তি করেই তো বর্তমান দাঁড়িয়ে থাকে। প্রিয়তোষ-মালবিকারা বাড়িটাকে যতই রিমডেলিং করুক না কেন, এই বাড়ির ইঁট, কাঠ, চুন, সুরকীর সঙ্গে যে মানুষটা একাত্ম হয়ে আছে, আজ সাতাশি বছরের সেই বৃদ্ধ ঐ বাড়ির একটি ঘুপচি ঘরে বন্দী হয়ে থাকলেও তো আছে, তাকে ছিন্নমূল করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠালে সে কি মানিয়ে নিতে পারে? এই অসম্ভাব্যতা প্রিয়তোষ হৃদয়ে অনুভব করে। সব থেকে বেশি করে অনুভব করে বাবার কথা। বাবা এ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। মালবিকা অজস্র যুক্তি জালে, আঘাতে, সমবেদনায় প্রিয়তোষের দুর্বলতাকে দূর করতে চায়। এই ঘটনার অনিবার্য বেদনাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া বিকল্প কিছু ভাবতে পারে না প্রিয়তোষ।

প্রস্তাবটা কর্ণদেবকে দেওয়ার পর তার সমর্থনে অজস্র যুক্তিজাল বিস্তার করে খিদিরপুরে একটি বিখ্যাত লাক্সুরিয়াস ওল্ড এজ হোমে পরীক্ষামূলকভাবে অ্যাডমিশন করার কথা বলে। কোন বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়ে তার প্রতিবাদ তো দূরের কথা কোন আপত্তি না করায় তারা তাদের পরিকল্পনার সাফল্যে এতটাই উজ্জীবিত হয়ে উঠে যে মালবিকা দাদুকে গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে আদ্যিকালের ব্যাগটা গুছিয়ে রাখতে গেলেই বিপত্তি বাঁধে। গ্র্যাণ্ডি বুঝে যান তাকে কোথাও চিরতরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তখন সেই বৃদ্ধের রাগে দুঃখে অসহায়তার আর্তি — লেখকের ভাষায় — "সেই মানুষটার এখন চোখ জ্বলছে ... কাঁপছিলেন তিনি রাগে ... তারপর টলটল করে উঠল চোখের জল ... বসে পড়েছেন খাটে ফোটগুলোকে আঁকড়ে কোলে নিয়ে একলা বলে চলেছেন — ম্মা — ম্মা — " নিজের বানানো বাড়ীতে নিজের নাতি-নাতবৌ-এর কাছে অবাঞ্ছিত এই বৃদ্ধ, তাদের দ্বারা প্রতারিত। বৃদ্ধের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই, তারই অজ্ঞাতসারে তাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কর্ণদেব পুত্র ও পুত্রবধূর এই পরিকল্পনার কথা আগে থেকে জানতে না পারায় আহত হয়েছেন, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের পিতার ভার পুত্র-পুত্রবধূর উপর

ন্যস্ত করতে চাননি। তাই অভিমান ক্ষুব্ধ গলায় বলেছেন – "বাবাকে ওল্ড এজ হোম-এ পাঠাতে হবে। এতে লজ্জা-সংকোচ কেন? নিশ্চয়ই তোমাদের পাঠানো দরকার – বিশেষ অন্যায় আমি কিছু দেখি না। সময় অনুসারে এটাই তো অনিবার্য ভবিতব্য তবু ... তবু .... তোমরা আমায় এসব আগে বলতে পারতে ... না না আমি বাধা দিতাম না, কেন দেব? বরং আমি একটু একটু করে বাবাকে প্রস্তুত করতাম ... তোমরা আমার সঙ্গে কারচুপি করলে কেন ... আমার বাবাকে নিয়ে আমার সঙ্গে ..."। এই ভুলের মূল্য দিতে হল প্রিয়তোষকে বাবাকে হারিয়ে। তার বাবা কর্ণদেব নিজের পিতা ভীষ্মদেবকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রম-এ চলে গেলেন। কর্ণদেব তার পূর্ব প্রজন্ম ও উত্তর প্রজন্মের মধ্যে সেতু বন্ধনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, নিজের জন্মের সার্বিক আত্মত্যাগের মধ্যদিয়েও তা দূর করতে পারলেন না, ভীষণ নড়বড়ে সেতুটা শেষপর্যন্ত ভেঙে গেল।

প্রিয়তোষ-মালবিকারা যে প্রজন্মের মানুষ তাদের সময় সম্পর্কে অধ্যাপক পিতা যথার্থ মূল্যায়নে বলেছেন – "দেখছ না কি ভীষণ দুরন্ত একটা অতিব্যস্ত যুগ, সুপারসনিক এর যুগ। হাই-টেকনলজির যুগ, একটা সর্বগ্রাসী ভাঙনের যুগ – যুক্ত থাকতে থাকতে আরামে বিযুক্ত হবার যুগ ... তোমরা তো এ সময়ের বাইরে নও – বাবা চেষ্টা করেছিলেন অতীত নিয়ে থাকতে। আমি চেষ্টা করেছিলাম সেতুবন্ধন করতে। তোমরা অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের মতো সেতুটাকে এক ধাক্কায় ভেঙে দিয়ে বুঝিয়ে দিলে হাই-টেকনলজি মনের সঙ্গে মনের সেতু বন্ধন ঘটাতে পারে না, না পারে না।" আমরাও এ নাটকে প্রিয়তোষ ও মালবিকার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে প্রয়োজনই তাদের কাছাকাছি থাকতে বাধ্য করে, নইলে মনের দিক থেকে প্রত্যেকেই একা, এক একটা দ্বীপের মত স্বতন্ত্র।

সংসারে দাদুর প্রয়োজন ফুরালেও অধ্যাপক বাবার তখন সে-সময় আসেনি। 'রিয়েলিটি'কে বুঝতে তিনি ভুল করেননি। একষট্টি বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক শরীরে সক্ষম, মনের দিক থেকে সচেতন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ রোজগারেও অপারগ নন। অর্থাৎ কোনদিক থেকেই তাকে পুত্রের উপর নির্ভর করতে হয় না। তবু তিনি সময়ের কাছে হেরে যাওয়া মানুষ, নিজের সন্তানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে পিতার সঙ্গে ওল্ড এজ হোম-এ চলে গেলেন। কারণ তাঁর স্বীকারোক্তি – "আমি জানি পাঁচ বছর বা দশ বছর বা আর একটু পরে আমি ও আস্তে আস্তে লাইবিলিটি হয়ে যাব – বাবার মতোই আমাকেও পাঠানো হবে মানে পাঠাতেই হবে – ওল্ড এজ্ হোম-এ।" এই অনিবার্য ভবিতব্যকে নিজে থেকে বরণ করে নিলেন অধ্যাপক।

আর তরুণতম প্রজন্মের প্রতিভূ পাপু সময়ের এই সমাধানকে অস্বীকার করে তার আদরের গ্র্যান্ডিকে বলেছিল – "গ্র্যাণ্ডি যাবে না, আমার গ্র্যাণ্ডি যাবে না। নো, গ্র্যাণ্ডি হ্যাজ টেকেন এক্সসেপশন। গ্র্যাণ্ডি তুমি বলো – তুমি যাবে না – বলে দাও – এটা তোমার বাড়ি – গ্র্যাণ্ডি – তুমি বলো – আমার বাবা মা তোমায় তাড়িয়ে

দিচ্ছে।" এর জবাবে মায়ের হাতে চড় খেয়ে পাপু সময়ের বিপরীতে না হেঁটে সময়ের অনুকূলে বাবা-মায়ের নিষ্ঠুরতার জবাব দেয় – "আমিও তোমাদের তাড়িয়ে দেব ... এইভাবে ঠিক এইভাবে – ঠিক এই ভাবে বলব – গেট আউট – গেট আউট – " এবার কিন্তু মালবিকা কিংবা প্রিয়তোষ কোন প্রতিবাদ করতে পারল না। কারণ ইট ইজ্ রিয়েলিটি। রিয়েলিটির গ্রাসে পড়ে মানব হৃদয়, মানবিক সম্পর্ক সমস্তই ভস্মসাৎ হয়ে যায়। পাপু বড় হবে। গ্র্যাণ্ডি, দাদাই-এর জন্য তার কোমল প্রাণের স্নেহ, ভালোবাসা সময়ের গ্রাসে ভস্ম হতে থাকবে। মধ্যতিরিশের পাপুও রিয়েলিটির দোহাই দিয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাবা-মার জন্য ওল্ড এজ হোমের ব্যবস্থা করবে। এ যুগের এটাই ভবিতব্য।

সময়ের রিয়েলিটিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পেরেছিলেন এই চার প্রজন্মের মধ্যে একমাত্র কর্ণদেব। তিনি প্রাজ্ঞ। তিনি জানেন জীবন অনেক বড়। কেবল রিয়েলিটি আর নেসেসিটির মধ্যে জীবন ফুরিয়ে যায় না। মধ্যতিরিশের প্রজন্ম রিয়েলিটি আর নেসেসিটির বাইরে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু ষাটোর্ধ্ব অধ্যাপক জানেন – "ক্যান এ ম্যান লিভ্ বাই ব্রেড অ্যালোন?" বাঁচাটাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আনন্দের আয়োজনে মনকেও খুশি রাখতে হয়। তার বাবা ভীষ্মদেব ভাঙা স্টেশনারী দোকান চালিয়ে এবং গান শিখিয়ে জীবিকার্জন করেছিলেন। দোকান ছিল পেশা গান তার নেশা। নেশায়-পেশায় মিলিয়ে জীবনের পূর্ণতাকে অনুভব করেছিলেন। অবসর জীবনে গানে গানে নিজের ভুবন ভরিয়ে তুলেছিলেন। কর্ণদেব নিজেও ছিলেন ফুলটাইম অধ্যাপক, পার্টটাইম গায়ক। প্রয়োজনের সঙ্গে অপ্রয়োজনের মেলবন্ধন ঘটাতে তিনিও সক্ষম হয়েছিলেন। এই দুই বৃদ্ধ পিতা-পুত্রের প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি নিজস্ব জগৎ ছিল। তাই এতদিনের স্মৃতি ও সাহচর্য ছেড়ে তিলতিল করে গড়ে তোলা বাড়ির সান্নিধ্য ছেড়ে বিরাট পৃথিবীতে বিহঙ্গের মতো বেরিয়ে পড়া সম্ভব হল। সঙ্গে রইল ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'মেজদিদি' ছবিতে গাওয়া একটি গান – 'জনম মরণ পা তোলা আর পা ফেলা তোর ওরে পথিক।' এই পথিক বৃত্তিই তো বন্ধন মুক্তির সোপান।

প্রজন্মগত ব্যবধান যেমন সময়ের দান – পিতাপুত্রের বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে তোলে। এই অনিবার্যতা রিয়েলিটি ও নেসেসিটির নিরিখে নির্ধারিত হয়। জীবন যদি এই দুয়ের উর্ধ্বে উঠতে পারে তবে যে প্রতিবন্ধকতায় নেমে আসুক না কেন, একপ্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কর্ণদেব ও ভীষ্মদেবের মতো দুই বৃদ্ধ পিতা-পুত্র হয়ে ওঠে বন্ধু, আত্মার আত্মীয়। অনিকেত সন্ধ্যায় চরম দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে নাট্যকার চন্দন সেন পাঠক-দর্শককে এই বার্তাটাই দিতে চেয়েছিলেন।

....

কালব্যবধানে শকুন্তলা : পৌরাণিক ঐতিহ্য ও কালিদাসীয় উদ্‌বর্তন

সবিতা মণ্ডল

দুষ্যন্ত-শকুন্তলা কাহিনির আদি উৎস ব্যাসদেবকৃত মহাভারত। মহাভারতের রচনাকাল ধরা হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ (আনুমানিক)। পণ্ডিতগণের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। মহাভারত এর পরবর্তীকালে রচিত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-এর রচয়িতা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও অনেকের রচনাই মহাভারতে গৃহীত হয়েছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনি মূল মহাভারতের সঙ্গে সংযোগচ্ছিন্ন। সুতরাং পরবর্তীকালে মহাভারতে সংগৃহীত হয়েছে। সেই সময়কালও খ্রিস্টজন্মের পূর্ববর্তী বলেই আমাদের ধারণা। অর্থাৎ দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনি অন্ততঃ দু'হাজার বছর পূর্বে মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ব্যাস দ্বৈপায়নকৃত মহাভারত ভারতের জাতীয় দুটি মহাকাব্যের একটি। কিন্তু মহাভারতে রামায়ণের মতো আখ্যানের সংহতি নেই। আখ্যানগত শৈথিল্যের পথ ধরেই দুষ্যন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান মহাভারতে ঠাঁই করে নিয়েছে। তবে আখ্যানটিতে মহাকাব্যিক মহিমার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। শকুন্তলার পিতা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বীর হয়েও সাধনা বলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেন। তাঁর সাধনায় ইন্দ্রত্ব হারানোর ভয়ে দেবরাজ ধ্যানভঙ্গের জন্য মেনকাকে প্রেরণ করেন। মেনকার গর্ভে ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে জাত শকুন্তলা জন্মসূত্রে যেমন অপ্সরাসুলভ সৌন্দর্য ও রূপলাবণ্যের অধিকারী, তেমনি পিতার ন্যায় তেজস্বিনীও বটে। মহাভারতে নারী চরিত্রও বীর্যব্যক্তিত্বে ভাস্বর। এই আখ্যানে রাজা দুষ্যন্তের বীর্যব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি মহাকাব্যসুলভ শৃঙ্গার রসেরও উৎসার ঘটেছে। রাজা দুষ্যন্ত কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলাকে রূপমুগ্ধ হয়ে এবং ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা জেনে গান্ধর্ব মতে বিবাহ বাঞ্ছা প্রকাশ করলে শকুন্তলা দুষ্যন্তের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেনি।

বিবাহের শর্ত হিসাবে শকুন্তলা দাবি করেছে, রাজার ঔরসে তার গর্ভজাত পুত্রসন্তানকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করতে হবে।

'ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেত্ ত্বদনন্তরঃ।।'

(মহাভারত, আদিপর্ব, ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়, শ্লোক – ১৬)

এখানে চরিত্রটির মধ্যে মহাকাব্যিক তেজস্বিতা ধরা পড়েছে। সহস্রাধিক বর্ষ পরে

মহাকবি কালিদাস এই কাহিনির নাট্যরূপায়ণ করতে গিয়ে এক আশ্রম বালিকার শর্ত সাপেক্ষে বিবাহের ঘটনাকে বর্জন করেছেন।

মহাভারতীয় যুগে বিবাহ যেমন ছিল পুরুষের কাছে 'পুত্রর্থ ক্রিয়তে ভার্যা' তেমনি নারীর কাছেও পিতার উত্তরাধিকারী বীর পুত্রের জননী হওয়ার বাসনা। কিন্তু সহস্রাধিক বছরের ব্যবধানে কালিদাস বিবাহের শর্তটাকে ভেঙে দিলেন। সেখানে প্রণয় হয়ে উঠল পরিণয়ের একমাত্র পাথেয়। প্রথম দর্শনেই শকুন্তলা প্রণয় শরাতুরা হয়ে পড়েন –

"কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবনবিরোধিনঃ বিকারস্য গমনীয়াস্মি সংবৃত্তা।"

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রথমোঽঙ্কঃ)

সুতরাং আত্মনিবেদিত প্রাণ দুষ্যন্তের হাতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে চরিতার্থ হতে চান। কালিদাসের নাটকে প্রণয় শরাতুরা নারী বিবাহের পূর্বশর্ত হিসাবে ভাবী পুত্রকে যুবরাজ পদে বরণ তথা পাটরাণী হওয়ার স্বপ্নকে লালন করতে পারেনি। চরিত্রটির মধ্যেই মহাভারতীয় তেজস্বিতা ও স্বার্থবোধ দূর করে কালিদাস আশ্রম পালিতা শকুন্তলাকে হরিণীর ন্যায় কোমল সুন্দর ও সরলা রূপে উপস্থাপন করেছেন। সুকৌশলে কালিদাস তার অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে এক হরিণ শিশুর জননীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করে সেই সারল্য ও মমত্ববোধকে চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন। মহাভারতীয় শকুন্তলার তুলনায় কালিদাসের শকুন্তলা স্বভাবে ও মানসিকতায় একেবারে স্বতন্ত্র।

কণ্বদেব আশ্রমে ফিরে এসে সকল অবগত হয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে গান্ধর্ব মতে পুরুষশ্রেষ্ঠ দুষ্যন্তকে স্বামীত্বে বরণ করায় প্রীত হয়ে শকুন্তলাকে বরদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহাভারতীয় শকুন্তলা বিবাহের পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণে রেখেই প্রার্থনা করেন –

"অতুল প্রতাপে ধরা শাসুক গৌরবে।।
রাজ্যচ্যুত অথবা অধর্ম্ম পরায়ণ
পুরু বংশীয়েরা যেন না হয় কখন।।"

(ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের অনুবাদ কাশীদাসী মহাভারত, আদিপর্ব)

রাজার প্রতিশ্রুতি কণ্বদেবের বরে আরো সুনিশ্চিত করে নিতে চাইলেন। একেবারে হিসেবি পদক্ষেপ। কালিদাসের কাব্যে এই মহাভারতীয় শকুন্তলাকে একেবারেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মহাভারতীয় কাহিনিতে বিবাহের তিন বৎসর পর শকুন্তলা কণ্ব মুনির আশ্রমেই একটি মহাবলশালী অগ্নিতুল্য পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তিন বৎসর কাল গর্ভধারণের ব্যাখ্যা হিসাবে টীকাকার বলেন 'মহাপুরুষগণ দীর্ঘকাল গর্ভে বাস করেন' (রাজশেখর বসু উবাচ)। ছ'বছর বয়সেই অসাধারণ বলবিক্রমে বাঘ-সিংহ-মহিষ-হস্তী ইত্যাদি দমন করায় সর্বদমন নামে খ্যাত এই বালক যুবরাজ পদে অভিষিক্ত

হওয়ার যোগ্য বিবেচনা করে সপুত্রক শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করা হয়। মহাভারতীয় এই কাহিনিতে শকুন্তলার স্বামী-অনুরাগ বা বিরহ বেদনা কোন কিছুরই প্রকাশ নেই। এমনকি আজন্মলালিত এই আশ্রম চিরতরে ত্যাগ করে যাওয়ার জন্য কোন বিচ্ছেদ বেদনাও মহাভারতীয় শকুন্তলায় মেলে না। কালিদাস এই নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ঘটনাকে স্বীয় প্রতিভা বলে প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন।

কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-এ শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করেছে পুত্র জন্মাবার পূর্বেই গর্ভিনী নারী হিসাবে। পিতৃগৃহে নারী বসবাস করলে তার সুনাম, ধর্ম ও চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা মহাভারতের কাহিনিতে ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু কালিদাসের নাটকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা স্নেহে-মমতায়-কর্তব্যে-ভালোবাসায় বিচ্ছেদ বেদনা মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছে। এতদিন অপত্যস্নেহে যে সমস্ত তরুবৃক্ষে জলসিঞ্চন করে এসেছেন, তারা তাদের পুষ্পহারে শকুন্তলাকে সাজিয়ে দিয়েছে। শকুন্তলা সকলের কাছে গিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছেন। মাতৃহারা সে হরিণ শিশুকে শকুন্তলা মাতৃস্নেহে লালন পালন করেছিলেন, বিদায় বেলায় সে তার আঁচল টেনে ধরেছে। তার মূক দৃষ্টিতে ফুটে ওঠা আর্তি – 'দিব না দিব না যেতে।' মানুষ তবু তো বোঝে; প্রাণ না চাইলেও 'তবু যেতে দিতে হয়।' অনুসূয়া প্রিয়ংবদা অশ্রুসজল নয়নে প্রিয়সখী বিদায় জানিয়েছে, কিন্তু ঐ হরিণ শিশু শকুন্তলার স্নেহটুকু ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। পশুতে-মানুষে-তরুতে-পাখিতে এমন নিবিড় হার্দিক সম্পর্ক গড়ে তুলে কালিদাস অসাধারণ শিল্পসুষমায় পৌঁছে দিয়েছেন। আজন্ম-লালিত কন্যাকে তার শ্বশুর বাড়িতে পাঠানো মর্ম বেদনা ঋষির চোখেও জল এনে দেয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য থাকে না। এখানেও পিতার সেই আর্তি –

"তনয়া পরের ধন বুঝেও না বুঝে মন
এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার।"

সেই বিড়ম্বনাকে শিরোধার্য করেই কণ্বদেব কন্যাকে উপদেশ দেন –

"শুশ্রূষস্ব গুরূণ্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।।"

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। চতুর্থোঽঙ্কঃ)

মহাভারতের শকুন্তলা দুষ্যন্ত সমীপে গিয়েই অভিবাদন করে বলেন –

"প্রসীদস্ব মহারাজ বক্ষ্যামি পুরুষোত্তম।।
অয়ং চ পুত্রস্ত্বয়া রাজন্ যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্।
ত্বয়া হ্যয়ং সুতো রাজন্ ময্যুৎপন্ন সুরোপমঃ।
যথাসময়মেতস্মিন্ বর্তস্ব পুরুষোত্তম।।"

(মহাভারতম্, চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ)

রাজা, তোমার পুত্র আমার গর্ভে জন্মেছে। তোমর প্রতিশ্রুতি মতো একে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। আশ্রম বিচ্ছিন্ন শকুন্তলার হৃদয়ের কোন আর্তি বা স্বামীসমীপে আসবার কোন উল্লাস কিংবা দ্বিধা-সংশয় কোন কিছুরই প্রকাশ নেই। মহাভারতের ঘটনা হৃদয়হীন যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মহাভারতের দুষ্যন্ত একদা মৃগয়ায় গিয়ে শকুন্তলাকে বিবাহ করার কথা স্মরণে থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ হয়নি বলে শকুন্তলাকে অস্বীকার করেন। এতে কোন সৌজন্যবোধ না দেখিয়ে শকুন্তলাও তেজস্বিতার সঙ্গে ক্রোধে দুঃখে রাজাকে নয়নবাণে দগ্ধ করে, কুবাক্য প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করেন না। অপরদিকে দুষ্যন্তও কামুক ও নির্দয় পিতা ও অসতী মাতার সন্তান শকুন্তলাকে ভ্রষ্টা বলে প্রতিপন্ন করেন। দুষ্যন্ত যেমন রাজ-আভিজাত্য ও মর্যাদা হারিয়ে শকুন্তলাও তেমনি আশ্রমবাসিনীর সরলতা ও সম্ভ্রমবোধশূন্য প্রাকৃত নরনারীতে পরিণত হয়েছে। অহংকার, ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপরতাই তাদের জীবনসম্বল।

শকুন্তলা তেজস্বিতার সঙ্গে রাজসভা ত্যাগ করলে দৈববাণী হয় –

"ভস্ত্রা মাতা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্।।"

(মহাভারতম্ , চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ)

দৈববাণীতে শকুন্তলা ও তার পুত্রকে গ্রহণের নির্দেশ পেয়ে দুষ্যন্ত ইতোপূর্বে কপট অভিনয়ের কথা স্বীকার করে তাদের গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ের কারণ দর্শিয়ে বলেন –

"অহং চাপ্যেবমেবৈনং জানামি স্বয়মাত্মজম্।
যদ্যহং বচনাদস্যা গৃহ্ণীয়ামি মমাত্মজম্।।
ভবেদ্ধি শঙ্কা লোকস্য নৈব শুদ্ধো ভবেদয়ম্।।"

অর্থাৎ, লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। তাই শুদ্ধির জন্য তিনি এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। যুক্তি যাই থাক, এখানে উভয়েরই চরিত্র গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কালিদাস এই প্রসঙ্গটির অসারতা অনুধাবন করে দুর্বাসার অভিশাপ প্রসঙ্গ সংযোজন করে কাহিনির শৈল্পিক উত্তরণ ঘটিয়েছেন। পতি-বিরহিণী শকুন্তলা পতি চিন্তায় মগ্ন হলে দুর্বাসার 'অয়মহং ভোঃ' – ধ্বনি শুনতে না পেলে দুর্বাসা অভিশাপ দেয় –

"আঃ অতিথিপরিভাবিনি,
বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।"

(অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ , চতুর্থোঽঙ্কঃ)

অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা সেকথা জানালেও শকুন্তলার কাছে তা অজ্ঞাতরেখে কালিদাস নাটকীয় কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে কোন স্মারক চিহ্ন, দেখাতে পারলে তবেই রাজা তার পূর্বস্মৃতি স্মরণ করতে পারবেন। রাজার দেওয়া আংটিটি সেক্ষেত্রে মুস্কিল আসান হতে পারে। শকুন্তলার সখিদ্বয় দুর্বাসা বৃত্তান্ত শকুন্তলার কাছে গোপন রেখেও দুষ্যন্ত তাকে চিনতে না পারলে স্মারকলিপি স্বরূপ আংটি দেখানোর কথা বলেছেন –

“সখি, যদি নাম স রাজা প্রত্যভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ
ততঃ তস্মৈ ইদম্ আত্মনামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুলীয়কং দর্শয়।”

(অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ , চতুর্থোহঙ্কঃ)

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আংটিটি জলে পড়ে গেলে শকুন্তলা রাজসমীপে কোন স্মারক দেখাতে ব্যর্থ হন এবং যথারীতি দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রত্যাখ্যান যেহেতু একটি অভিশাপের ফল, তাই তাতে চরিত্র গৌরব ম্লান হয় না। দুষ্যন্তের প্রত্যাখ্যানে শকুন্তলা নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। মহাভারতের শকুন্তলার সঙ্গে তার পুত্র বর্তমান ছিল। নিঃসন্তান রাজার কাছে তার উত্তরাধিকার এবং সর্বোপরি সেই সন্তানের রাজচক্রবর্তী ভাগ্য সুলক্ষিত হওয়ায় গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। লোক স্বীকৃতির জন্য দুষ্যন্তকে একটু না-চেনার অভিনয় করতে হয়েছে মাত্র। কিন্তু অভিশপ্ত শকুন্তলার ক্ষেত্রে সেই সুযোগ ছিল না। ফলে বিচ্ছেদটি দারুণ মর্মান্তিক ও হাহাকারে শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের পর ধীবরের কাছ থেকে আংটিটি পেয়ে পূর্বস্মৃতি স্মরণ ও শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের জন্য রাজচিত্তেও মর্মবিদারী হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বিরহেই অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের সমাপ্তি ঘটেনি। স্বর্গতপোবনে মারীচাশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্ত মিলিত হন। সমস্ত বিড়ম্বনা দৈবদুর্বিপাকজ্ঞানে বিস্মৃত মিলন মধুর ও অপূর্বসুন্দর হয়ে ওঠে।

স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের যুগ থেকে সাহিত্যিক মহাকাব্যের যুগে এসে শিল্পগত সংহতি ও মানবিক মূল্যবোধে উন্নীত করেন। মহাকাব্যিক কাহিনিতেও নাট্য আঙ্গিকে কালিদাস ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকে অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পরূপ দান করেছেন।

....

সংস্কৃত সাহিত্যের অর্বাচীন ধারা

সুতপা পড়িয়া

সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যেরও পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যও নানা সময়ে তার রূপ পরিবর্তন করেছে এবং করছে। বৈদিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সাহিত্যে পরিবর্তিত হল। এরপর লৌকিক সাহিত্যে দেখা যায় ভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য। কালিদাস ও তার পূর্ববর্তী কাব্যে দেখা গেল চমৎকারিতা। আবার কালিদাসোত্তর যুগে ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিদের কাব্যে কালিদাসীয় কাব্যরীতির পরিবর্তন ঘটল। তাই কোন বিশেষ সাহিত্য বিশেষ বিশেষ সময়ে যখন তার পুরাতন গতিপথ পরিত্যাগ করে নতুন পথে প্রবাহিত হয় তখন তার রীতি-বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হয়। তখন তাকে আধুনিক বলা যেতে পারে। তাই কালিদাসের কথাতে বলা যেতে পারে –

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।"

এই রূপ পরিবর্তনের মধ্যে কাব্যের জীবনীশক্তি লুকিয়ে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে যা পরিবর্তন হয় তাই রমণীয়। তাই কবি মাঘ বলেছেন –

"ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।"

প্রত্যেক সাহিত্যে যেমন নিজস্ব গতি আছে তেমনি তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচকেরা আধুনিক শব্দটির পরিবর্তে অর্বাচীন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যধারা প্রচলিত পথকে বহুলাংশে বর্জন করে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে নতুন গতিশীলতায় মণ্ডিত হয়েছে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০০ এবং ১৯০১ থেকে ১৯৪৭ তার পুনরুত্থানকাল। এরপর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তার সমৃদ্ধিকাল।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃতে বিপুল সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই দুই শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের কবিগণ যে সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সেগুলি সংখ্যার আধিক্যে এবং গুণের উৎকর্ষে অতীতের যে কোন শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যকে অতিক্রম করতে পারে। এই সময়ে সাহিত্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব যেমন এসেছে তেমনি প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রেও নতুনত্ব এসেছে।

পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতালাভের উদ্দীপতা, প্রাচীনতার ধারাকে প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতা, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণস্পৃহা, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নতুন

উদ্যোগ প্রভৃতি নানা সমকালীন চিন্তার সার্থক প্রতিফলন অর্বাচীন সংস্কৃতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার প্রতি যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিফলন সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্ন কবির কাব্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এ সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রকাশিত দুটি পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি সুনৃতবাদিনী এবং অপরটি হল সংস্কৃত চন্দ্রিকা। এই দুটি পত্রিকাতে ইংরেজ শাসনের অত্যাচার এবং উৎপীড়নের ঘটনা ও প্রতিবাদের কথা প্রকাশিত হত। সেইসময়ে প্রকাশিত বেশ কিছু দৃশ্যকাব্যের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন— হরিদাস সিদ্ধান্তবাগিশের 'মিবারপতনম্', 'বঙ্গীয়প্রতাপম্', 'শিবাজীচরিতম্' এবং পঞ্চানন তর্করত্নের 'অমরমঙ্গলম্' প্রভৃতিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাহিনি নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'মিবারপতনম্'এর একটি শ্লোক উল্লেখ করা যেতে পারে –

"জীবনমেকৈকস্য জন্মভূমিস্তু সর্বস্যৈবস্নেহস্থানম্।
জন্মভূমাবরক্ষিতায়াং দেহরক্ষা নিষ্প্রয়োজনৈব।।"

উদ্দীপক নানা উক্তি ও গান এদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। যেমন – 'শিবাজীচরিতম্' এর একটি গান হল –

"বালকো যুবকঃ প্রৌঢ়ো বৃদ্ধো মনসা বচসা বপুষা শুদ্ধঃ।
ভবতু ত্বরিতমেকতাবহঃ দেশোদ্ধারে মাস্তু বিরুদ্ধঃ।।"
"ধর ধর প্রহরণং চল চল মহারণম্।
কুরু ভারতোদ্ধরণং ন ভব কোঽপি বিরুদ্ধঃ।।"

স্বাধীনতালাভের বিশাল পটভূমিকায় 'বিশালভারতম্' নামে এক মহাকাব্য রচিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের পরমেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী এর রচয়িতা। লক্ষ্মীবাঈ-এর শৌর্যদীপ্ত চরিত্র অবলম্বনে সুবোধচন্দ্র পন্থ রচনা করেছেন 'ঝাঁসীশ্বরীচরিতম্' নামে একটি মহাকাব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' সকলের পরিচিত। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ক্ষমা রাও রচনা করেন সত্যাগ্রহগীতা। রাষ্ট্রভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেছেন তা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন।

স্বাধীনতালাভের পর দেশে নানা সমস্যা দেখা দেয়। আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ও প্রাপ্ত স্বাধীনতার মধ্যে বিশাল ব্যবধান দেখা যায়। স্বাধীনোত্তরকালের এইসব সমস্যা এবং চিন্তাভাবনা সংস্কৃত কবিদের ও রচনার বিষয় হয়ে ওঠে। তাই 'শরণার্থিসংবাদ' নামক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের একটি নাটকে স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আগত সর্বহারাদের একটি বাস্তবচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে শরণার্থীদের ভয় ও শঙ্কা যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি দেশের শাসকবর্গের নিষ্ঠুরতা

ও নিপীড়নের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। আবার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রতীকধর্মী নাটকে ভোট পদ্ধতির নানা ত্রুটি এবং সাধারণ নাগরিকের এই পদ্ধতির প্রতি অনাস্থা চিত্রিত হয়েছে। অধ্যাপক দীপক ঘোষের 'রাজনীতিলীলামৃতম্' নামক কাব্যে স্বাধীনোত্তরকালের রাজনীতির ঘৃণ্য ভণ্ডামি ও কদর্য প্রবঞ্চনার কথা এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কাব্যটির অন্তরালে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার নিন্দনীয় স্বরূপ যা এখানে অভিব্যক্ত হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে জাতিধর্মবর্ণলিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। তাই গৌরী ধর্মপাল রচিত একটি দৃশ্যকাব্যে মধ্যবিত্ত পরিবারে মায়েদের জীবনের নানা সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। আবার তারাপদ ভট্টাচার্য রচিত 'শৈবলী' গল্পে অবজ্ঞায় বেড়ে ওঠা শৈবলীর মনে যে হীনম্মন্যতার বোধ জন্মে পরবর্তীকালে বিবাহিত জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে তার অকাল মৃত্যু হয়। রাজেন্দ্র মিশ্রের 'ভগ্নপঞ্জর' গল্পের বিধবা শিক্ষিতা বন্দনা পিতৃগৃহে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে পিতৃচরিত্রের ঘৃণ্যতা প্রত্যক্ষ করে প্রচলিত সংস্কারের তোয়াক্কা না করে একান্ত গুণমুগ্ধ এক সহপাঠীর সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে। আবার ঐ লেখকেরই 'জিজীবিষা' গল্পে জীবিকা অর্জনের তাগিদে তপতীকে কীভাবে যৌন কদর্যতার শিকার হতে হয়েছে তার একটি নগ্ন চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। অবশেষে বিবেক নামে এক যুবকের সহায়তায় সেই কদর্য জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে। এইভাবে আরও নানা গল্পে আধুনিক ভারতের নারীজীবনের নানা দুঃখ দুর্দশা ও লাঞ্ছনার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

অস্পৃশ্যতা একসময় মারাত্মক ব্যাধিরূপে সমাজে বিস্তারলাভ করেছিল। এবিষয়ে সংস্কৃত লেখকরাও পিছিয়ে থাকেননি। তারাও এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কলানাথ শাস্ত্রী বিরচিত 'অস্পৃশ্যতায়াঃ রহস্যম্' গল্পে নিম্নবর্ণের যে ছেলেটিকে অধ্যাপক গরুড়ধ্বজ মিশ্র পড়াতে অস্বীকার করেছিলেন সেই ছাত্রটি আবার পরবর্তীকালে ডাক্তার হয়ে রোগাক্রান্ত ঐ অধ্যাপকের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তুলেছিলেন। তখন অধ্যাপক ডাক্তার ছেলেটির প্রতি পূর্বের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে জন্মের দ্বারা কেউ অস্পৃশ্য হয়ে যায় না।

ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান লক্ষ করা যায় তাও সংস্কৃত কবিদের কাব্যে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'জনতালহরী' ও 'রোটিকালহরী' প্রভৃতি কাব্যে বঞ্চিত ও প্রতারিত জনজীবনের নানা তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

কালিপদ তর্কাচার্যের 'প্রশস্তরত্নাকর' নাটকে নায়ক রত্নাকরের উক্তিতে শ্রেণিবৈষম্যের প্রতি তীব্র প্রতিবাদের ব্যাপারটি চিত্রিত হয়েছে। বীরেন্দ্রকুমার

ভট্টাচার্যের শার্দূলশকটরূপকে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মচারী ও শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রভৃতির কথা যেমন আছে তেমনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার কথাও আছে। শেষে শ্রমিক ঐক্যের জয়গানই ঘোষিত হয়েছে।

অধ্যাপক সীতানাথ আচার্য শাস্ত্রী কর্তৃক রচিত 'শিশুযুবদুর্দৈববিলসিতম্' কাব্যটিতে শিশুমৃত্যুর করুণ কাহিনির উপর আলোকপাত করা হলেও সেখানে বর্তমান সমাজের শিশু ও যুবকদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও চিত্রিত হয়েছে। যেমন ভ্রূণহত্যা, অপুষ্টিজনিত সমস্যা, ভ্রষ্টাচার প্রভৃতির কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া ধূলি কাদামাখা শিশুদের ভিক্ষা করার কথা ও ভদ্রবেশী বাবুদের কাছ থেকে তাদের উপেক্ষা ও অনাদর ব্যাপারটিও সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে কার্গিল যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ভারতীয় সৈনিকদের শৌর্য বীর্য, সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের কথা বর্ণিত হয়েছে উৎকলের তরুণ কবি অধ্যাপক ব্রজসুন্দর মিশ্রের 'কার্গিলকাব্যম্' নামক একটি কাব্যে। একবিংশ শতাব্দীতেও সমাজে ঘটছে এবং ঘটবে এমন বিবিধ বিষয় নিয়ে কাব্য ও নাটক রচিত হচ্ছে।

অতএব লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রথমদিকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সজ্জন ব্যক্তি ও লৌকিক কিছু ঘটনাবলীকে নিয়ে রচিত হলেও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার প্রভৃতি বিষয় স্থান লাভ করেছে। অন্যান্য ভাষার মত সংস্কৃত সাহিত্যের গতিও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বরং দুর্বার গতিতে এগিয়ে গিয়ে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা করেছে। এজন্য কবির কাব্যে যে সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি যে প্রতিবিম্বিত হয় এটাই স্বাভাবিক। আর কবিও যে তার সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজকে প্রভাবিত করে এটাও ঠিক। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন –

"The popular literature of nation and the national character act and react on each other."

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতও বলেছেন – ত্রিলোকবাসীর ভাবের অনুকীর্তন ঘটে দৃশ্যকাব্যে।

"ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্।"

গ্রন্থসূত্র

নারায়ণ দাশ : সংস্কৃত সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গস্যাবদানম্ : কথাভারতী, কলকাতা - ৪৭।

সীতানাথ আচার্যশাস্ত্রী : ভাববিলসিতম্ : সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা – ৬।

সীতানাথ আচার্যশাস্ত্রী : শিশুযুবদুর্দৈববিলসিতম্ : সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা – ৬।

রীতা চট্টোপাধ্যায় : Modern Sanskrit Plays 1970 A.D. – 1998 A.D. : সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা – ৬।

'ধরিত্রী - পতি – নির্বাচনম্' : বিশ শতকে রচিত সংস্কৃত ব্যঙ্গনাটিকা

মধুরিমা মুখার্জী

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যে সকল বাঙালী নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রবাহমান ধারাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তাঁদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক, নাট্যপরিচালক, নাট্য অভিনেতা হিসাবে তিনি ছিলেন স্বনামধন্য। তিনি সমসাময়িক সমস্যা তথা রাজনৈতিক সমস্যাকে অবলম্বন করে একাধিক ব্যঙ্গনাটিকা রচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক সমস্যাকে অবলম্বন করে রচিত এমনই একটি অসাধারণ ব্যঙ্গনাটিকা হল ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্। এই নাটিকায় নাট্যকার রাজনীতির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান করেছেন এবং সত্যকে উন্মোচিত করেছেন। এই রূপকে একটিই নারী চরিত্র – ধরিত্রী, পুরুষচরিত্রের সংখ্যা – ৯টি। নাটিকাটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। নাটিকার চরিত্রগুলির নামকরণ তাৎপর্যবাহী।

গতানুগতিকতাবর্জিতভাবে এই নাটিকার প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি একটি পান্থশালা বা রেস্টুরেন্ট-কে। এই রেস্টুরেন্ট্-এর মালিক স্বয়ং বিধাতা। বিশ্বকর্মা হলেন বিধাতার সহযোগী। নাটিকার একমাত্র নারী চরিত্র ধরিত্রী হল বিধাতার কন্যা। ধরিত্রী বিবাহযোগ্যা, সে রূপের অধিকারিণী, সে কারণে তার চতুর্পাশে মাছির মত পাত্রপক্ষ ভীড় জমায়। বাস্তবিক পক্ষে এরা কেউ ধরিত্রীকে মন থেকে ভালোবেসে তাকে পেতে চায়না, এদের লোভ ধরিত্রী পিতা বিধাতা বা ভগবানের অর্থসম্পদের প্রতি। সেই লোভবশতঃই এরা ধরিত্রীকে অধিকার করতে চায় নিজেদের অর্থ, ক্ষমতা বা এই দুয়েরই জোরে।

রেস্টুরেন্ট্-এ একে একে বিভিন্ন চরিত্রের সমাগম হতে থাকে। প্রথমে প্রবেশ ঘটে গাড়্ডোলক বা গড্ডালকের। তার পরণে চিরাচরিত মুসলিম পোষাক। তার হাতে পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র। এরপর প্রবেশ করে চৈনিক পোশাক পরিহিত যুযুধান। তার হাতে রয়েছে বাঁশের লাঠি। এরপর আসে সাহেবী পোশাকে সজ্জিত লঘুবঞ্চক, তার হাতে ছড়ি ও ফুলের তোড়া । হঠাৎ শোনা যায় পান্থশালার বাইরে তুমুল গোলমাল। দেখা যায় হয়ঙ্গল ও ধুরন্ধর পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে। তাদের পারস্পরিক গণ্ডগোল থামাতে আসতে দেখা যায় ভারতীয় পোশাক পরিহিত জীর্ণ,

শীর্ণ-শরীর বিশিষ্ট বরগুলম্বুককে। গাড়্ডোলক ও যুযুধানের কথোপকথন থেকে আমরা জানতে পারি হয়ঙ্গল ও ধুরন্ধর দুজনে বরগুলম্বুকের সাথে মিত্রতা করে ধরিত্রীকে লাভ করতে চায়। গাড়্ডোলক যখন যুযুধানকে প্রশ্ন করে হয়ঙ্গল আর ধুরন্ধর তো পারস্পরিক শত্রু তার প্রত্যুত্তরে যুযুধান জানায় এদের শত্রুতা বাইরের, ভেতরে ভেতরে মিত্রতা। সে আরও বলে – এটাই হল রাজনীতি, যা সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা যায় না।

এরপর আমরা দেখি বিশ্বকর্মার অনুরোধে সকলে পান্থশালার ভিতরে এসে বসে। পান্থশালার মালিক বিধাতা এদের সবাইকে সভায় আহ্বান করেছেন। তাঁর এই সভার বিশেষ উদ্দেশ্য হল তাঁর কন্যা ধরিত্রী আজ নিজেই তার যোগ্য পতি নির্বাচন করবে। বিধাতার এই কথা শেষ হতে না হতেই আমরা দেখি ধরিত্রীকে লাভ করার জন্য উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। যুযুধান জোরপূর্বক ধরিত্রীকে দখল করবার চেষ্টা করলে অন্য সকলেই তার উপর আক্রমনোদ্যত হয়। শুরু হয়ে যায় মারামারি। এরফলে সকলেই কম-বেশি আহত হয়। বিধাতার নির্দেশে তখন পান্থশালা থেকে বিশ্বকর্মা সকলকে বের করে দেন। বিধাতা ধরিত্রীকে জানান, এই হল জগতের রীতি, শক্তিমানের প্রকৃতি। আমরা দেখি ধরিত্রীকে কেউই দখল করতে পারে না, সকলে হাতাহাতি, মারামারি, চুলোচুলি করে আহত, শ্রান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। নাট্যকার বলেন – ধরিত্রীর পতি নির্বাচন সভার আয়োজন আজও চলছে, এই সভার অনুষ্ঠান আজও অসমাপ্ত।

এই নাটিকায় একদিকে আমরা দেখি শক্তিশালী দেশগুলি লোভ, দম্ভ ও আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। তারা জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে মশগুল। তাদের এই ইচ্ছাকে এখানে বিদ্রুপ করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে প্রবল শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের মন্দ অভিপ্রায়ও নিন্দিত হয়েছে। প্রবল শক্তিশালী দেশগুলির সৃষ্ট পরিস্থিতির ফলেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। রণধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়কেরা এই ধরণীকে মানবশূন্য করতে চায়। তাদের অদ্ভুত মারণ যন্ত্রের আবিষ্কারের প্রতিস্পর্ধা আমাদের হৃৎকম্প ঘটায়। '... কতি রণধুরন্ধরা রাষ্ট্রনায়কা ধরণীমিমাং মনুষ্যরহিতাং কর্তুং ব্যবসিতাঃ। অদ্ভুতমারণ - যন্ত্রাবিষ্করণে প্রতিস্পর্ধা তেষামস্মাকং হৃৎকম্পং জনয়িতব্যম্'। এই নাটিকায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির নির্জোট নীতিকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০ – ২০১০) ঋতা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১২।

২. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস - ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০০।

৩. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – ড. প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১০।

৪. 20th Century Sanskrit Literature (A Glimpse into Tradition & Innovation) – by Rita Chattopadhyay, kolkata, 2008.

....

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের 'চণ্ডতাণ্ডবম্' : সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত ভাণ

ড. অর্ণব পাত্র

প্রাচীন সাহিত্য সমালোচকগণ সাহিত্যের সামগ্রিক বিষয়কে দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন – দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্যকাব্য দৃষ্টিগ্রাহ্য আর শ্রব্যকাব্য শ্রুতিগ্রাহ্য। মঞ্চে অভিনয় দর্শনের মাধ্যমে দৃশ্যকাব্যের রস আস্বাদিত হয়। তাই দৃশ্যকাব্য অভিনয় প্রধান। সাধারণভাবে নাটকই দৃশ্যকাব্য পদবাচ্য। আলংকারিক পরিভাষায় একে 'রূপক' নামে অভিহিত করা হয়। তবে একে 'নাট্য' এবং 'রূপ' নামেও ভূষিত করা হয়। দশরূপককার ধনঞ্জয় তাঁর গ্রন্থে নাট্য বলতে বুঝিয়েছেন অভিনয়ের দ্বারা নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর অবস্থার অনুকরণ – 'অবস্থানুকৃতির্নাট্যম'। আচার্য ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন – নাট্য এই সমগ্র ত্রিভুবনের ভাবের অভিনয় – ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবনুকীর্তনম্'। সাগরনন্দী ও তাঁর 'নাটকলক্ষণরত্নকোষ' গ্রন্থে নাট্যস্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন (জাগতিক) সুখ দুঃখ থেকে সমুদ্ভূত মানুষের অবস্থার অভিনয়ই প্রাজ্ঞদের মতে 'নাট্য' অভিধায় ভূষিত।

এই নাট্য অভিনয়ের মাধ্যমে চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে পর্যবসিত হয়। এই দর্শনযোগ্যতা বা দৃশ্যময়তার জন্যই নাট্যের আর এক নাম রূপক – 'রূপং দৃশ্যতয়োচ্যতে'। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অবস্থার অনুকরণকে বলা হয়েছে অভিনয় 'ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ'। রূপক নামকরণের কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে দশরূপকে উক্ত হয়েছে – 'রূপকং তৎ সমারোপাৎ'। রূপের সমারোপ বলে তা (নাট্য) রূপক। ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে চলমান বা গতিশীল মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি মূর্ত করে তোলাই হল রূপকের প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। ভরতের মতে – এমন শাস্ত্র, এমন কলা, এমন বিদ্যা, এমন কর্ম বা এমন কোন অনুষ্ঠান নেই যা নাট্যে দৃষ্ট হয় না। -

> "ন তচ্ছাস্ত্রং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
> ন স যোগো ন তৎকর্ম যন্নাট্যেঽস্মিন্ ন দৃশ্যতে।।"

নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে উপলভ্যমান গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রই যে প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য এ বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। এই গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক ৪র্থ – ২য় খ্রিঃ পূঃ শতক। গ্রন্থটি নাট্য ও সাহিত্য

তত্ত্বের আলোচনায় সমৃদ্ধ। গ্রন্থটিতে নাটকের উৎপত্তি, নাট্যস্বরূপ, প্রেক্ষাগৃহ, রস-ভাব-অভিনয়, নাট্যবৃত্তি, কুশীলবের অভিনয় বৈশিষ্ট্য, নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতির আলোচনা সংকলিত হয়েছে। এছাড়া নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল – আচার্য নন্দিকেশ্বর রচিত অভিনয়দর্পণ, সাগর নন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশ, রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের নাট্যদর্পণ, সারদাতনয় রচিত ভাব প্রকাশন, সিংহভূপাল রচিত রসার্ণব সুধাকর, ধনঞ্জয়ের দশরূপক, বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ, রূপগোস্বামীর নাটক চন্দ্রিকা, বিদ্যানাথ রচিত প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ, ভোজরাজের শৃঙ্গার প্রকাশ ও সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, হেমচন্দ্রের কাব্যনুশাসন ইত্যাদি।

আচার্য ভরত থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলংকারিক সংস্কৃত রূপক বা নাট্য-সাহিত্যের বিভাগ বা শ্রেণিভেদ এবং প্রতিটি বিভাগের লক্ষণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাঁদের কারো মতে রূপকের সংখ্যা দশ আবার কারো মতে দ্বাদশ। তবে আচার্য ভরতের মতে রূপক দশটি এবং এটিই সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এগুলি হল – নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবকার, বীথী, অংক ও ঈহামৃগ। যাই হোক এত প্রকার রূপকের মধ্যে নাটক হল প্রধান রূপক। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ তথা অন্যান্য আলংকারিকগণও নাটকের প্রাধান্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কালিদাসকে সংস্কৃত কাব্যগোষ্ঠীর মধ্যমণি বিবেচনা করা হয়। সুতরাং তাঁকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে দৃশ্যকাব্যগুলিকে মোটামুটি ৩টি যুগে ভাগ করা যায় – কালিদাস পূর্বযুগ, কালিদাস যুগ এবং কালিদাসোত্তর যুগ। কালিদাস পূর্বযুগে রচিত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম অশ্বঘোষ বিরচিত শারিপুত্রপ্রকরণ এবং ভাস রচিত ১৩টি রূপক। কবিকুলগুরু কালিদাস রচিত নাটকের সংখ্যা ৩টি – মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় ও অভিজ্ঞান শকুন্তল। আর কালিদাসোত্তর যুগে রচিত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক, বররুচির উভয়াভিসারিকা, শূদ্রকের পদ্মপ্রাভৃতক, ঈশ্বরদত্তের ধূর্তবিট সংবাদ, শ্যামিলকের পাদতাড়িতক, শ্রীহর্ষের নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, ভবভূতির মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত, মুরারির অনর্ঘরাঘব, রাজশেখরের বালরামায়ণ, বালভারত, কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা, ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক, দামোদর মিশ্রের মহানাটক বা হনুমন্নাটক, কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় ও তার অনুকরণে রচিত কয়েকটি রূপক নাটক, যেমন – যশঃপালের মোহরাজপরাজয়, বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকের সংকল্পসূর্যোদয়, পরমানন্দ দাস সেন রচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ভূদেব শুক্ল রচিত ধর্মবিজয়, গোকুলনাথ উপাধ্যায়ের অমৃতোদয়, আনন্দ রায় মখি রচিত বিদ্যাপরিণয় প্রভৃতি। সংস্কৃত নাটকের অবক্ষয় বা ক্ষয়িষ্ণু যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল বিল্হণ রচিত কর্ণসুন্দরী। এছাড়া বৎসরাজ রচিত ত্রিপুরদাহ, সুভট রচিত দূতাঙ্গদ, কুলশেখরবর্মার

সুভদ্রা-ধনঞ্জয়, রামদেব ব্যাস বিরচিত সুভদ্রা পরিণয়, রামকৃষ্ণ কবি রচিত গোপাল কেলি চন্দ্রিকা, রামেন্দ্র সূরির নলবিলাস এবং নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের নলচরিত্র প্রভৃতি।

প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের মতো সংস্কৃত সাহিত্যেও আধুনিকতার প্রবাহমান গতিশীলধারা লক্ষিত হয়। উনবিংশ, বিংশ তথা একবিংশ শতকেও সংস্কৃতে নাট্য বা রূপক সাহিত্য রচনার ধারা অব্যাহত। শুধু বিংশ শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে ৫০০টিরও বেশি সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে। আধুনিককালে রচিত এইসব রূপকের বিষয়বস্তু হয়েছে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সাম্প্রদায়িকতা, পরিবেশ দূষণ, সন্ত্রাসবাদ, মূল্যবোধএর সংকট, আর্থসামাজিক সমস্যা, ধর্মীয় ও শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা, জাতপাত ভেদাভেদের সমস্যা প্রভৃতি। সমসাময়িক সমস্যা বা বাস্তবজীবন ও জগতের চিত্র এগুলিতে ধরা পড়ে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি আবার গতানুগতিকতা বর্জিত। কোনটিতে নান্দী, প্রস্তাবনার মধ্যদিয়ে নাটক শুরু হয়ে ভরতবাক্যে শেষ হয়েছে, কোনটিতে আবার নান্দী অনুপস্থিত। আবার এমন রূপকেরও দৃষ্টান্ত আছে যেখানে নান্দী গতানুগতিকতা বর্জিত। এখনো ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃতের প্রতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ অনেক সংস্কৃত প্রেমী রচনা করে চলেছেন সংস্কৃত রূপক সাহিত্য।

সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বনে রচিত এমনই একটি ভাণ শ্রেণির আধুনিক সংস্কৃত রূপক হল শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ বিরচিত ‘চণ্ডতাণ্ডবম্’। ১৯৫৩ সালে রচিত এই রূপকের মাধ্যমে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা উপস্থাপিত হয়েছে। দুই অঙ্কে পরিসমাপ্ত এই রূপকটি সংকীর্ণ শ্রেণির ভাণের অন্তর্গত।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ অবলম্বন করে ১৮ খানি ভাণ ও প্রহসন শ্রেণির রূপক রচনা করেছেন। এদের মধ্যে ‘চণ্ডতাণ্ডবম্’ ভাণ শ্রেণির রূপকটি প্রতীকাত্মক বা Allegorical । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভারতবর্ষের সনাতন রাজনীতি বীক্ষার একটি প্রচ্ছন্ন তুলনামূলক সমীক্ষা এখানে বিধৃত হয়েছে।

এই রূপকের প্রথম অঙ্কে রুশ দেশীয় নায়ক বা রাজনৈতিক নেতার দ্বারা সমাজবাদের বিকৃত প্রয়োগের প্রতিভূরূপে বিশ্বরাজনীতির ভয়ঙ্কর রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সমগ্র বিশ্ব থেকে সনাতন ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর মতে এই মানবজীবন কেবলমাত্র পার্থিব ভোগ সামগ্রী সম্ভোগের দ্বারাই সার্থক হয়। তিনি সকলকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ধর্মের ধ্বজাধারীরা ধর্মের সাধনকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাদের কাছে সুখ অধরাই থেকে গেছে। রুশ নায়কের মতানুসারে ধর্ম হল মূর্খের প্রাণঘাতী কুচিন্তা, পুরোহিতের অর্থ-উপার্জনের মাধ্যম এবং গরীবের অর্থনাশের মূল। এই ধর্মের দ্বারা মানুষের বিবেক বুদ্ধি পরলোক বলে কিছু থাকবে না, সংসার থেকে মুক্তির অলীক চিন্তাও দূর হবে।

রুশ নায়কের এই তিরস্কারের ভাষা থেকে পাশ্চাত্য দেশীয় বিভিন্ন শাসকের রাজনৈতিক চরিত্রের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। তীব্র ভাষায় হূণদের আক্রমণ করে তিনি তাদের 'বিকটরসিক' বলেছেন, ধনতন্ত্রবাদী বলে রোমান শাসকদের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করেছেন, রুশ সৈন্যবাহিনীর হাতে রাশিয়ার সম্রাট এবং তাঁর অনুগামীরা নিহত হয়েছেন শুনে আনন্দে আপ্লুত হয়েছেন। রুশ সেনাপতির মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে রুশ নায়কের ধর্ম এবং ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তা –

" কো নু ধর্ম ঈশো বা কিমর্থং তত্র চিন্তনম্।
তাবৎ কুর্বীত কর্মাণি চর্মপেটীপুপূর্ষয়া।।"

শুধু রাশিয়ায় নয়, সমগ্র বিশ্বে ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ করে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রুশ নায়কের চেষ্টার অন্ত নেই। সেনাপতি দেশের সকল উপাসনা গৃহে দরজা বন্ধ করেছে, ধর্মকে নির্বাসন দিয়েছে একথা শুনে রুশ নায়ক ধন্যবাদ জানিয়েছেন কারণ ধর্মানুরাগীরা যে কোন সময় তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারে – রুশ নায়ক সবসময় এই আশঙ্কাতেই ত্রস্ত।

একদা রুশ নায়ক ও সেনাপতির সঙ্গে মন্ত্রণাকালে এক জ্যোতির্ময় ভারতীয় সাধু সাক্ষাৎ বিঘ্নরূপে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর মতে ধর্ম ব্যতীত কোন দেশ বা জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব। ধর্ম ছাড়া সুস্থির রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মিত হতে পারে না। 'নখলু সম্ভবতি ধর্মং বিনা রাষ্ট্রনির্মাণম্'। তাঁর মতে ধর্মহীন রাষ্ট্রে মাৎস্যন্যায়ের উদ্ভব হয় এবং রাজনীতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। ধর্মহীন রাষ্ট্রনীতি স্বরহীন সঙ্গীতের ন্যায় বিফল হয়ে পড়ে। ধর্মসম্পর্কিত এই মতবাদ শুনে রুশ নায়ক এবং তাঁর সেনাপতি ধর্মপুরুষকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, কিন্তু তিনি বিশ্বশান্তির পথপ্রদর্শক, তিনি অকুতোভয়। বিশ্বশান্তির, বিশ্বমৈত্রীর, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের অমোঘ সঙ্গীত গীতের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং রুশ নেতা ও তাঁর সেনাপতিও অনুসরণ করলেন ধর্মপুরুষকে।

হিংসার প্লাবন সৃষ্টি করে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে মানুষের রাষ্ট্রচিন্তনে নতুন মাত্রা আনতে সর্বদা তৎপর কৃষ্ণকায় পাপপুরুষ। ইতোমধ্যে দুন্দুভির শব্দে হূণ রাজের প্রত্যাগমনের সংকেত পেয়ে সেনাপতি দ্রুত পলায়ন করল, রুশ নেতাও আত্মগোপন করলেন। হূণরাজ জানেন যে, ইংরেজরা কৌশলে প্রাচ্যের ভূখণ্ডকে লুণ্ঠন করেছে। তবে ইংরেজ সচিবের বক্তব্য এই যে, তারা সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের যে বাতাবরণ তৈরি করেছে তার মধ্যেই জনগণের কল্যাণসাধনের বীজ লুকিয়ে আছে।

সকলের কথোপকথনের ফাঁকে আগমন ঘটে আমেরিকার শাসকের। তিনি আধুনিক যুদ্ধবিমানের সহায়তায় পৃথিবীর সমস্ত শক্তিতে প্রতিহত করতে চান। তাঁর ইচ্ছা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা। এরই মধ্যে রুশ নায়ক সকলকে আক্রমণ

করেন এবং সকলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েন। ভয়ঙ্কর রক্তস্রোতের আবহে পাপের সঙ্গে সঙ্গে লোভ ও ক্রোধও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সবশেষে দেখা যায় হিংসা, লোভ ও ক্রোধ পরাজিত হয়েছে ভারতবর্ষের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ এবং ধর্মভাবনার কাছে। সংকীর্ণ ধর্মভাবনা কখনো মানুষের মঙ্গল করতে পারে না, যে ধর্মভাবনা মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, মৈত্রী ও শান্তির বাতাবরণ গড়ে দেয়, মানুষের শুভবোধ ও শুভশক্তিকে জাগ্রত করে সেই ধর্মভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাই যে মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধন করতে পারে তা এই রূপকে চরম সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

'চণ্ডতাণ্ডবম্' নামক ভাণ শ্রেণির রূপকটিতে সমাজ সমীক্ষার উপকরণের প্রাচুর্য না থাকলেও এতে নাট্যকারের রাজনৈতিক চিন্তার অধিক প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। ধনবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, সমাজবাদী, স্বার্থান্বেষী, ধুরন্ধর রাজনীতিকদের মধ্যে পাপ, ক্রোধ, হিংসা, লোভের পরিপূর্ণ সমাহার আমাদের চোখে পড়ে। আবার বিশ্বব্যাপী এই ভয়ঙ্কর, বিষময় পরিবেশের মধ্যে ভারতবর্ষের হিতকর-ধর্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তন নতুন আলোর দিশা দেখাতে পারে। প্রাচ্য সমাজের এই মঙ্গলময় চিন্তাই ভবিষ্যতে বিশ্বরাজনীতির পথপ্রদর্শক হবে – এই আশা বা প্রার্থনাই 'চণ্ডতাণ্ডবম্' রূপকটির মূল সুর।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০ – ২০১০) – ঋতা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১২।

২. দশরূপক (ধনঞ্জয়), সম্পাদক – ড. সীতানাথ আচার্য ও ড. দেবকুমার দাস, কলকাতা, ২০০৭।

৩. নাট্যশাস্ত্র (ভরতমুনি) ১, সম্পাদক – সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৭।

৪. সাহিত্য দর্পণ (বিশ্বনাথ), সম্পাদক – বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৮৬ (বঙ্গাব্দ)।

৫. পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের সারস্বত সাধনা – ঋতা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৪১১ (বঙ্গাব্দ)।

৬. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস - ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০০।

৭. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা, ১৪০০ (বঙ্গাব্দ)।

....

সংস্কৃত প্রহসনে প্রজন্ম ব্যবধান

জুবিন ইয়াসমিন

সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি সাহিত্যে বহু প্রজন্ম ধরে উপন্যাস, নাটক, গল্প, উপাখ্যান রচিত হয়েছে, যা অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে বোধগম্যের কারণে সর্বকালের সেরা হয়েছে। যেমন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপিয়র-এর নাম সকলেরই জ্ঞাত। প্রাচীন প্রজন্মে এবং আধুনিক প্রজন্মে তাঁদের নাম অজ্ঞাত নয়। এবার আসা যাক সংস্কৃত সাহিত্যে। অনেকে মনে করেন যে সংস্কৃত মানেই বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। এই ভাষার কবি হলেন অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, মাঘ, ভারবি ইত্যাদি।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন এবং আধুনিক যুগে একাধিক প্রহসনের উল্লেখ পাই। মহর্ষি ভরত থেকে ধনঞ্জয় পর্যন্ত হাস্যরস ও প্রহসন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব পাওয়া যায় এবং আধুনিক যুগে রচিত প্রহসনের প্রভাব বর্তমানযুগে সাহিত্যে, সমাজে, সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার চর্চা অনেক কম, এবং জনসাধারণের কাছে বোধগম্যও নয়। এই কারণে এই ভাষার জনপ্রিয়তা অনেক কম। কিন্তু বর্তমান যুগে এই ধারণার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

Monior Williams-এর মতে 'প্রহসন' শব্দের পরিপূরক শব্দগুলি হল – 'Laughter', 'Mirth', 'Mockery' and 'Derision'.

According to Modern Aesthetics –

i) Hasya is a Sanskrit word.
ii) For one of the nine Rasa or Bhaba of Indian aesthetics usually translate as humour or comedy.
iii) The colour associated with hasya is white and deity Pramatha.
iv) Hasya leads to exultation of the mind.

ইংরেজি সাহিত্যে comedy–কে আবার অনেক ভাগে ভাগ করা হয় – Romantic Comedy, Comedy of Humour, Satirical Comedy, Comedy of manners, Sentimental Comedy, Farce, Black Comedy.

প্রাচীন সাহিত্যে [সংস্কৃত] কতিপয় প্রহসন –

ক) মত্তবিলাস
খ) লটকমেলক
গ) ভগবদজ্জুকীয়
ঘ) হাস্যার্ণব
ঙ) ধূর্ত সমাগম
চ) হাস্যচূড়ামণি ইত্যাদি।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে কতিপয় প্রহসন –

ক) বিবাহ বিড়ম্বনম্
খ) চণ্ডতাণ্ডবম্
গ) রাগবিরাগম্
ঘ) ক্ষুতক্ষেমীয়ম্
ঙ) চিপিটক চর্বণম্
চ) চৌর চাতুরীয়ম্
ছ) ভট্টসংকটম্
জ) দরিদ্রদুর্দৈবম্
ঝ) পুরুষরমণীয়ম্
ঞ) কোপতালিয়া
ট) কঃ শ্রেয়ঃ
ঠ) উভয়ারূপকম্
ড) কৌণ্ডিন্য প্রহসনম্
ঢ) অযোধ্যাকাণ্ডম্
ণ) ইন্দ্রজালম্
ত) নিম্বপত্রাণি
থ) অর্থকিম্
দ) ননাবিতড়নম্
ধ) শতবার্ষিকম্
ন) ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্
প) জননী শ্রদ্ধাবর্ষণম্

প্রজন্ম ভেদে প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কৃত প্রহসনের ব্যবধান –

ক) প্রাচীন প্রহসনগুলিতে শুদ্ধ ও সংকীর্ণ এই দুই প্রকার ভেদ লক্ষণীয়। আধুনিক যুগে শুদ্ধ, সংকীর্ণ এবং সংকর শ্রেণির প্রহসন লক্ষণীয়। একটি বা দুটি অঙ্কের পরিবর্তে চার বা পাঁচ অঙ্কের প্রহসন লক্ষিত হয়। পাঁচ অঙ্কের প্রহসনের উদাহরণ – ভট্টসংকটম্। এক্ষেত্রে বিশ্বনাথ এবং ভরতের মতকে অতিক্রম করেছেন।

খ) প্রাচীন প্রহসনে নায়ক অধিকাংশ ধৃষ্ট প্রকৃতির। এছাড়া পাখন্ডি, বিপ্র, চেট, চেটী, নপুংসক, ভুজঙ্গ, চারণ, ভট্টাদয় ইত্যাদি চরিত্র দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সমাজের মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণির ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রহসনগুলি রচিত হত। যেমন – মত্তবিলাস, লটকমেলক ইত্যাদি। প্রহসনগুলি মধ্যম ও অধম শ্রেণির চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও আধুনিক প্রহসনগুলিতে সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তি, সম্ভ্রা[ন্ত] পরিবারের ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। যেমন – বিহাহবিড়ম্বনম্, ক্ষুতক্ষেমীয়ম্ [রঙ্গনাথ শেঠ]; পুরুষরমণীয়ম্ [সমাজের শিক্ষি[ত] ছাত্র] ইত্যাদি। কৃষ্ণ, রাবণ, বিবেকানন্দ, রামচন্দ্র, স্টালিন, হিটলার প্রভৃতি বিখ্যা[ত]

চরিত্রও নির্মলভাবে স্থান পেয়েছে।

গ) প্রাচীন প্রহসনে নারী চরিত্র হিসাবে গণিকা স্থান পেয়েছে। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক যুগে গণিকা নামে কোন চরিত্র ব্যবহৃত হয়নি। শুধু তাই নয়, নারীদের সমস্যা তথা বিধবাদের সমস্যা, বাল্যবিবাহ, কর্মরতা নারীর সমস্যা, স্বামীর অত্যাচার, সমাজের অত্যাচার স্থান পেয়েছে। satire-এর মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'ধরিত্রী-পতি নির্বাচনম্'-এ ভগবানের কন্যা ধরিত্রী-র কথা বলা হয়েছে। যিনি মধ্যম বা অধম শ্রেণির মধ্যে পড়েন না।

ঘ) 'অথকিম্' নামক প্রহসনে কোন চরিত্রের নামকরণ করেননি। নাট্যকার সিদ্ধেশ্বরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'ক', 'খ', 'গ' ইত্যাদি দ্বারা পুরুষ চরিত্র এবং 'আ', 'উ' ইত্যাদি বর্ণ দ্বারা স্ত্রী চরিত্রকে identify করা। যেটা সংস্কৃত সাহিত্যে অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে।

ঙ) প্রহসনে একটি মুখসন্ধির কথা বলা হয়েছে কিন্তু শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ একটির পরিবর্তে ২টি মুখসন্ধির ব্যবহার করেছেন। যেমন – চৌরচাতুরীয়ম্।

চ) বাংলা সাহিত্যে যেমন পাশ্চাত্যের লেখক ছাপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন – রবীন্দ্রনাথের লেখা ব্যঙ্গনাটিকা – 'গোড়ায় গলদ'-এ Shakespeare–এর 'Error in the Beginning 1892'-এর প্রভাব বিদ্যমান। 'তাসের দেশ'-এ 'The Kingdom of Cards'-এর প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাচীন সংস্কৃত প্রহসনে সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আধুনিক সংস্কৃত প্রহসনগুলিতে পাশ্চাত্য ও বিভিন্ন স্থানের লেখকের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন – সিদ্ধেশ্বরের লেখার মধ্যে বাদল সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী, হর্ষদেব মাধব ইত্যাদি লেখকের ছাপ বর্তমান। ['অথকিম্'] আবার 'ননাবিতাড়নম্' প্রহসনে পাশ্চাত্য-এর ভাবনা অর্থাৎ ব্রেশ্‌টের 'গ্যালিলেও চরিত'-এর ভাবনা বিদ্যমান।

ছ) বর্তমানে ব্যবহৃত সংস্কৃতে রূপান্তরিত বাংলার প্রবাদ, প্রবচন ও বাগ্‌ভঙ্গী অত্যন্ত সরলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যা অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে।

যেমন – 'এক লোষ্ট্র প্রহারেণ পক্ষিদ্বয় ঘাতনম্'

(এক ঢিলে দুই পাখি মরল) (ননাবিতাড়নম্)

'ভিত্তীনামপি বর্তন্তে শ্রবণেন্দ্রিয়াণি' (স্বর্গীয় – হসনম্)

(দেওয়ালেরও কান আছে)

'ময়া চ জ্ঞায়তেঽস্য নাড়ী নক্ষত্রাণামবস্থানম্' (স্বর্গীয় হসনম্)

(এর নাড়ীনক্ষত্র সব আমার জানা আছে)

প্রহসনগুলিতে অসাধারণ মুন্সীয়ানায় বাংলা প্রবাদ বা বাগ্‌ধারাকে ভাষান্তরিত করা হচ্ছে যা সকলের বোধগম্যের আওতায় সংস্কৃত ভাষা চলে এসেছে। শুধু তাই নয় ইংরেজি ও হিন্দি প্রবাদ অতিসহজে আধুনিক প্রহসনে চলে এসেছে। যেমন – 'প্রথমে গ্রাসে মক্ষিকাপাতঃ' (stumbling at first step)

জ) প্রাচীন প্রহসনের মধ্যে শৃঙ্গাররসাশ্রিত হাস্যরস বিদ্যমান। আধুনিক প্রহসনগুলিতে শৃঙ্গাররসাশ্রিত হাস্যরস বিদ্যমান অতটা লক্ষিত হয়না। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের লেখা তিনটি প্রহসনে যেমন 'ক্ষুতক্ষেমীয়ম্', 'চণ্ডতাণ্ডবম্', 'স্বাতন্ত্র্য সন্দিক্ষণম্'এ যথাক্রমে উদ্ভট, বীভৎস ও গম্ভীর প্রকৃতির হাস্যরস বিদ্যমান। কারণ আলংকারিকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন "শৃঙ্গারের অনুকরণই হল হাস্য। অর্থাৎ শৃঙ্গারের আভাস বা অনৌচিত্য ঘটলে হাসির উদ্রেক ঘটে। প্রকৃতপক্ষে সকল রসের আভাস থেকেই হাসির উদ্রেক ঘটে"।

ঝ) প্রাচীন প্রহসনের বিষয়বস্তু কবিকল্পিত। আধুনিক প্রহসনগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বাস্তবজীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। বর্তমান যুগে সবথেকে বড় সমস্যা শিক্ষিত বেকারত্বের সমস্যা। যা ছাত্রসমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এখানে পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ 'পুরুষরমণীয়ম্' নামক প্রহসনে সেটাই তুলে ধরেছেন। এখানে কবি কিছুটা কবিকল্পিত বিষয়কে অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ Traditional ভাবে রচনা করলেও অভিনবত্ব বা মৌলিকত্বের ছাপ রেখেছেন। রবীন্দ্রভাবনাকেও তিনি অনুসরণ করেছেন। তাই বলা হয়েছে – 'তোমার বিদ্যের বোঝাটা পিঠের থেকে নামিয়ে ফেল, তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারবে'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন – 'বিদ্যাকে বহন না করে বাহন করে চলো'।

বর্তমান যুগেও নারীর অসহায়ত্বের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিকযুগে পাশ্চাত্যের প্রভাব ভারতীয় ভাব ধারার মূল্যবোধকে অস্থির করে তুলেছিল। এই সবই উপরিউক্ত প্রহসনের মধ্যে ধরা পড়েছিল।

ঞ) সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সাধারণ মানুষ কষ্টভোগ করছিল সেগুলির কথা অবলীলাক্রমে ব্যক্ত হয়েছে আধুনিক প্রহসনে। যেখানে প্রাচীন প্রহসনে তথাকথিত সমাজের মধ্যম ও অধম শ্রেণির চরিত্রের নিন্দনীয় বিষয় বর্ণনা করা হত। কিন্তু বর্তমানযুগে উচ্চবৃত্তধারী ব্যক্তিদের নিন্দনীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'ক্ষুতক্ষেমীয়ম্' (শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ) নাটকে রঙ্গনাথ শেঠের ধনলোভী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অথকিম্' (সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়) প্রহসনে ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি যে point blank satire অর্থাৎ ভোটের আগে নেতাদের প্রতিশ্রুতি, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় সাধারণ মানুষের অনীহা, ভোটকালীন rigging ক্ষমতাসীন দলের এবং খুনখারাপি সবই প্রতিফলিত হয়েছে। রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী 'মশকবাণী' তে ধনবাদী ও ভোগবাদী সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন – "It derineates a pathetic story of human deceit and appression by the powerful corrupt rich on the powerless poor"। এক্ষেত্রে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাতে স্মরণ করতেই হয়, "এ জগতে হায়! সেই বেশী চায় আছে যার ভুরী ভুরী"। আবার শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের 'দরিদ্রদুর্দৈবম্' প্রহসনে মানুষের আত্মসর্বস্বতা ও

আত্মকেন্দ্রিকতা রূপটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এরজন্য দায়ী সমাজের উচ্চবর্গ ও উচ্চশ্রেণির লোকেরা।

ট) বর্তমান বিজ্ঞান মনস্কতার যুগে বিজ্ঞানের যে ভয়াবহ রূপ এবং তার প্রভাব, স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী রূপ, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, কূটনৈতিক চালে ভারতবর্ষকে দু-টুক্‌রো করে দেওয়ার চেষ্টা, স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে এবং পরবর্তী যুগে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ভারতীয়-এর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিমুখতা এই সবই ফুটে উঠেছে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের 'স্বাতন্ত্র সন্ধিক্ষণম্', 'চণ্ড-তাণ্ডবম্', 'শতবার্ষিকম্' নামক প্রহসনে। শুধু ভারতবর্ষের নয় আন্তর্জাতিকস্তরের রাজনৈতিক সমস্যার কথাও বলেছেন 'ধরিত্রীপতি নির্বাচনম্' নামক প্রহসনে। এইভাবে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী রাজনীতির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান দিয়েছেন।

বাঙালির বিধ্বস্ত সমাজ ও জীবনকে প্রাচীন ভারত ও নবীন য়ুরোপের আদর্শে নতুন রূপ দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে লেখকের একমাত্র ব্রত হল বাঙালির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। সংস্কৃত সাহিত্যে সময়ের ব্যবধানে পার্থক্য লক্ষিত হয় সমাজ-সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে। যদিও আমরা জানি প্রাচীনের পথ ধরেই নবীনের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন – নদী এককূল ভাঙ্গে এককূল গড়ে। অর্থাৎ এই ভাঙা গড়া জীবনেরই ধর্ম এটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। সাহিত্য গড়ে ওঠে সমাজ-সংস্কৃতিকে নিয়ে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে নতুনত্বের ছাপ প্রতিফলিত হয়, এর ফলে সকলের কাছে বোধগম্য নয় এমন মৃতপ্রায় সংস্কৃত ভাষা অবলুপ্তের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে রচিত কতিপয় সংস্কৃত প্রহসনের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের নানাবিধ ব্যবধান সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাচীন প্রহসনগুলিতে কবিদের মৌলিকত্বের ছাপ লক্ষিত হয় কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যে সমগ্রভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন 'genre' এর বিচারে Traditional এবং Innovation অর্থাৎ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন লক্ষিত হয়। আমাদের অনেকের ধারণা Taditional মানে conservation অর্থাৎ opposed to change অর্থাৎ পুরানোকে আঁকড়ে থাকা। প্রাচীন অর্থাৎ পুরানোকে আঁকড়ে ধরে বিংশ শতাব্দীর প্রহসন রচিত হলেও তাঁর মধ্যে ঐতিহ্য, মৌলিকত্ব ও আধুনিকত্বের বিষয়কে মাথায় রেখে প্রহসনগুলি রচনা করেছেন এবং তার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রজন্ম ব্যবধানে সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়েছে যা সংস্কৃত ভাষাকে স্বমহিমায় মহিমান্বিত করে তুলেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – ড. দেবকুমার দাস, ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. অথকিম্ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় – ড. ঋতা চট্টোপাধ্যায়।

৩. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের সারস্বতসাধনা – ড. ঋতা চট্টোপাধ্যায়।
৪. রস ও ভাব – আশোকনাথ শাস্ত্রী।
৫. বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত – ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬. সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালির অবদান – ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭. Modern Sanskrit Dramas of Bengal [2oth century A.D.] – ড. ঋতা চট্টোপাধ্যায়।
৮. Modern Sanskrit Literature – Dr. V. Raghavan.

....

পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ্মসংখ্যা ২০১৫

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত

গবেষণামূলক

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল রচিত ও সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য ১০০ টাকা

রবিকিরণে নবরত্ন ৬০ টাকা

রবীন্দ্রকাব্যনাট্য : রূপ ও রূপান্তর ৯০ টা

রক্তকরবী : আলোকিত উদ্ভাসন ৩০০ টা

ড. পুলিন দাস রচিত

মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ ২৪০ টা

নীলবৃত্তান্ত ১৫০ টাকা

দুর্গাচরণ বসুর দুঃখনিশি অবসান বা শৈলবালা (সম্পাদি

ড. দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রচিত

ভারতীয় শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ১২০ টাক

ড. প্রত্যুষকুমার জানা

কথা সাহিত্যিক মতি নন্দী ১৮০ টাকা

অধ্যাপক - দিশারী : নেট-সেট

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল রচিত

বাংলা-ইংরাজি দ্বিভাষিক নেট জেনারেল : প্রথম পত্র ৪০০ টাকা

বাংলা নেট : দ্বিতীয় পত্র ৫০০ টাকা

বাংলা নেট ঃ দ্বিতীয় পত্র (ক্রোড়পত্র) ২৮০ টাকা

বাংলা নেট ঃ দ্বিতীয় পত্র ক্রোড়পত্র সহ ৬৫০ টাকা

বাংলা নেট ঃ তৃতীয় পত্র ৫২৫ টাকা

শিক্ষক - দিশারী : টেট/ এস. এল. এস. টি

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল রচিত

বাংলা-ইংরাজি দ্বিভাষিক টেট : প্রাইমারি ৩০০ টাকা

এস. এস. সি টেট : সোশ্যাল স্টাডিজ ৪০০ টাকা

এস. এল. এস. টি বাংলা (প্রথম খণ্ড) ৩৫০ টাকা

পি.এস.সি. বাংলা ২৫০ টাকা

দূরশিক্ষা - দিশারী : বাংলা এম. এ

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল রচিত

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা এম. এ, পার্ট-ওয়ান ৩০০ টাকা, পার্ট-টু ৩০০ টাকা

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা এম. এ, পার্ট-ওয়ান ৩৫০ টাকা, পার্ট-টু (প্রকাশিতব্য)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা এম. এ, পার্ট-ওয়ান ৪০০ টাকা এবং পার্ট-টু (প্রকাশিতব্য)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

কলেজ স্ট্রিট : প্রজ্ঞাবিকাশ (বামা পুস্তকালয়) ।। জানকী বুক ডিপো ।। দে'জ পাবলিশিং ।।

জয়শ্রী ।। কম্পিটিটিভ বুক সেন্টার ।। ঊষা পাবলিশিং হাউস

মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর) : গ্রন্থবিচিত্রা ।। মেদিনীপুর : ভূর্জপত্র

বাঁকুড়া : ভ্রাতৃ সংঘ ।। শিলিগুড়ি - ৯৮৭৪৪৮০৩০৬